ভারতের শিক্ষা



কল্যাণী কার্লেকর

লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এসে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে এবং পরে বংগদেশে কাজ করে। চার্চ মিশনারি সোসাইটি এবং ওয়েসলিয়ান মিশন এই সময়ে কলম্বো, ট্রাংকোয়েবর, সুরাট, মীরাট, আগ্রা ও কলিকাতায় কাজ করে।

এইসব বিশুদ্ধ মিশনারি কাজ ছাড়া খৃষ্টান মিশনারিরা কোম্পানির সহযোগিতায় আরেক প্রকারের কাজের ভার নিয়েছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় সৈনিকগণের স্বেচ্ছাচার এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা দুর্ঘটনার ফলে ভারতীয়, য়ুরোপীয় এবং য়ুরোপীয় পিতা ও ভারতীয় মাতৃজাত অনাথ ও পরিত্যক্ত বালকবালিকা দেখা যেত। এস-পি-সি-কের এক বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এক মাদ্রাজ ও করমণ্ডলের উপকূলে বছরে অন্যূন সাতশত এইরূপ শিশু পাওয়া গেছিল। এদের আশ্রয় ও শিক্ষাদানের জন্য কোম্পানির ঊর্ধতন কর্মচারীদের সহায়তায় ও মিশনারিদের চেষ্টায় "চ্যারিটি স্কুলের" প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধানত মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা শহরে এগুলি স্থাপিত হয়েছিল।

মাদ্রাজে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রেঃ ষ্টিভেন্সন কোম্পানির প্রোটেষ্ট্যান্ট কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সেণ্ট মেরিজ চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার মিশনারীরা এস-পি-সি-কের সাহায্যে একটি পর্তুগীজ ও একটি তামিল বালকদের বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ত্রিরুচিরপল্লীতে বারুদের গুদামে বিস্ফোরণের ফলে বহু দেশীবিদেশী সৈনিক হতাহত হয়; তাদের ছেলেপিলেদের জন্য শোয়ার্জ একটি চ্যারিটি স্কুল খুলেছিলেন! তার কিছুদিন পরে, মাদ্রাজ শহরে একটি "মেল" (১৭৮৭) ও একটি "ফিমেল অর্ফ্যান এসাইলাম" (১৭৮৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির জন্য কোম্পানির ডিরেক্টররা ছাত্র পিছু মাসিক ৫৲ হিসাবে সাহায্য করতেন, এস-পি-সি-কের কাছে অর্থ পাওয়া যেত, আর্কটের নবাব বাড়ী তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রচুর দান করতেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির পাদ্রি (Chaplain) ডাঃ বেল "মেল অর্ফ্যান এসাইলামের" প্রথম অধ্যক্ষ (Director) ছিলেন। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত এবং এখানেই ডাঃ বেল প্রথমে তাঁর বিখ্যাত সর্দারপোড়ো-পদ্ধতির (monitorial system) প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতি তিনি স্থানীয় গ্রাম্য পাঠশালার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণির ছাত্র নিম্নতর শ্রেণির ছাত্রদের পড়াত। ফলত প্রায় ছাত্র প্রতি একেকজন শিক্ষক হওয়ায় ব্যক্তিগত পঠন হত, ছাত্রেরা ফাঁকি দেবার সুযোগ পেত না, একটি মাত্র শিক্ষকের

দ্বারা বিদ্যালয়ের কাজ চালান সম্ভব হ'ত। পরে বেলের এই পদ্ধতি কিছু পরিবর্তিত হয়ে ইংলণ্ডের স্কুলে প্রযুক্ত হ'ত।

বোম্বাইয়ে, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রেঃ রিচার্ড কব গরিব প্রোটেষ্ট্যাণ্ট য়ুরোপীয় ছেলেদের জন্য চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এস-পি-সি-কের দ্বারা আরেকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এগুলি "এডুকেশন সোসাইটি"র বিদ্যালয়গুলির সংগে একত্রে পরিচালিত হ'তে থাকে।

কলিকাতায় প্রথম পাদ্রি বেলামি ও রেঃ লংয়ের সহায়তায় চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত হয়ঃ এই স্কুল এস-পি-সি-কের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এর বাড়ী তৈয়ারী হয়। প্রথমে এটি সাধারণের অর্থসাহায্যে চলত এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রি স্কুল সোসাইটির অধীন হয়ে যায়। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বিলেতে তোলা চাঁদার টাকায় এংলিক্যান মিশনারীরা "দি ক্যালকাটা চ্যারিটি স্কুল" স্থাপিত করেন। এটি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ কমিটির অধীনে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। নানা পরিবর্তনের পর এখন পর্যন্ত "ক্যালকাটা বয়েজ" ও "ক্যালকাটা গার্লস স্কুল" নামে দুই শাখায় এর অস্তিত্ব আছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কর্নেল ক্লাইভ মাদ্রাজের পাদ্রি কিয়ের্ন্যাণ্ডারকে (Kiernander) বাংলা দেশে আমন্ত্রণ করে' একটি স্কুল খোলান। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এটি ফ্রি স্কুলের সংগে মিলিত হয়ে যায়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে "ফ্রি স্কুল সোসাইটি" নামে এক শিক্ষাসংসদ গঠিত হয় এবং তার দ্বারা "ফ্রি স্কুল" স্থাপিত হয়, যার নাম থেকে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের উৎপত্তি। পরে এই স্কুল খিদিরপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং আজ পর্যন্ত "সেণ্ট টমাস স্কুল" নামে বর্তমান আছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের নেতৃত্বে দরিদ্র খৃষ্টানদের জন্য ক্যালকাটা বেনেভোলেণ্ট সোসাইটির ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়েছিল এবং ওই সোসাইটি ক্রমে "প্র্যাট মেমোরিয়াল," "লি মেমোরিয়াল" প্রভৃতি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে।

এইসব বিদ্যালয়গুলি প্রথমে ধার্মিক ও বদান্য ব্যক্তিদের দানে ও সরকারি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে ফিরিংগি ও ইংগবংগীয় সমাজের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্তমানে এগুলি মিশনারি স্কুল হিসেবে বোর্ড অব এংলোইণ্ডিয়ান এডুকেশনের তত্ত্বাবধানাধীন। এরা প্রধানত কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে, কোন কোনটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এগুলিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কিছু খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষাও দেওয়া হয়।



ভারতের শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড—বৃটিশ যুগ

কল্যাণী কার্লেকর, এম,-এ, বি-টি

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৪ ; সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; মার্চ, ১৯৬১

V

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই

ভারতের শিক্ষা (প্রথম খণ্ড)

বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি

প্রকাশক—শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
শাখা কেন্দ্র—৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাস কুমার দাস
ক্যালকাটা জব প্রেস, প্রাইভেট লিমিটেড
৩৫-বি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

সূত্রপাত

শিক্ষার ইতিহাসের যুগবিভাগের অনুসারে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক যুগ গণনা করা হয়ে থাকে। এই যুগ পাশ্চাত্যপ্রভাবের যুগ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় শিক্ষার পাশচাত্ত্যপ্রভাবের স্থত্রপাত তার আগেই হয়েছিল।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসার আগে এ-দেশে পোর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমার কোম্পানি এসেছিল এবং পোর্তুগীজ, ফরাসী ও দিনেমারেরা এদেশে কিছু কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পোর্তুগীজ, ও ফরাসীরা রোম্যান ক্যাথলিক ছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের সংগে তাদের প্রভাব কমে যায়। অপরপক্ষে, দিনেমার কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব কোনদিন বেশি না থাকলেও তারা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট হওয়ায় বৃটিশের শক্তির আওতায় ও সহায়তায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকে ও পরে বৃটিশের প্রচেষ্টার সঙ্গে মিশে যায়।

পোর্তুগীজেরা ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। তারা গির্জা ও মিশনসম্পৃক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভারতীয়দের জন্য প্রাথমিক এবং কৃষি ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাসমন্বিত অনাথালয়, উচ্চশিক্ষার জন্য জেস্থইট কলেজ ও পাদ্রি তৈরি করার জন্য ধর্মশিক্ষার সেমিনারী, এই চার রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। প্রথম পোর্তুগীজ শিক্ষাব্যবস্থাপকদের মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়র ও রবার্ট-ডি-নোবিলির নাম প্রধান। সেণ্ট জেভিয়র ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেছিলেন।

বর্নিয়র তাঁর বিবরণে আগ্রায় সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত জেস্থইট কলেজের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া পোর্তুগীজেরা গোয়া, দামন, দিউ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে যে জেস্থইট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভারপ্রাপ্ত "রেক্টর" টমাস ষ্টিফেন্স নামক একজন ইংরাজ ছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সেখানে সেণ্ট এন্‌স্ কনভেণ্ট নামে আরেকটি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৬২০ ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ও সালসেটে

পোর্তুগীজ য়ুরেসিয়ান স্কুল খোলা হয়। এইসব স্কুলগুলিতে পোর্তুগীজ ও আঞ্চলিক ভাষা ও খৃষ্টধর্মের মূলসূত্র শেখান হ'ত আর কলেজে তর্কশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব, লাটিন প্রভৃতি পড়ান হ ত।

জেসুইট মিশনারিরা ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত করেন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের বই ছাপান। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এঁদের পাঁচটি ছাপাখানা ছিল।

ষোড়শ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীরা কারিকল, পন্দিচেরি, মাহে, য়েনাম, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে' ভারতীয় শিক্ষকগণের দ্বারা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। পন্দিচেরির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফরাসী ও ভারতীয় কর্মচারীদের সন্তানদের ফরাসীভাষায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই শিক্ষা ধর্মনির্বিশেষে বিতরণ করা হ'ত এবং শিক্ষার মান উঁচু ছিল।

ওলন্দাজ মিশনারিরা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দিতে সিংহলে কাজ করেন। এঁরা ভারতের সংগে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন না, কেবল ক্যাথলিকদের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট করতে চাইতেন।

দিনেমার মিশনারিরা প্রধানতঃ বৃটিশের সংগে যুক্ত থেকে কাজ করেন, সেই প্রসংগেই তাঁদের বিষয় আলোচনা করা হবে।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর প্রথমে ১৫ বৎসরের জন্য ভারতে ব্যবসায় করবার সনন্দ পায় এবং সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম থেকে ভারতবর্ষে কাজ করতে থাকে। শিক্ষাবিষয়ে এরা পূর্বগামী কোম্পানি-গুলির অনুকরণ করে এবং রোম্যান ক্যাথলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব হ্রাস করবার ইচ্ছাতেই প্রথম শিক্ষা ও ধর্মের প্রচার করতে আরম্ভ করে।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দের এক পত্রে (Dispatch) এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারত-বাসীদের মধ্যে "সুসমাচারের" (Gospels) প্রচারের জন্য কোম্পানির ব্যয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে কয়েকজন ভারতীয় খৃষ্টানকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়াও হয়। ক্যাপ্‌টেন বেষ্ট নামক এক সাহেব এরূপ একজনকে নিয়ে গিছিলেন এবং স্বয়ং রাজা প্রথম জেম্‌স্ তার দীক্ষার সময়ে তাকে "পিটার" নাম দিয়েছিলেন। এ লোকটির তার পরের ইতিহাস জানা যায় না। কোম্পানির পাদ্রিদের ভারতে ধর্মপ্রচারক্ষম করার জন্য ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আর্চ বিশপ লর্ড অক্সফোর্ডে এক শিক্ষাব্যবস্থার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত

স্থানে ডাঃ ফেলেরও এক পরিকল্পনার কথা জানতে পারা যায়; কিন্তু এই ব্যবস্থার কোনটিই সাফল্যলাভ করতে পারে নি।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের লিখিত আরেকটি পত্রে প্রকাশ করা হয় যে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ঔৎসুক্যনিবন্ধন তাঁরা তাঁদের জাহাজে মিশনারীদের ভারতে আগমনের পূর্ণ সুযোগ দেবেন।

এইরূপে দেখা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বহুলভাবে মিশনারিদের সহায়তা নিতেন এবং শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব তাঁদের ওপর দিয়ে অর্থসাহায্য ও অন্যান্য প্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট সেণ্ট জর্জের (মাদ্রাজ) কুঠির এলাকায় পোর্তুগীজ ও বৃটিশজাত ফিরিংগি এবং কিছু কিছু ইংরেজ কর্মচারীদের ছেলেপিলের জন্য "কোম্পানির ইস্কুল" খোলা হয়ঃ এই বিদ্যালয়ে ফিরিংগি নামে পরিচিত পোর্তুগীজ ও আঞ্চলিক ভাষার এক প্রচলিত মিশ্রসংস্করণ ব্যবহৃত হ'ত। ক্রমে অন্যান্য দুয়েকটি কুঠির এলাকায় এইরূপ ইস্কুল খোলা হয়। প্রথম প্রথম এগুলিতে কেবল য়ুরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেপিলেরা পড়ত, পরে কিছু ভারতীয় কর্মচারীর সন্তানেরাও প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এবং ভারতীয়দের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। এই কোম্পানির কুঠির ইস্কুলগুলিকেই ভারতে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম শিক্ষামূলক কাজ বলা যায়।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ নতুন ক'রে দেওয়ার সময়ে তাতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে কোম্পানির পাঁচশত টনের অধিক ভারবাহী প্রত্যেক জাহাজে ও ভারতের প্রত্যেক কুঠিতে একজন ক'রে পাদ্রি রাখতে হবে। যে-সমস্ত 'জেণ্টু' বা ভারতবাসী কোম্পানির ক্রীতদাস, চাকুরে বা এজেণ্ট হবে তাদের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য এইসব পাদ্রিদের পক্ষে তৎকালে বহুপ্রচলিত পোর্তুগীজ ভাষা ও ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক হ'ল এবং কোম্পানির সেনাবাসে ও বড় বড় কুঠিতে বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

উক্ত নির্দেশগুলির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দিতে ভারতে বৃটিশপ্রচারিত পাশ্চাত্য-শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, সপ্তদশ শতাব্দিতে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এর প্রকৃত ইতিহাস গণনা করা যায়।

ভারতে প্রথম বৃটিশ মিশন ছিল "সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব ক্রিশ্চান নলেজ," বা সংক্ষেপে "এস-পি-সি-কে"। এই মিশন ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথমে দিনেমারদের মিশনদের সংগে কাজ আরম্ভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম থেকে দিনেমার মিশনারিরা ভারতবর্ষে কাজ করতেন। এঁরা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ছিলেন বলে' অনেক সময়ে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় ও তার এলাকায় কাজ করতেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে জাইগেনবল্গ (Ziegenbalg) ও প্লুশো (Plutschau) নামক দু'জন দিনেমার মিশনারির নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের ট্রানকোয়েবরে কাজ আরম্ভ হয়। এঁরা ভারতীয়দের জন্য পোর্তুগীজ ও তামিল ভাষার শিক্ষাব্যবস্থা ও নিউ টেষ্টামেণ্টের তামিল ও তেলেগু অনুবাদ করিয়েছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা ও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দুটি "খৃষ্টান" বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে জাইগেনবাল্গের মৃত্যুর পর শুলজ (Schultz) এসে তাঁর স্থান নেন। শোয়ার্জ (Schwartz) আসেন ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দির বৃটিশ শিক্ষানীতি বহুলভাবে তাঁর দ্বারাই গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টার জন্য কোম্পানি ছাড়া দেশীয় রাজগণের কাছ থেকেও কিছু কিছু সাহায্য আদায় করতে পেরেছিলেন। একবার বৃটিশ কোম্পানি ও হায়দ্রাবাদের নবাবের মধ্যে দৌত্যকার্য করার ফলে নবাব তাঁকে অর্থদ্বারা পুরস্কৃত করেছিলেন, সেই অর্থ তিনি তাঁর বিদ্যালয়ভাণ্ডারে দান করেন। তাছাড়া তাঞ্জোরের রাজা এবং আর্কটের নবাবও মিশনারিদের শিক্ষাপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কোম্পানির মুসলমান ও 'কাফের' কর্মচারীদের ছেলেদের শিক্ষার ১৭টি বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ধর্মশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এবং অভিভাবকদের আপত্তির কারণে এই বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতনা বলে এগুলির প্রতি তাঁরা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন না। এঁরা সাধারণের শিক্ষার মাধ্যমরূপে তামিল ভাষার ব্যবহার করতেন বলে' নিজেরাও তামিল শিখতেন। জাইগেনবাল্গ তামিল বাইবেল ও ব্যাকরণ করেছিলেন, তামিল অভিধানও রচিত হয়েছিল, ফেব্রিকস্ তামিল 'স্তবমালা' লিখেছিলেন, শুলজ তেলেগু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। উচ্চবিদ্যালয় ও শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখান হত। এঁদের আর্থিক অবস্থার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে অর্থাভাব ঘটলে এঁরা এস-পি-সি-কের কাছে অর্থসাহায্য পেতেন

বাংলাদেশের মধ্যে শ্রীরামপুরে এঁদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। বহু দিন এই স্থানকে কেন্দ্রস্বরূপ করে' তাঁরা উত্তরভারতে প্রচারকার্য চালাতেন।

প্রথম বৃটিশ মিশন এস-পি-সি-কে ১৭১১খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ছাপাখানা স্থাপিত করে ও ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তার দ্বারা নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে দিনেমার মিশনারিদের কার্যকলাপ এর হাতে এসে পড়ায় তাঁরা এস-পিসি-কের কর্মচারী হয়ে পড়েন। এই সোসাইটির অধীনে তাঁরা মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, কুড্ডালোর, পালমকোটা, ত্রিরুচিরপল্লী প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে কাজ করেন। কথিত আছে যে তাঁরা দশ হাজার ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিকে আরো কয়েকটি বৃটিশ মিশন ভারতবর্ষে এসেছিল। এই সময়ে উত্তরভারতে মিশনারি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু এঁরা মাদ্রাজের মিশনারিদের মত সরকারি সহায়তা পেতে পারেননি। কলকাতার কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মিশনারিদের সাহায্য করা দূরে থাক যতদূর সম্ভব বাধা দিতেন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে আসেন ও কিছুদিন ঘোরাফেরার পর কোম্পানির বিরোধিতার ভয়ে দিনেমার এলাকা শ্রীরামপুরে নিজেদেব প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা যাতায়াতও অনেক সময়ে আমেরিকান ও দিনেমার জাহাজে করতেন। এঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উইলিয়ম কেরি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন ও অল্প সময়ের মধ্যেই নিউ টেষ্টামেণ্ট ৩৬টির বেশী ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা দশ হাজারের বেশি ছাত্র সমন্বিত অন্যূন ১১৫টি বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন। সেগুলির অধিকাংশই কলিকাতার সীমানার থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই সময়ে তাঁদের একটি দুর্ঘটনাও ঘটে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ হওয়ায় ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কোম্পানি সাবধানতা অবলম্বন করে, "নিরপেক্ষতার" নীতির ঘোষণা করেন। তারই এক বৎসর মধ্যে, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশে তাদের ধর্মের নিন্দা করে প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং তাতে দেশবাসীর মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। কলিকাতার কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই কারণে এঁদের কাজকর্ম বন্ধ করতে উদ্যত হ'ন কিন্তু দিনেমার মিশনারীদের মধ্যস্থতায় বহু কষ্টে এঁরা আত্মরক্ষা করেন।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের দান প্রভূত ; প্রথম প্রথম কোম্পানির সরকারের নির্দেশে কাজ করলেও পরে এঁরা সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে এনেছিলেন এবং দেশে শিক্ষার একটি মান স্থাপিত করেছিলেন। প্রথম কিছুদিন অবৈতনিক শিক্ষাদানের দ্বারা শিক্ষার চাহিদাও এঁরাই বাড়িয়েছিলেন।

কোন সময়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে মিশনারিদের সহায়তা ভিন্ন অন্য কোনো শিক্ষামূলক কাজ করেননি তা নয়।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ও কোম্পানির উর্ধতন কর্মচারী স্যর উইলিয়ম জোনস এসিয়ার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য কলিকাতায় "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি" স্থাপিত করেন। কোম্পানির অনেক বড় বড় সাহেব এই সোসাইটির কাজে আগ্রহের সংগে অংশ গ্রহণ করতেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রেসিডেণ্ট মিঃ সলিভ্যান শোয়ার্জের পরিকল্পনানুযায়ী ও তাঁরই উদ্যোগে তাঞ্জোর, রামনদ ও শিবগংগায় ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি স্কুল স্থাপিত করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সরাসরি এগুলির ভার নেন এবং বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড সাহায্য বরাদ্দ করেন! প্রথমে এগুলিতে ইংরেজি, অংক, তামিল ও খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। পরে কোম্পানির অধীনে আসার পর, কোম্পানি ধর্মশিক্ষার অনুমোদন না করায় খৃষ্টধর্মের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় এবং বাইবেল গ্রন্থ সাহিত্যরূপে পঠিত হ'তে থাকে।

বাংলা দেশেও এই সময়ে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রকৃতি ভিন্ন ছিল।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনেরাল ওয়ারেন হেষ্টিংস "কলিকাতা মাদ্রাসার" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আরবী ভাষার মাধ্যমে মুসলমান ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাদের আকৃষ্ট করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। এখানে প্রকৃত দর্শন (Natural Philosophy), কোরাণীয় ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ পড়ান হ'ত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এরজন্য বাৎসরিক তিরিশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১,৪০,৫৩৭৲ টাকা ব্যয়ে নূতন বাড়ি তৈয়ারি হয় ; কিন্তু এই মাদ্রাসা জনপ্রিয় হয়নি, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ৯৯ জন মাত্র বৃত্তিভোগী ছাত্র পড়ত।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বেনারসের রেসিডেণ্ট মিঃ জোনাথান ডানকান বেনারসের "সংস্কৃত কলেজের" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মনুর বিধানের অনুসারে শিক্ষা দেওয়া

হ'ত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দ থেকে এই কলেজ এক সরকারী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ২৭৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত, তাদের মধ্যে ২৪৯ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকি বিভিন্ন উচ্চ জাতের হিন্দু ছিল।

এই কলেজগুলির প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কারণ নির্দেশ করা যায়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং আইন দ্বারা একজন গভর্ণর ও চারজন "কৌঁসিলী" নিয়ে বৃটিশাধিকৃত ভারতের শাসন ব্যবস্থা হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নূতন "ইণ্ডিয়া এক্ট" প্রচলিত হওয়ায় রেগুলেটিং এক্টেরও সংশোধন হয়। এই সংশোধনে হিন্দুদের হিন্দু ও মুসলমানদের ইসলামীয় আইনানুসারে বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরজন্য "জজ-পণ্ডিতের" বা জজকে আইন বুঝিয়ে দেবার লোকের দরকার হয়। সেই প্রয়োজন মেটানই ওই কলেজটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা, পূর্বগামী মোগল সম্রাটদের অনুকরণ করা এবং প্রাচ্য জ্ঞানের প্রতি বাস্তবিক আকর্ষণকেও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরা যায়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বৃটিশ সিভিলিয়নদের ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং হিন্দু ও ইসলামীয় আইন শিক্ষা দেওয়া হত। ডাঃ কেরি, মিঃ কোলব্রুক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এর সংগে জড়িত ছিলেন এবং এখানকার পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

এই সময়ে কলিকাতায়, ইংরেজি শিক্ষার চাহিদার ফলে কোম্পানিও মিশনারিদের স্কুলগুলি ছাড়া কতকগুলি ব্যবসাদারি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অসুস্থ বা আহত, সামান্য বৃত্তিভোগী সৈনিকগণ দারিদ্র্যের লাঘবের জন্য স্কুলগুলি খুলত। পায়জামা-বেনিয়ান পরণে, হাতে বেত, সাহেব মাষ্টার মোড়ার ওপর পা তুলে চেয়ারে বসত, ছাত্রেরা মোড়ায় বসে পড়া করত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর্চারেরও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোমস্ ও মিঃ গেলার্ডের 'একাডেমি' খোলা হয়েছিল। ১৭৮৮ সালে মিঃ ব্রাউন হিন্দুসন্তানদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় এবং মিঃ ম্যাকিনন ছেলে-মেয়েদের জন্য "ক্যালকাটা একাডেমি" খুলেছিলেন। এরাটুন, শেরবোর্ণ, কৃষ্ণ-মোহন বসু, শিবু দত্ত প্রভৃতি এই ধরণেম আরো অনেক শিক্ষকের নাম পুরাতন কাগজপত্রে পাওয়া যায়।

এই নোতুন সাহেবি শিক্ষা থেবে মেয়েরাও বাদ পড়েনি। মেয়েদের প্রথম স্কুলের কাল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও অনুমান করা যায় যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মিসেস হজেসের স্কুলই প্রথম। তিনি নাচ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন

করেছিলেন। তাছাড়া মিসেস পিটস্, মিসেস স্যাভেজ, মিসেস লসন, মিসেস ডুরেল, মিসেস কোপল্যাণ্ড, মিসেস পাইন প্রভৃতি মেমসাহেবের স্কুলের নাম জানতে পারা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংলণ্ডে লিবারেলিজম্ বা উদারপন্থী আদর্শের অভ্যুত্থানকাল। এই সময়ে বার্ক প্রভৃতির বক্তৃতায় দাসত্ব ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনমত গ'ড়ে উঠছিল। দরিদ্রের শিক্ষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল এবং সরকার কর্তৃক জন-শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকৃত না হ'লেও ধর্মসম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লোকশিক্ষার আয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এইসব আন্দোলনের প্রভাব বৃটিশ কোম্পানির ভারতীয় নীতির ওপরও পড়েছিল। চার্লস গ্রাণ্ট (১৭৪৬-১৮২৩) ছিলেন এই প্রভাবের বার্তাবহস্বরূপ। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। দুইবার কিছুকাল করে' এদেসে বসবাসের পর ১৭৯০ সালে স্থায়িভাবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বই রচনা করেন তার নাম—"Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to their morals and on the means of improving them." সংক্ষেপে একে গ্রাণ্টের "অবজারভেশন" বলে অভিহিত করা হয়।

এই গ্রন্থে দেশের লোকচরিত্রের অতি হীন চিত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন যে বংগদেশে সত্যবাদী, সাধুপুরুষ দুর্লভ, সর্বাংশে চরিত্রবান পুরুষ অপ্রাপ্য এবং দেশপ্রেম হিন্দুস্থানে অজ্ঞাত। এরূপ অবস্থার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে হিন্দুরা অজ্ঞ বলে ভ্রান্ত এবং তাদের ভুল কোনদিন দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। গ্রাণ্ট আলোক ও জ্ঞানদানের দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মাতৃভাষার" মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার সহজ এবং ইংরেজির মাধ্যমে তা কঠিন হ'লেও ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত কারণ ইংরেজির জ্ঞান এদেশের লোকের সামনে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে' দেবে। ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থার একটা পরিকল্পনাও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে প্রদেশগুলির বিভিন্ন অংশে অবৈতনিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য অল্প ব্যয়ে স্থাপিত বিদ্যালয়ের পরিচালনা করতে হবে। সেইসব কেন্দ্রে শিক্ষিত হিন্দুগণ সজাতীয়দের ইংরেজি শেখাবে। গ্রাণ্ট আরো বলেছেন যে দেশের লোকে ইংরেজি শিখলে এদেশে রাষ্ট্র পরিচালনারও অনেক সুবিধা হবে।

এই গ্রন্থ লিখবার পর গ্রাণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবাসিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য আইনত বাধ্য করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গে মিঃ উইলবরফোর্স নামক এক প্রসিদ্ধ দানশীল, সমাজসেবী ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গ্রাণ্টের সংগে এক ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্য হয়ে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ও ভারতীয় ব্যাপারসমূহের বিষয়েও আগ্রহান্বিত ছিলেন। গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনি কোম্পানির ওপর শিক্ষাদানের সর্ত স্থাপিত করতে চেষ্টা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে যে সনন্দ নিয়ে ভারতে ব্যবসা করছিল, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেটি নূতন করে গ্রহণ করবার সময় আসে। এই সময়ে মিঃ উইলবরফোর্স শিক্ষাবিষয়ে কোনো বাধ্যতামূলক সর্ত তার অন্তর্ভুক্ত করাবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে হাউজ অব কমন্সে এক প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে ছিল যে সর্বপ্রকার ন্যায় ও যুক্তিসংগত উপায়ে বৃটিশাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থ ও সুখের উন্নতি করাই বৃটিশ আইন সভার বিশিষ্ট ও আবশ্যিক কর্তব্য এবং এই কর্তব্যের পালনের জন্য এমন, উপায়সমূহ অবলম্বন করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে কার্যিক জ্ঞানের প্রচার ও নৈতিক উন্নতির উপায় হয়। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে যারা এই লোকসেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে ভারতে গিয়ে অবস্থান করতে চাইবে তাদের যেন আইনত যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। সংগে সংগে শিক্ষার জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়ে দেবার চেষ্টাও হয়।

এই প্রস্তাবটি হাউজ অব কমন্সে গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু এর নির্দেশগুলি কোম্পানির নূতন সনন্দের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কার্যকর হতে পারেনি। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি দেন যে এত অধিক ব্যয়ে লিপ্ত হবার মত প্রচুর আয় তাঁদের হয় না এবং ধর্মসম্বন্ধীয় যুক্তি দিয়ে বলেন যে বৃটিশের দ্বারা খৃষ্টানভাবাপন্ন ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে স্থাপিত করতে চাইলে লোকে বিদ্রোহ করবে।

তারপর মিঃ গ্র্যাণ্ট ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সভ্য এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হ'ন। তখন থেকে তিনি পার্লামেণ্টের ভেতরে ও বাইরে ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন।

আদৌ কোম্পানির সরকার এদেশবাসীদের অসন্তুষ্ট করার ভয়ে পাদ্রিদের তাদের ধর্মে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাইতেন না, তদুপরি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহিবিদ্রোহ ঘটে। চুল ও পোষাকের রীতির পরিবর্তন এবং বন্দুকের টোটায় চর্বির ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়েছিল; হিন্দু-মুসলমান উভয়েই মনে করেছিল যে ওই ব্যবস্থার দ্বারা ধর্মহানি ঘটবে। ওই বিদ্রোহ দমন করা হ ল বটে কিন্তু তারপর থেকে কোম্পানি তার ধর্মসম্বন্ধীয় নীতির বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকলো। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের ধর্মপ্রচারজাত অসন্তোষের ফলে কোম্পানি আরো তটস্থ হয় এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারকার্যে সাহায্য করতে অস্বীকার করে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি প্রাচ্য-বিদ্যার প্রতি অনুরাগশীল ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তিনি একটি "প্রস্তাব" (Dispatch) লিখে প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থন করেন। তিনি লেখেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে রাজা, রাজন্য ও ধনিবর্গ বিদ্যার যেরূপ সমাদর করতেন বর্তমানে তার অভাব ঘটায় এরূপ অবস্থা হয়েছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ জাতি যে হিন্দুদের সাহিত্যের যত্ন নিতে পারেনি সে অতি লজ্জার কথা। এই বিষয়ে অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রথমেই কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারসের সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের এবং নদীয়া ও ভোরে সংস্কৃত কলেজ ভাগলপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার দরকার।

এই ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে এই সময়ে ইংরেজদের মধ্যে ভারতীয়গণের শিক্ষার স্বপক্ষে যে মত গঠিত হচ্ছিল তার দুটি বিশিষ্ট ধারা ছিল। গ্রাণ্ট ও মিশনারিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার চাইছিলেন আর কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থন করতেন।

এই সময়ে কোম্পানির সনন্দ প্রতি কুড়ি বছরে নোতুন করে নেওয়ার নিয়ম ছিল। তদনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সেটি আবার বৃটিশ পার্লামেণ্টের সামনে স্থাপিত হয় এবং তখনকার বর্ধিত জনমতের সহায়তায় সনন্দের ৪৩ ধারায় এক শিক্ষাবিষয়ক সূত্র নিবদ্ধ করা হয। তাতে বলা হয় যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিকল্পে, ভারতীয় পণ্ডিতগণের উৎসাহদানে এবং বৃটিশের ভারতসাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের

মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও উন্নয়নকল্পে কোম্পানি, অন্যান্য দাবী মেটাবার পর, বাৎসরিক অন্যূন একলক্ষ টাকা ব্যয় করবে।

মিশনারিদের ভারতে আসার পথ সুগম করার জন্য এই সনন্দের অপর অংশে কোম্পানিকে তাদের আগমনে সর্বপ্রকার সহায়তা করতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

এইভাবে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল।

এই যুগান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণতির আলোচনা করলে দেখা যায় যে শিক্ষাদাতৃগণের তিনটি পক্ষ ছিল, কোম্পানির সরকার, মিশনারি ও শিক্ষাব্যবসায়ী। এর মধ্যে মিশনারিদেরই উৎসাহ ও উদ্যম বেশি ছিল এবং মাঝে মাঝে ধর্মপ্রচারের অতিরিক্ত উৎসাহে বিপদ ঘটালেও মোটামুটি ইংরেজ যুগে ভারতীয় জনশিক্ষার পথপ্রদর্শকের সম্মান এদের প্রাপ্য।

শিক্ষার মান সম্বন্ধে বলা যায় যে দুয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন মান অত্যন্ত নিচু ছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শিক্ষার বেশি দেওয়া হ'ত না। তবে কয়েকটি এমন বিদ্যালয়ও ছিল যেগুলিকে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের সংগে তুলনা করা যায়। এই মানের আবার কোন স্থিরতা ছিল না: শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট স্তরবিভাগ ছিল না বলে' স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আদর্শের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ত।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার ব্যাপ্তি অতি সংকীর্ণ ছিল; কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে ও সন্নিকট গ্রামে মুষ্টিমেয় লোকে এই শিক্ষা লাভ করতে পারত।

শিক্ষার প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার ও ব্যবসাবাণিজ্যের সৌকর্য হলেও বাস্তবিক বিদ্যোৎসাহিতা ও পরোপকারবৃত্তির প্রমাণও প্রচুর পাওয়া যায়। ইংরেজ প্রাচ্যবিদগণ ভারতীয় ঐতিহ্যের লুপ্তরত্নোদ্ধার না করলে এবং শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ও ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যকে রূপ না দিলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ।

১৮১৩-১৮৩৩

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দের শিক্ষাসূত্রের দ্বারা গ্রাণ্ট ও উইলবরফোর্সের আন্দোলনের সমাপ্তি হ'ল, ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষাদান কোম্পানির অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে ধার্য হ'ল, এবং এক বৎসরে নির্ধারিত-পরিমাণ অর্থব্যয় বাধ্যতামূলক হ'ল। এই তিন কারণে এই সময় থেকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একযুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ ব লে ধরা হয়ে থাকে।

এই সনন্দের নিয়মানুসারে প্রতি বৎসর দশ হাজার পাউণ্ড বা একলক্ষ টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল ; কিন্তু এই সময়ে যাঁরা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষার নীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতৈক্য ছিল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও জোনাথান ডানকান প্রাচ্যশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, লর্ড মিণ্টো তাঁর ১৮১১ খৃষ্টাব্দের পত্রে সেই মতই প্রকাশ করেন। তাছাড়া মিঃ প্রিন্সেপ ও মিঃ উইলসন প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন।

অন্যদিকে চার্লস গ্রাণ্ট ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন এবং মিশনারিরা নিম্নস্তরে মাতৃভাষা ও ওপরের স্তরে ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।

তৃতীয় পক্ষে বোম্বাইয়ের লর্ড এলফিনষ্টোন এবং মাদ্রাজের মনরো বিশ্বাস করতেন যে আঞ্চলিক মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশবাসীর শিক্ষা হওয়া উচিত।

এরমধ্যে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্ত্যবাদী এই দুই দলই প্রধান ছিল। যাঁরা আরবী, ফার্সী, সংস্কৃতাদি প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যার উচ্চশিক্ষার প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা প্রথম দলের ও যাঁরা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ্যের শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব যাঁরা করতেন তাঁদের দল এই সময়ে বেশি শক্তিশালী হয়নি, তাছাড়া যে সামান্য অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ হয়েছিল তাতে কোনো ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনাও করা যেত না

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের শিক্ষাসূত্রের ভাষাও দ্ব্যর্থবোধক ছিল ; "সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি" বলতে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোন সাহিত্য বোঝায় ; "ভারতীয় পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষকতার" ব্যাপারে যে-সব ভারতবাসী প্রাচ্য-বিদ্যায় পারদর্শী তাঁদের, না যাঁরা ইংরেজির উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদের বোঝায় এবং "বিজ্ঞান

শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন" বলতে প্রাচীন প্রাচ্য বা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কোন বিজ্ঞান বোঝায়ঃ সে-সব কথা ওই শিক্ষাসূত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

ফলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবাদীরা ওই সূত্রগুলিকে নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করতেন, কিন্তু সরকারি মত যে এই সময়ে মোটামুটিভাবে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে ছিল তা ১৮১৪ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশ (Dispatch) থেকে জানা যায়। উচ্চজাতীয় হিন্দু পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার বশীভূত হ'তে রাজি হবেন না এই যুক্তিতে এই পত্রে ইংরেজি কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যাঁরা স্বগৃহে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে' চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের সম্মানচিহ্নদানে ও মাঝে মাঝে অর্থসাহার্য্যের দ্বারা সেই ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করতে হবে।

তাছাড়া এই পত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচ্যবিদ্যার উপযোগিতা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে সংস্কৃতভাষায় ধর্ম ও ব্যবহারশাস্ত্রের এবং প্রত্যেক শ্রেণির লোকের কর্তব্যপালনের নির্দেশসমন্বিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ আছেঃ—যাঁরা সরকারী বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাঁদের পক্ষে এগুলি অবশ্যপাঠ্য; এই ভাষায় ঔষধ, ওষধি এবং চিকিৎসায় সেগুলির প্রয়োগের এমন গ্রন্থসকল আছে যেগুলি পাঠ করা য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের পক্ষেও বাঞ্ছনীয়; এবং জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সংযোজন দ্বারা ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও সরকারি মানমন্দির, পূর্তবিভাগ প্রভৃতিতে নিযুক্ত য়ুরোপীয় কর্মচারিগণের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত সরকারী বিভাগসমূহে নিযুক্ত য়ুরোপীয় কর্মচারিগণের সংস্কৃত শিক্ষার ও তার জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিকদানে ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত প্রচলিত গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার কথাও এই পত্রে নিবদ্ধ করা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে গ্রামের গুরুগণকে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ ও অন্যান্য দানের দ্বারা পালিত করার যে সামাজিক ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারি অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান করতে হবে।

তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা (১৮১৩-২৩) উক্ত নির্দেশলাভের পর এক পত্রে (১৮১৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রিক শক্তিলাভের পর শিক্ষাব্যবস্থাকেই শাসকবর্গের প্রথম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে এবং সুশাসনের

ভিত্তিস্বরূপ সুশিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি তিন অংশে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন :—প্রথম, উচ্চ প্রাচ্যশিক্ষার প্রচার, দ্বিতীয়—গ্রাম্য পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও তৃতীয়—প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠন। গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে গ্রামের শিক্ষকগণ অতি অল্প বেতনে দোকানি জমিদারি হিসেবের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এঁদের সহায়তা ও বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের দ্বারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক জিলায় হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের জন্য শিল্প-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন।

দুঃখের বিষয় এই যে ওই পরিকল্পনাগুলির একটিও কাজে পরিণত হয়নি। এই সময়ে কোম্পানির সরকার গুর্খা, পিণ্ডারি ও মারাঠাদের সংগে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় ১৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেন নি। অপর পক্ষে কোম্পনির দ্বারা কিছু করা হয় নি বলে' শিক্ষাক্ষেত্রে যে কিছুই ঘটেনি তা নয়। বৃটিশ মিশনারিরা বহুলভাবে ও ভারতীয় নেতৃগণ কিছু কিছু অংশে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত করেছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের নোতুন সনন্দে শিক্ষাসূত্র ভিন্ন বৃটিশ মিশনারিদের ভারতে আগমনের ও কার্যকলাপের বাধা দূর করার জন্য অপর একটি সূত্র নিবদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে তাঁরা অনেক সহজে ও অধিক সংখ্যায় এসে এদেশে কাজ করতে পেরেছিলেন।

লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেণ্ড রবার্ট মে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া ও তার আসপাশে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিলেন। এই এক-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলি ডাঃ বেলের (Lancastrian) পদ্ধতিতে পরিচারিচালিত হ'ত। এগুলিতে বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র পড়তো এবং লর্ড হেষ্টিংস এদের জন্য মাসিক ছয়শত টাকা সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এঁদের ৩৬টি বিদ্যালয় ছিল এবং সেগুলি মাসিক ১৮০০৲ টাকা সরকারি সাহায্য পেত। ওই বৎসরে রবার্ট মের মৃত্যু হয়, কিন্তু পিয়র্সন ও হার্লি নামে অপর দুইজন তাঁর স্থান গ্রহণ করে' বাঁকিপুর, কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। দক্ষিণভারতেও এঁরা ব্যাপকভাবে কাজ করেছিলেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও তার আসপাশে আরো কুড়িটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের ছাপাখানা থেকে বহু বিদ্যালয়পাঠ্য ও অন্যান্য বাংলা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই প্রকাশিত হ'ত। তাঁদের

পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয় এবং ওই সালেই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচারের ও ভারতীয় খৃষ্টান মিশনারিদের প্রস্তুতির জন্য শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপিত হয়। এটি বৃটিশ ভারতের প্রথম মিশনারি কলেজ। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার সরকারের আইনের ক্ষমতায় ওই কলেজ ডিগ্রি বিতরণ করতে আরম্ভ করে।

চার্চ মিশনারি সোসাইটি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের আগে থেকে কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাজ করতো। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানে দশটি বাংলা স্কুল খুলে প্রায় হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই স্কুলগুলিতে ছাপান পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হ'ত। এই মিশন আগ্রা, মীরাট, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানেও কাজ করে।

দি সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন্ অব্ দি গস্‌পেল্‌স্ (S. P. G.) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে, কলিকাতার প্রথম বিশপ রেভারেণ্ড মিডল্‌টনের নামে "বিশপস্ কলেজ" স্থাপিত করে। খৃষ্টান যুবকদের সজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া এবং হিন্দুমুসলমানদের ইংরেজি শেখানো এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল।

দি স্কচ মিশনারি সোসাইটির রেভারেণ্ড জন উইলসন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে আসেন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন এণ্ডার্সন মাদ্রাজে ও আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কলিকাতায় আসেন। আলেকজাণ্ডার ডাফের মতামত এই যুগের শিক্ষাজগতে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করছিল। তখনকার মিশনারিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র ছিল না এবং সমাজের নিম্নতম স্তর ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির লোক খুব কমই খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করছিল বলে' তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাকে উচ্চশ্রেণির মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ বলে' গ্রহণ করেন কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ওই শিক্ষার প্রত্যেক শাখা হিন্দুবিশ্বাসের এককে অংশকে ধ্বংস করে' ক্রমশ "হিন্দুত্বের বিরাট বীভৎস দেহকে" নষ্ট করে' ফেলবে। তাঁর আশা ছিল যে সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ক্রমশঃ তা সমাজের নিম্নতর স্তর-সমূহের মধ্যে "চুঁইয়ে" পড়বে। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন্" স্থাপিত করেন। এই প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক ছিল এবং এখানে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক ধর্মোপদেশ দেওয়া হ'ত। খৃষ্টধর্মের প্রচার আসল উদ্দেশ্য হ'লেও এখানকার লৌকিক শিক্ষার মান উঁচু ছিল এবং ডাঃ ডাফ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ছাত্রদের "পলিটিক্যাল ইকনমিক্স" শেখাতে আরম্ভ করেন। হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ ধর্মনাশভয়ে ভীত হলেও অতি অল্পদিনের

মধ্যে এই বিদ্যালয়ে এক হাজার ছাত্র হ'ল। কালক্রমে এটি বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হয়েছে।

এই সময় থেকে ভারতে মিশনারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মিশনারি শিক্ষার 'স্বর্ণযুগের' প্রারম্ভ এখন থেকেই গণনা করা হয়। এই সময়ে মিশনারিরা ভারতের কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রেখে গেছেন। শ্রীরামপুরের কেরিসাহেব বাংলা গদ্যের জনকরূপে খ্যাত এবং এবং এখানকার ছাপাখানা থেকে, শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত হয়ে ভারতীয় গদ্যের ও প্রয়োজনীয় সাহিত্যের অভাব দূর করেছিল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিদ্যালয়পাঠ্য বইও ছাপা হ'ত। তখনকার দিনে বাংলায় ইস্কুলের বই ছিল না, বর্ণপরিচয়ের পর সাধারণ কাব্যাদি পড়ানো হ ত, সেগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুপযোগী ছিল এবং রুচির দিক থেকেও যে ছেলেদের যোগ্য ছিল তা নয়। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণ"ও এই মিশনারিদেরই দান।

বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বহু গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন করে' মিশনারিরা প্রাথমিক শিক্ষার একটি নূতন মান সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাংলায় পাঠ্যপুস্তক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বই রচনা করে' প্রমাণ করেছিলেন যে বাংলাভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহারযোগ্য। বস্তুত, এই ব্যবহারযোগ্যতাও তাঁরাই গড়ে' তুলেছিলেন।

ধর্মপ্রচার তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'লেও তাঁরা শিক্ষাবিস্তারকে প্রচারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে' দেশের লোকের পক্ষে ধর্মকে অগ্রাহ্য করে' শিক্ষাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু, তখন তাঁরা স্বধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের অচলায়তনে আঘাত করেছিলেন বলেই হয়তো সনাতনধর্ম সচেতন হয়ে নূতনের সমন্বয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিল।

মিশনারিদের ওই শাখায়িত প্রচেষ্টার তুলনায় ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রচেষ্টা সামান্য হ'লেও প্রারম্ভরূপে নগণ্য নয়। এই প্রচেষ্টার একটি বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু এই যে এতে ভারতবাসিগণের সংগে অনেক ইংরেজও সমানভাবে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম উল্লেখযোগ্য ভারতীয় প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। ওই সালে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, মিঃ হেরিংটন প্রমুখ ব্যক্তিগণের উৎসাহে একটি সমিতি গঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন চীফ্ জষ্টিস স্যর হাইড

ইষ্টের বাড়ীতে এর অধিবেশন হয়। এর সভ্যদের অধিকাংশই ভারতীয় ছিলেন এবং হিন্দু সন্তানদের এশিয়া ও য়ুরোপের ভাষা সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য বস্তুবিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষাধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে' ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির দ্বারা "কলিকাতা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উচ্চমানের ভাষা ও সাহিত্য এবং আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃত দর্শন, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পড়ান হ'ত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এই কলেজের নাম "হিন্দু কলেজ" হয়, তখন এখানে সত্তরটি ছেলে পড়তো। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞান পড়াবার উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনবার ও অধ্যাপকের বেতনের ব্যয়নির্বাহের জন্য জি-সি-পি-আই এই কলেজে অর্থ সাহায্য করে এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে নিয়মিত সরকারি সাহায্য পাওয়ায় এর ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এর ছাত্র সংখ্যা ৪২১ হয়েছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জি-সি-পি-আইএর রিপোর্টে দেখা যায় যে এখানকার ছাত্রদের মতো ইংরেজিভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পারদর্শিতা য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্বচিৎ দৃষ্ট হ'ত, কিন্তু সংস্কৃত ও ফার্সীভাষার শিক্ষা বাদ পড়ায় এখানে বিজাতীয় ভাবের আধিক্য ছিল। তথাপি এই কলেজ শিক্ষিত সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করেছিল এবং দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উদ্বোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই তরুণ অধ্যাপক ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করে' ছাত্রদের মনে সাহস ও স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার ভাব জুগিয়েছিলেন। তাঁর উগ্র বিপ্লববাদ দেশের লোকের সহ্য হয়নি বলে' কর্মজীবনের প্রভাতকালেই তাঁর সূর্য অস্তমিত হয়। তারপর ডাঃ টাইলর, ডিকেন্স, পিটার গ্রাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাপকেরা নাম করেছিলেন। রিচার্ডসন সংস্কারক ছিলেন না, সেক্সপীয়রের অদ্ভুত অধ্যাপনার জন্য তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। এক সময়ে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই বাড়িতে বসতো। মাঝে রেলিং গেঁথে দেওয়া সত্ত্বেও দুই দলের ছাত্রের মেলামেশা ঘটতো আর হয়তো এখানেই লক হিউম-বেকনের সংগে ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণের আদান-প্রদানে বাংলার রেনেসাঁসের পরবর্ত্তী সামঞ্জস্যময় রূপের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন হিন্দু কলেজের রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁর সংস্কারস্পৃহার কতটা এই সাহচর্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা কে বলতে পারবে? ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ "প্রেসিডেন্সি কলেজ" নামে ভারতের প্রথম সরকারি কলেজে পরিণত হয়।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলপাঠ্য এবং সাধারণের বৌদ্ধিক ও নৈতিক উন্নতির উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে "কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হয়। বড়লাটপত্নী মার্শনেস অব্ হেষ্টিংস এর সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি সরকারের কাছ থেকে ৭০০০৲ টাকা এককালীন দান ও মাসিক পাঁচশত টাকা সাহায্য পায়। এই সময়ের মধ্যে এদ্বারা সাধারণ বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তক, আরবী পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রাকৃত দর্শন, বিসূচিকারোগ প্রভৃতি বিষয়ে ৩৮টি বিভিন্ন বই প্রকাশিত ও সেগুলির ১,২৬, ৪৪৬ খণ্ড প্রচারিত হয় এবং সমিতি তার মূলধনের ওপর শতকরা কুড়িটাকা লাভ করে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সংগঠিত হয়। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে' দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ ইংরেজি ও প্রাথমিক বাংলা শিক্ষার প্রচার করা এদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির অধীনস্থ ১১৫টি বিদ্যালয়ে ৩৮২৮ জন ছাত্র পড়তো এবং এর কর্মিগণ সেগুলির তত্ত্বাবধান, পরীক্ষাগ্রহণ ও পুস্তকবিতরণ করতেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওই স্কুলগুলির জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা সরকারি সাহায্য বরাদ্দ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওই সাহায্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সে'র দ্বারা স্বীকৃত হয়। হাওয়েলসাহেব একে ভারতীয় জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ডিরেক্টরদের প্রথম দায়িত্ব-স্বীকৃতি বলে' অভিহিত করেছেন, কেন না এর পূর্বে কেবল উচ্চশিক্ষার জন্যই অর্থ সাহায্য করা হ'ত; কিন্তু মিশনারিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত সরকারি সাহায্যের কথা গণ্য করলে এই অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না। এই সমিতি পাঠশালার গুরুমশায়দের জন্য একটি শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়ও স্থাপিত করেছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সমিতি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে। (১৮২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়েও "বোম্বে নেটিভ স্কুল সোসাইটি" নামক একটি অনুরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক দিন সাফল্যের সংগে কাজ করেছিল)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার কলিকাতায় দুটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিলেন। এর একটিতে বাংলা ও অপরটিতে ইংরেজি পড়ানো হ ত। সূর্যোদয়ের পর থেকে বেলা নটা পর্যন্ত ও অপরাহ্নে সাড়ে তিনটে থেকে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত বাংলা এবং বেলা সাড়ে দশটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত ইংরেজি বিদ্যালয় বসতো। সময়ের এরূপ ব্যবস্থার ফলে ইংরেজি ও বাংলা দুই স্কুলে একসংগে পড়া যেত এবং দেখা গেছিল যে প্রায় প্রত্যেক ছাত্র ইংরেজি পড়তে চাইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মিশনারি প্রভাববর্জিত লৌকিক শিক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌরমোহন আঢ্য উত্তর কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিয়ারি স্থাপিত করেন। বিশুদ্ধ ইংরেজি শেখাবার জন্য তিনি ভাল ভাল য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় শিক্ষক খুঁজে এনে নিযুক্ত করতেন এবং একবার এক য়ুরোপীয় শিক্ষকের সন্ধানে ঝড়-জলের মধ্যে হুগলি পার হ'তে গিয়ে প্রাণ হারান। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার হরম্যান জেওফ্রে রিচার্ডসনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর আমলে এই বিদ্যালয় জনপ্রিয়তায় হিন্দুকলেজের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং অনেকে তাঁকে শিক্ষকহিসেবে ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের সমশ্রেণীয়রূপে গণ্য করেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও এই সময়ে এইরূপ সমিতি সংগঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রিগণের অনুরোধে মিসেস পীয়ার্স ও মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বাঙালি বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" (The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools) স্থাপিত হয়। ওই বৎসরই ওই সমিতির প্রথম "জুভেনাইল স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে আরো অন্যান্য স্কুলও খোলা হ'তে থাকে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এর আটটি বিদ্যালয় ছিল এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২০টি। এই সোসাইটি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "বেংগল ক্রিশ্চান স্কুল সোসাইটির" মহিলাবিভাগে পরিণত হয় এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "দি ক্যালকাটা ব্যাপটিষ্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি" নাম নেয়। এর বিদ্যালয়-গুলিতে বাংলার মাধ্যমে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং ইরেজি পড়ানো হ'ত না। খৃষ্টধর্মের তত্ত্ব এদের শিক্ষার অংগীভূত হওয়ায় উচ্চশ্রেণির হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়গুলি ছেড়ে দিতে থাকে।

লণ্ডনের "বৃটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির" দ্বারা প্রেরিত হয়ে কুমারী মেরি-এন কুক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটির সহায়তায় কলিকাতার কয়েকটি স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর তত্ত্বাবধানে ২৪টি বালিকাবিদ্যালয় ছিল। ওই বৎসর তিনি বিবাহ করে' মিসেস উইলসন হন এবং বেংগল লেডিজ সোসাইটির (Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity) প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁর স্কুলগুলির ভার তার ওপর ন্যস্ত হয়। এই স্কুলগুলিতে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং ভালো ছাত্রীরা সিকি, আধুলি ও শাড়ি পুরস্কার পেত। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বদান্যতায় লেডিজ সোসাইটির সেণ্ট্রালস্কু ফিমেল লের স্থাপন ও

তার গৃহনির্মাণ (১৮২৭ খৃঃ) হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের 'মনিটর' বা শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণশিক্ষার কিছু ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর কার্যকলাপের ইতিহাস পাওয়া যায় এবং বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের গৃহে স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষণশিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে !

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন য়ুরোপীয় মহিলা "লেডিজ এসোসিয়েশন" (The Calcutta Ladies Association for Native Female Education) স্থাপিত করেন। প্রথমে এটি লেডিজ সোসাইটির অনুপূরক সমিতিরূপে গণ্য হলেও পরে জানবাজার ও ইটালী অঞ্চলে ছয়টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করে।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের কাজের কথাও উল্লেখযোগ্য। প্রথমে স্বয়ং উইলিয়ম ওয়ার্ড মিশনের স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের ভার নিয়ে বহু বালিকাবিদ্যালয়ের স্থাপন করেন এবং তাঁর আদর্শে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী হ'ন। এই বিদ্যালয়গুলিতেও অবৈতনিক বাংলা শিক্ষা এবং উত্তম ছাত্রীদের সিকি, আধুলি ও শাড়ি পুরস্কার দেওয়া হ'ত। পরে এদের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং ১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দের উইলিয়ম এডামের রিপোর্টে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের মাত্র দু'টি বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আগে বলা হয়েছে যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের আগে শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানির স্বকৃত নূতন প্রচেষ্টা বিশেষ কিছু হয়নি। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'নেটিভ' ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য একটি "মেডিকেল স্কুল" স্থাপিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই প্রচেষ্টাহীনতা দূর করলেন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল মিঃ এডাম। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই স-পার্ষদ বড়লাটের দ্বারা "জেনেরাল কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্সট্রাকশন" (সংক্ষেপে জি-সি-পি-আই) নামে দশ জন সভ্যসম্বলিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত এক কমিটি গঠিত হয়। মিঃ প্রিন্সেপ, মিঃ উইলসন প্রভৃতি দশজন ইংরেজ সিভিলিয়ান এর সভ্য ছিলেন। মিঃ উইলসন ছিলেন অধ্যক্ষ। এই কমিটিতে একজনও ভারতীয় ছিলেন না। এর অধীনে কতকগুলি আঞ্চলিক কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ভারতবাসীদের নেওয়া হ'ত কিন্তু কমিটিগুলি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। জি-সি-পি-আইয়ের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়ন, দেশে কার্যিক শিক্ষার প্রবর্তন ও লোকচরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে কোম্পানির সরকারকে পরামর্শদান। এর প্রথম নীতি ছিল যে এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এই সন্দেহের উদ্রেকমাত্র না হয় যে কমিটি খৃষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়। দ্বিতীয়

নীতি ছিল যে সরকারের কাছে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করার মত টাকা না থাকায় কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষাবিস্তারেরই প্রচেষ্টা হবে।

এই কমিটির হাতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার ও সরকারি বরাদ্দ বার্ষিক লক্ষটাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। তখন সরকারি প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে বেনারস ও পুনার সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা ও কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কমিটির সভ্যগণের মধ্যে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্ত্যবাদী এই দুই দলেরই লোক ছিলেন কিন্তু প্রাচ্যবাদীর দল অধিক শক্তিশালী থাকায় প্রাচ্যশিক্ষারই অধিক সহায়তা করা হয়।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে কমিটির কার্যকলাপের মধ্যে প্রথম হ'ল কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের সংস্কার। দ্বিতীয় কাজ, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও পরে আগ্রা ও দিল্লীতে একেকটি প্রাচ্যবিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য করা হ'ত এবং নদিয়ার টোলগুলির জন্য মাসিক একশত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, হিন্দুকলেজকে প্রথমে অর্থ সাহায্য করা ও শেষে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। কমিটির অন্য কাজ হ'ল ব্যাপকভাবে সংস্কৃত, আরবী ও পার্সী পুস্তকের প্রকাশ এবং বার্ষিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ইংরেজি থেকে প্রাচ্যভাষায় অনূদিত করার জন্য প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিত-গণের নিয়োগ। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাসিক ৭০ পাউণ্ড ব্যয়ের বরাদ্দ নিয়ে একটি সরকারি প্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর দ্বারা ১৫টি সংস্কৃত, দুইটি আরবী ও চারটি ফার্সী বই প্রকাশিত হয়েছিল। এর দশ বছরের কাজের সংগে কলিকাতার স্কুল-বুক-সোসাইটির প্রথম চার বৎসরের কাজের তুলনা করলে দেখা যাবে কেবল যে এদের কাজের পরিমাণ কম ছিল তা নয়, জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রকাশিত বইগুলির চাহিদাও ছিল না।

বস্তুত. সরকারের প্রচারিত প্রচারবিদ্যার জন্য এ-দেশের লোকের আগ্রহ ছিল না, তারা ইংরেজিশিক্ষার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায় সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত জি-সি-পি-আইয়ের কাজের বিষয়ে বড়লাট লর্ড ওয়েলিসলিকে একটি স্মারকলিপি দেন। তাতে তিনি সুপারিশ করেন যে কলিকাতার প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য গণিত, প্রাকৃতদর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হোক এবং কতকগুলি মেধাবী ছাত্রকে সরকারি অর্থে ইংলণ্ড থেকে

য়ুরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে' এনে তাদের অধ্যাপনাধীনে উপযোগী উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সমন্বিত কলেজ খোলা হোক।

যদিও তাঁর পত্রের কোন উত্তর দেওয়া হয়নি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল, তবু ঐ বৎসরেই বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য হিন্দুকলেজকে অর্থসাহায্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির কোর্ট অব্ ডিরেক্টররে প্রেরিত এক পত্রে জানা যায় যে তাঁরাও পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য সুপারিশ করছিলেন। এই পত্রে লেখা হয় যে প্রাচ্যবিজ্ঞানের বইগুলি কালবারিত, ইতিহাসের বইগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে' নিলে প্রাচ্যভাষা না শিখেও ওই বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যাবে। তারপর বাকি থাকবে শুধু কাব্য,—কেবল কাব্য পড়ানোর জন্য কেউ কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করে না। এই পত্রের অনুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল "প্রয়োজনীয় বিদ্যা"—"হিন্দুবিদ্যা" নয়।

জি-সি-পি-আই উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং ঐ সালেই বড়লাটকে এক পত্রে জানায় যে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্যশিক্ষার বিরোধী এবং প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যশিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজনও আছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অপর পত্রে আবার বলা হয় যে সরকারি শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য সরকারি কাজের উপযোগী লোকের সৃষ্টি করা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ব্যতীত সে কাজ সম্ভব নয়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ক্রমশঃ ইংরেজি ভাষার প্রসারের কথা বলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের লিখিত তৃতীয় পত্রেও ইংরেজি শিক্ষার বিষয় আরো জোর করে' লেখা হয়।

অন্যদিকে কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে জনমত বলবত্তর হচ্ছিল। তার চাপেও সরকারি তাগিদে কমিটি তার নীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করতে বাধ্য হ'ল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যশিক্ষার প্রায় সব কলেজেই ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ামাত্র ছাত্রসংখ্যা ১৬৩ থেকে বেড়ে ২৭৯ হ'ল। তার ফলে কমিটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও কলিকাতার মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বেনারস ও দিল্লীতে একটি করে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া কলিকাতার মাদ্রাসায় ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও পাশ্চাত্ত্য শারীরতত্ত্ব পড়ান হ'ত।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কমিটির কার্যকলাপের প্রথম বিবরণী প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় যে তখন তার অধীনস্থ ১৪টি প্রতিষ্ঠানে ৩৪৯০ জন ছাত্র পড়তো এবং বার্ষিক আয় ২,৭৫,০৪০৲ টাকা ও ব্যয় ২,৬৩,৯৪৪৲ ছিল। এই রিপোর্টে স্বীকৃত হয় যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, হিন্দুকলেজের পূর্বতন ছাত্রদের দ্বারা অনেক ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল এবং কমিটির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন আসছিল যে সেগুলির বিষয়ে কিছু করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ে দেশে বৌদ্ধিক জাগরণের সাড়া পড়েছিল। ডিরোজিওর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' কলিকাতার "ইয়ং বেংগল" দলের আলোচনার কেন্দ্র ছিল আর হরম্যান জেওক্রে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রদের দিয়ে তাদের নিজস্ব বিতর্কসভা স্থাপিত করিয়েছিলেন। ছাত্রদের পত্রিকা 'এথিনিয়ম' ও 'পার্থিনন' হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যের সংগে বিদ্রোহের কথা প্রচার করতো এবং কর্তৃপক্ষের নিষেধে দুটিই অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। বিলিতি বইয়ের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেছিল এবং কৃতী ছাত্রেরা নূতনের অভাবে পুরানো বইয়ের ফেরিওয়ালার জন্য অপেক্ষা করে থাকত।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার ইতিহাসের বিশেষত্ব হ'ল, একদিকে শিক্ষাকমিটির প্রাচ্যবিদ্যার প্রচারের চেষ্টা ও অন্যদিকে ভারতবাসিগণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার, বিশেষভাবে ইংরেজিভাষাশিক্ষার চাহিদা। এই চাহিদার পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল ; বৃটিশরাজত্বে ইংরেজিশিক্ষা অধিক অর্থকরী বলে গণ্য হ'ত এবং আদালতের প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজি জানা আইনজীবীদের প্রচুর অর্থাগম হ'ত। তাছাড়া এমন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষের কারণেও এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার করতে চাইতেন।

এইভাবে জি-সি-পি-আইয়ের উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও মিশনারিদের চেষ্টায় এবং রামমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গের উৎসাহে ইংরেজিশিক্ষা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করছিল। কমিটির মূলনীতি প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে প্রবর্তিত হলেও মিশনারিদের ও সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সাহায্য দেওয়া হ'ত এবং পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান এরূপ সাহায্য পেত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবাদীদের সংঘর্ষ ভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যেও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

ডিরোজিও-রিচার্ডসন প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ভারতীয় সংস্কৃতি ও খৃষ্টধর্ম উভয়ের বিরোধী ও বিপ্লবাত্মক লৌকিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা হিন্দুধর্মের নিন্দা করতেন, জাতিভেদ প্রথাকে প্রগতিবিরোধী বলতেন এবং নিজেদের স্বাধীনচেতা ও সত্যান্বেষী ব'লে ঘোষণা করতেন। এঁদের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভিন্ন "ইয়ং বেংগল" নামে কুখ্যাত, অনাচারী দলের সৃষ্টি হয়।

রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যবাদীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কার করতে চাইতেন।

রাধাকান্তদেব প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তি সংস্কারবিরোধী ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাকে জাতিধর্মনাশকারী ব'লে তার বিরোধিতা করতেন।

এই সময়ে যে সব প্রতিষ্ঠান ছিল তার মধ্যে সরকারি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার স্কুল ও কলেজ এবং মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজিবাংলা স্কুল ও কলেজ প্রধান। ভারতীয় সাধারণের স্বপ্রচেষ্টা এই বিশ বছরের মধ্যে আরম্ভ মাত্র হয়েছিল। মিশনারিদের কাজেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারিত ছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সরকারি পত্রে দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকগণের স্বার্থরক্ষার ও দেশজ শিক্ষাবিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওই প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত ধ্বংসমুখে পতিত হচ্ছিল। এই ধ্বংসশীলতা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে লক্ষ্য করেননি তা নয়, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানও হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষাখাতে এত কম অর্থ বরাদ্দ ছিল যে কমিটির পক্ষে জনশিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিলনা।

তখনকার শিক্ষা নীতি ছিল "চুঁইয়ে নামার" নীতি। অর্থাৎ ফিলটারের ওপরের আধারে জল দিলে সেই জল যেমন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচের আধার পর্যন্ত চলে যায়, তেমনি, সরকার মনে করতেন যে দেশের উচ্চশ্রেণির লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেই শিক্ষা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

এইভাবে এই সময়কার বাদানুবাদগুলি প্রধানত উচ্চশিক্ষার অভিমুখী হওয়ায় প্রাথমিক ও মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষপাতিগণের প্রাধান্য কমে যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উচ্চশিক্ষাবাদিগণের সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। জি-সি-পি-আইয়ের প্রধান সভ্যগণ ওরিয়েন্টাল পার্টি বা প্রাচ্যবাদী দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন আর কোম্পানির সাহেব সিভিলিয়নদের মধ্যে অন্যান্য অনেকে পাশ্চাত্ত্যবাদী বা ইংলিশ পার্টির লোক ছিলেন। কমিটিতে কোন ভারতীয় সভ্য না থাকলেও দেশবাসীরা যে ইংরেজি শিক্ষা চাইছিল তার প্রচুর প্রমাণ ছিল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ক্রমশঃ কমিটির অভ্যন্তরে পাশ্চাত্ত্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দুই দলের শক্তিসাম্যের ফলে কমিটির পক্ষে কোনো স্থায়ী নীতি গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়! সাধারণভাবে কমিটিতে অচল ব্যবস্থা বর্তমান থাকতো ও সভাপতির শেষ বিচারে কার্যনির্বাহ হ ত, কিন্তু কোনদিন কোনো পক্ষের সভ্য অনুপস্থিত থাকলে অপরপক্ষ ভোটের আকস্মিক আধিক্যে নীতির পরিবর্তন করতে পারতো। প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তনের পর থেকে এদের নীতিগত পার্থক্যও বেশি ছিল না. কেবল সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার অভাবই কলহের বৃদ্ধি করেছিল। এইভাবে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ অবধি কোনক্রমে কাটিয়ে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষ বাধ্য হয়েই সরকারি মধ্যস্থতা প্রার্থনা করে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পটভূমিরও পরিবর্তন হয়েছিল। ১৮১৩ থেকে কুড়ি বৎসর পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ আবার নূতন করে দেওয়ার সময় এলো। তখন অন্যান্য বিষয়ের সংগে শিক্ষাবিষয়েরও আলোচনা হ'ল। শিক্ষার জন্য দেয় অর্থ বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে একলক্ষ পাউণ্ড করা হ'ল, কিন্তু শিক্ষাসূত্রটির কোনো পরিবর্তন সাধিত হ'ল না। অপরপক্ষে তখনকার ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মতবাদের সাফল্যের ও ভারতে কোম্পানির অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থার ফলে অন্য কতকগুলি সূত্র সনন্দের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল যার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর পড়েছিল।

একটি সূত্রে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে জাতি বা ধর্মের কারণে কোনো ভারতবাসী কোম্পানির সরকারি কোনো পদের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবেন না। এক সূত্রে বলা হ'ল যে য়ুরোপ ও আমেরিকার যে কোনো দেশ থেকে মিশনারিরা ভারতে এসে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ পাবেন ;—এক সূত্রে ভারতের অন্যান্য প্রেসিডেন্সির ওপর রাষ্ট্রব্যাপারে বাংলার কর্তৃত্ব দৃঢ় করে' কোম্পানির শাসনকে অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত করা হ ল এবং অপর সূত্রে আইনসম্বন্ধীয় সমস্যা সমূহের সমাধান করার জন্য বড়লাটের পরিষদে একজন আইনসদস্যের নিয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হ'ল।

মেকলে ও বেণ্টিংক

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে শিক্ষাখাতে বর্ধিত ব্যয়ের এবং য়ুরোপের সব দেশ থেকে খৃষ্টান মিশনারিদের ভারতে আগমনের সুবিধার ব্যবস্থায় এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা নিহিত থাকলেও সাধারণ শিক্ষা কমিটির আভ্যন্তরীণ অচল অবস্থা ওই প্রসারের পথে বাধাস্বরূপ ছিল।

এই অচল অবস্থা দূর করেন লর্ড মেকলে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের বিধানে বড়লাটের পরিষদের আইনসদস্যরূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিংক তাঁকে শিক্ষাকমিটির সভাপতির পদেও স্থাপিত করেন। এই পদে তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে সরকারের নিকট সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার দেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবাদীদের মতদ্বৈধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের শিক্ষাসূত্রের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে বড়লাট আইন সদস্যরূপে লর্ড মেকলের অভিমত চান। তদনুসারে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর প্রসিদ্ধ "মিনিট" বা প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন।

প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন যে এই সনন্দের শিক্ষাসূত্রে কেবলমাত্র প্রাচ্যশিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ফলে কোম্পানির ভারত-সরকারের তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার আইনগত অধিকার নেই। এই মতের খণ্ডন করে মেকলে তাঁর মিনিটে লেখেন যে ওই সূত্রে উল্লিখিত "সাহিত্য" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্যের প্রতি নির্দেশ করে, "ভারতীয় পণ্ডিতগণ" বলতে তাঁদেরও বোঝায় যাঁরা লকের দর্শন ও মিল্টনের কাব্যে পারদর্শিতা লাভ করেছেন এবং "বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার" বলতে ইংরেজিশিক্ষার কথাও বোঝায়; কাজেই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল বলে' মনে হবে তারই প্রচার করার অধিকার সপার্ষদ বড়লাটের আছে।

জনমতের বিচার করে' লর্ড মেকলে লেখেন যে শিক্ষাকমিটির এ-যুক্তি যথার্থ নয় যে দেশের লোকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার বিরোধী; বরংচ তারা যে ইংরেজিই শিখতে চায় তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ দেশপ্রেমিক নেতৃবর্গও সেই দাবীই করেছেন।

ভার্ণাকুলারিষ্টদের মতের খণ্ডন করে' তিনি লেখেন যে আঞ্চলিক কথিত ভাষা-

গুলিতে কোনো সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় বস্তু নেই এবং সেগুলি এত নিকৃষ্ট ও অমার্জিত যে অপর কোনো স্থান থেকে পুষ্টিলাভ না করা পর্যন্ত সেগুলিতে মূল্যবান কোনো বিষয়ের অনুবাদ করাও সম্ভব নয়।

ওরিয়েন্টাল পার্টির মতের খণ্ডনে তিনি লেখেন যে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষাগুলি য়ুরোপীয় ভাষসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ভ্রান্তিতে পূর্ণ। আরো লেখেন যে, বিশুদ্ধ দর্শন, সত্য ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সাধারণের অর্থব্যয় করে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের নিকৃষ্টতা ইংরেজ ঘোড়ার ডাক্তারকেও লজ্জিত করে, যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ইংলণ্ডের বালিকাবিদ্যালয়ের মেয়েদের কাছেও হাস্যাস্পদ, যে ইতিহাস তিরিশ ফুট দীর্ঘ রাজা ও তিরিশ হাজার বৎসরব্যাপী রাজত্বকালের বিবরণে পূর্ণ এবং যে ভূগোল গুড় ও মাখনের সমুদ্রের কাহিনীমাত্র. সেইসব বিষয় পড়ানো উচিত কিনা, সেইটাই জিজ্ঞাস্য। লেখেন যে ধর্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও উদার হওয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হ'লেও যে নিকৃষ্ট সাহিত্য দ্বারা প্রধান প্রধান বিষয়সমূহে সাংঘাতিক ভ্রান্তিজনক ধারণার সৃষ্টি হয় সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করা অন্যায়। মিথ্যা ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি মিথ্যা ধর্মকে আশ্রয় করে' আছে বলেই যে সেগুলি শেখাতে হবে তার কোনো মানে নেই।

প্রাচ্যবাদীরা এই সময়ে বলেছিলেন যে কোম্পানী একবার প্রাচ্যশিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছে তার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার নেই। সেই যুক্তির খণ্ডনে মেকলে লেখেন যে এক নীতি অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হ'লে পরিবর্তে অন্য নীতির গ্রহণের অধিকার বৃটিশ কোম্পানির সরকারের নিশ্চয় আছে। একদিকে ইংরেজি পড়ার জন্য ভারতীয় ছাত্রগণ অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত, অন্যদিকে সরকারি বৃত্তিকে "ঘুষ" রূপে ব্যবহার করেও আরবী ও ফার্সী পড়ার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করা কঠিন। সরকারি শিক্ষাকমিটি প্রতি বৎসর বহু অর্থব্যয়ে বিশ হাজার আরবী ও সংস্কৃত বই ছাপছে কিন্তু সে-গুলি সরকারের গুদামেই পড়ে' থাকে ; অপরপক্ষে স্কুলবুকসোসাইটি বৎসরে সাত-আট-হাজার ইংরেজি বই বিক্রয় করে' মূলধনের ওপর শতকরা কুড়ি টাকা লাভ করছে। এইভাবে ছাত্রদের সরকারি টাকার ঘুষে ভুলিয়ে গাধা ছুঁলে অথবা ছাগল হত্যা করলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা শিখিয়ে তাদের যৌবনকাল নষ্ট করা অন্যায়।

ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও ইংরেজিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে মেকলে লিখেছেন যে ইংরেজি পাশ্চাত্ত্য ভাষাসমূহের মধ্যে প্রধান। যে ইংরেজি জানে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত। ইংরেজি ভারতের শাসক-

শ্রেণির ভাষা, শাসনকেন্দ্রসমূহের উচ্চশ্রেণির ভারতীয়গণও এই ভাষার ব্যবহার করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষা প্রাচ্য সমুদ্রতীরের বাণিজ্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হবে।

ভারতবাসিগণকে ইংরেজি শেখানর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মেকলে লেখেন যে য়ুরোপে গ্রীসরোমের বিদ্যা যেমন রেনেস্ঁাস এনেছিল ইংরেজি ভাষা ভারতে তেমনি নবজাগরণ আনবে। এই শিক্ষার ফলে রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, বুদ্ধি ও নীতির দিক দিয়ে ইংরেজ, এমন একদল লোকের সৃষ্টি হবে যারা উভয় জাতির মধ্যে সেতু রচনা করবে। উপরন্তু তারা নিজেদের আঞ্চলিক কথিত ভাষাসমূহকে মার্জিত করে' পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমৃদ্ধ করে' তুলবে।

মেকেলের প্রস্তাবাবলি প্রাচ্যবাদীদের নেতৃস্থানীয় মিঃ প্রিন্সেপের অভিমতের জন্য দেওয়া হ'লে তিনি এক পত্রে তার বিরোধিতা করে' লেখেন যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসূত্রের মেকলের ব্যাখ্যা ভুল এবং তাতে কেবলমাত্র প্রাচ্যশিক্ষার কথাই লেখা হয়েছে। উপরন্তু দেশের লোকের মতকে অগ্রাহ্য করে' আরবী ও সংস্কৃতশিক্ষার জন্য বরাদ্দ সাহায্য বন্ধ করা অসমীচীন এবং প্রাচ্যশিক্ষাকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে' ঘোষণা করা ভুল। তিনি আরো লেখেন যে বংগদেশের মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের সংগে কোম্পানির সরকারের একমাত্র যোগসূত্রস্বরূপ কলিকাতা মাদ্রাসাকে বন্ধ করা অন্যায়। তাঁর মতে তখন কেবলমাত্র হিন্দুসম্প্রদদায়ের একাংশ ইংরেজিশিক্ষা চাইছিল এবং মুসলমানেরা তার বিরোধী ছিল।

ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক পূর্ব থেকেই ইংরেজির প্রসারের জন্য উন্মুখ ছিলেন তিনি তাঁর পরিষদে লর্ড মেকলের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদনে এক প্রস্তাব (Resolution) স্থাপিত করলেন। সেই প্রস্তাব নূতন সরকারি নীতিরূপে গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাবের চারটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে লেখা হয় যে এরপর থেকে ভারতবাসীদের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রচারই কোম্পানির সরকারের উদ্দেশ্য হবে এবং শিক্ষার জন্য চিহ্নিত অর্থ ইংরেজিশিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

দ্বিতীয় অংশে, প্রাচ্যমতকে কথঞ্চিৎ শান্ত করার জন্য লেখা হয় যে, যতদিন এ-দেশের লোক প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা করতে চাইবে ততদিন একটিও প্রাচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে' দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমানের বেতনভুক অধ্যাপক ও বৃত্তিভোগী ছাত্রদের বেতন ও বৃত্তি বন্ধ হবে না, তবে বৃত্তির লোভ দেখিয়ে ছাত্র আকৃষ্ট করা আর হবে না এবং কোন অধ্যাপকের পদ খালি

হলে' সেই শ্রেণিতে যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র না থাকলে তাঁর স্থানে নূতন লোক নেওয়া হবে না।

তৃতীয় অংশে বলা হয় যে, প্রাচ্যশিক্ষাক্ষেত্রের ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা উদ্বৃত্ত অর্থ এদেশবাসীদের ইংরেজির মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য নিয়োজিত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য সপার্ষদ বড়লাট জি-সি-পি-আইকে অনুজ্ঞা দেন।

সপার্ষদ বড়লাট কর্তৃক এই নূতন নীতির অনুমোদনে প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়। শিক্ষাকমিটির দু'জন সভ্য পদত্যাগ করেন ও তাঁদের জায়গায় দু'জন ভারতীয় সভ্যকে মনোনীত করা হয়। মিঃ প্রিন্সেপ, মিঃ হজসন প্রভৃতি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন এবং রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব প্রচারিত হয়। একদল মুসলমান বড়লাটের নিকট লিখিত এক আবেদনপত্রে নূতন নীতির বিরোধিতা করে' জানান যে এরদ্বারা ভারতবাসীদের খৃষ্টান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অপরপক্ষে উচ্চশ্রেণির হিন্দুসম্প্রদায় ও খৃষ্টান মিশনারিগণ (যদিও বিভিন্ন কারণে) এই নৌতুন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

লর্ড বেন্টিংকের এই প্রস্তাব কোম্পানির সরকারের প্রচারিত প্রথম সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি। এরদ্বারা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের অচল অবস্থা দূর হয় এবং পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ধারা অবারিতভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকে। এইজন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বাস্তবিক পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার যুগ আরম্ভ হয়েছে বলে ধরা যায়।

সরকারের এই নূতন নীতি ভালো কি মন্দ এবং তাতে মেকলের দায়িত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথপ্রদর্শকস্বরূপ বলেন। কেউ বলেন যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রবর্তনের দ্বারা তিনি ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক অসন্তোষের স্থষ্টি করেছিলেন। আবার কেউ তাঁকে ভারতের কথিত ভাষাসমূহের অবহেলার জন্য দায়ী করেন এবং কেউবা প্রাচ্যসংস্কৃতির অপমান করার তাঁর নিন্দা করেন।

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতির গ্রহণ-বিষয়ে মেকলে একা দায়ী ছিলেন না। ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা এবং খৃষ্টান মিশনারিগণ প্রথমাবধি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করে চলে-ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট্য অংশ যে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাকামী ছিল তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালয়গুলির তুলনা করলেই প্রমাণিত হয়। বিলেতে সরকারের কর্তৃপক্ষ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং ভারতে বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিংক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ

থেকে ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সমর্থন করছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্ট প্রদত্ত মেকলের এক বক্তৃতায় জানা যায় যে তিনি ভারতে আসার আগেই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার অনুমোদন করতেন এবং সম্ভবত ভারতে আসার সময়ে তিনি কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো নির্দেশও পেয়ে থাকবেন।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার পক্ষীয় ভাবধারা ও পরিস্থিতি মেকলে সৃষ্টি করেননি এবং সপার্ষদ বড়লাটের অনুমোদন ভিন্ন তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী হ'তেও পারত না। তিনি তাঁর সবল উক্তি দ্বারা উইলিয়ম বেন্টিংককে উৎসাহিত করেছিলেন এবং বেন্টিংক সংস্কারকসুলভ সাহসের সংগে ওই উৎসাহকে কাজে রূপ দিয়েছিলেন। এইজন্য পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার দায়িত্ব ঐতিহাসিক পরিণতি, মেকলে ও বেন্টিংক এ তিনের মধ্যে সমভাবে বণ্টনীয়।

তারপর জিজ্ঞাসা করা যায় ইংরেজিশিক্ষা দেশের এবং জাতির কতটা উপকার বা অপকার করেছে।

মেকলে লিখেছিলেন যে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা ভারতে নবজাগরণ আনবে। সেই সময়ে ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজ এমন এক জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য দর্শনবিজ্ঞানের সংস্পর্শে না এলে দেশের ও জাতির জাগরণ সম্ভব হ'ত না। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দির ভারতীয় রেনেসাঁসের নেতৃবর্গের সকলেই ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত ও তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে মেকলের পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদ্বারা ভারতীয়দের রীতি-নীতি, বুদ্ধি ও রুচিতে ইংরেজ করে তোলার আশা ডাঃ ডাফের পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সহায়ে হিন্দুধর্মকে নাশ করার কল্পনার মতোই অসম্ভব ছিল। ভারতের নবজাগরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে, তাই ওই জাগরণের জন্য লুপ্তরত্নোদ্ধারকারী প্রাচ্যবাদীদের দানও অনেকাংশেই দায়ী ছিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টিতে কতদূর কার্যকরী হয়েছিল তার আলোচনা করতে গেলে মেকলের কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে হয়। ভারতে আসার আগে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, বৃটিশ পার্লামেণ্টে তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সমর্থনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা লাভ করে' ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাবে ও স্বদেশে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করবে এবং সেইদিন হবে বৃটিশ ইতিহাসের পরম গৌরবময় দিন। পরবর্তিকালে বৃটিশ ঐতিহাসিক রবার্টস মেকলের প্রণোদিত নীতির সমালোচনা করে' লিখেছেন যে তদ্দ্বারা বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়িয়ে

সরকারি চাকুরে তৈরি করার হাস্যকর প্রয়াস হয়েছিল। বস্তুত মেকলের মিনিটের রচনার আগে থেকে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতির নেতৃত্বে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করলেও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার নূতন নীতি যে তাকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার ফলে মাতৃভাষার অবহেলা যে ঘটেছিল সে-কথা সত্য। বিংশ শতাব্দির প্রথমে লর্ড কার্জন বলেছিলেন মেকলের শীতনিঃশ্বাস মাতৃভাষার ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর থেকে তা উত্তরোত্তর ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। মেকলে মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমের স্থান থেকে বঞ্চিত অবস্থাকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে' উল্লেখ করেছেন এবং ইংরেজি শিক্ষিতদের দ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি ঘটলে তাকে সেই পদে পুনঃস্থাপিত করার আশাও দেখিয়েছেন ; কিন্তু তিনি ভারতে আসবার পূর্বেই খৃষ্টান মিশনারিগণ বহু সাধনায় ভারতীয় মাতৃ-ভাষাগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন, অন্তত সে-দিকে লক্ষ্য করেও মেকলের ঐভাষাগুলির বিষয়ে সশ্রদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

বস্তুত ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তনে বহু উপকার হলেও তাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করায় প্রচুর হানি ঘটেছিল। ভারতবাসীর জীবনে শিক্ষা বিজাতীয় ফলপ্রসূ হয়েছিল, ব্যক্তি ও জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে' ফেলেছিল এবং পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার দ্বারা মাতৃভাষার পরিণতির পথ বহুদিনের জন্য বাধাগ্রস্ত করেছিল।

মেকলের সর্বাপেক্ষা বেশি দোষ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে অসভ্য ভাষার প্রয়োগে। তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার পক্ষপাতিত্বের জন্য প্রস্তুত হয়ে স্বভাবগত ঔদ্ধত্য ও অতিরঞ্জনের সংগে স্বমত ব্যক্ত করেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতার দোহাই দেওয়া সহজ নয়, কেননা তাঁর স্বদেশবাসী প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্-গণের নিকট তিনি স্বচ্ছন্দে সত্যকথা জেনে নিতে পারতেন। তিনি ভারতীয় পুরাণাদির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা মিথ্যা অপেক্ষা অধিক হানিকর অর্ধসত্যমাত্র। উপরন্তু যে বিদ্রূপপূর্ণ ভাষার ব্যবহার করেছিলেন তা ভদ্রতা-সংগত নয় এবং তাঁর মতো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পক্ষে অশোভন।

তাঁর উদ্দেশ্যের সততাকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাদামানুষের ভারবাহী, সাম্রাজ্যবাদী ভংগী দেশবাসীর পক্ষে অসহনীয় হয়েছিল। এইজন্য কেউ কেউ তাঁকে এদেশে ইংরেজ-বিদ্বেষের জনক বলেও অভিহিত করেছেন।

উইলিয়ম এডাম

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের কোর্ট অব্ ডিরেক্‌টর্সে'র পত্রে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের কথা লেখা হয়েছিল। সেই নির্দেশানুসারে মাদ্রজের গভর্ণর স্যর টমাস মন্‌রো ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ সংগৃহীত তথ্যসমূহ নিয়ে একটি বিবৃতি রচনা করেন। তাতে লেখা হয়েছিল যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সেই সময়ে ১২,৪৯৮টি দেশজ বিদ্যালয়ে ১,৮৮,৬৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল এবং জনসংখ্যার (১,২৮.৫০,৯৪১) অনুপাতে প্রতি পাঁচশত জনের মধ্যে একটি বিদ্যালয় ছিল। মেয়েরা মোটেই শিক্ষা পেতনা বলে' তাদের বাদ দিয়ে মন্‌রো হিসাব করেছিলেন যে পাঁচ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের একতৃতীয়াংশ বা জনসংখ্যার এক নবমাংশ কিছু না কিছু শিক্ষা পাচ্ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তদন্ত হয় এবং ১৮২৫ ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিবৃতিও প্রকাশিত হয়, কিন্তু সংগৃহীত তথ্যগুলি পরস্পরবিরোধী বলে নির্ভরযোগ্য হয়নি। দিল্লী ও নাগপুর জিলায়ও সামান্য তদন্ত হয় এবং জি-সি-পি-আইয়ের কোন কোন সভ্য ব্যক্তিগতভাবে তথ্যসংগ্রহ করেন, কিন্তু এই বিবরণ-গুলিও অস্পষ্ট। বাংলাদেশে মিশনারি রেভারেণ্ড ওয়ার্ড একটি বিবরণী রচনা করেছিলেন এবং জি-সি-পি-আইয়ের সভ্যগণও কিছু কিছু লিখেছিলেন. কিন্তু মিঃ এডামের আগে ব্যাপকভাবে তথ্যসংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

স্কটল্যাণ্ডের ডমফ্রিশায়ারের অধিবাসী মিঃ উইলিয়ম এডাম ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারিরূপে ভারতবর্ষে আসেন। কিছুদিন শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সংগে কাজ করার পর রামমোহন রায়ের বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একেশ্বর-বাদী (Unitarian) হয়ে মিশন পরিত্যাগ করে সাংবাদিকরূপে এদেশের জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি "ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল্" নামক কাগজের সম্পাদনা করেন, কিন্তু সরকারি দমনে এটি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। তার-পর তিনি ১৮২৯ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "ইণ্ডিয়ান গেজেট" ও ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "বেংগল হরকারু" নামক ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলাদেশের গ্রাম্যশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংককে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তর না পেয়ে আবার ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে লিখে জানান যে তিনি স্বয়ং

সেই কাজের ভার নিতে প্রস্তুত আছেন। লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, মেকলের শিক্ষানীতির অনুমোদনের মাত্র কয়েকদিন আগে, পরিষদে এক প্রস্তাব নিয়ে ওই আবেদন মঞ্জুর করেন। পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র লর্ড মেকলে ওই পত্রে স্বাক্ষর করেননি। পত্রদ্বারা মিঃ এডামকে বাংলাদেশের দেশজ শিক্ষাসম্বন্ধীয় তদন্ত-কমিশনের একক কমিশনার নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর অনুসন্ধান কয়েকটিমাত্র জিলার মধ্যে আবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এই তদন্তে জি-সি-পি-আইয়ের আঞ্চলিক কমিটিসমূহের সাহায্য পেয়েছিলেন। তিন বৎসরের অনুসন্ধানে তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটি রিপোর্ট লেখেন।

এডামের প্রথম রিপোর্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় তার বর্ণনা করে' পূর্ববর্তী কতক-গুলি সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্টের বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে। দেশজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত দুই শ্রেণির ছিল,—প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল না। তাছাড়া গৃহশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক কোনো ধর্মীয় ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্কবিহীন এবং স্থানীয় সাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিসম্বন্ধীয় আলোচনায় মিঃ এডাম জি-সি-পি আইয়ের কোনো সদস্যের পূর্ববর্তী উক্তির ওপর নির্ভর করে' লিখেছেন যে বাংলায় তখন একলক্ষ মক্তব ও পাঠশালা ছিল, অর্থাৎ প্রতি তিনটি গ্রামের মধ্যে দু'টি, পূর্ণ জনসংখ্যার প্রতি চারশত জনের ও বিদ্যালয়বয়সী (৫-১৪) প্রতি তেষট্টিজনের মধ্যে একটি বিদ্যালয় ছিল। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা কঠিন বলে' তিনি আরো লিখেছেন যে সাংখ্যানুপাতিক হিসাব ব্যতীত এইটুকু বলা যায় যে বাংলা-দেশে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

মিঃ এডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে রাজশাহী জিলার নাটোর থানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এই থানার জনসংখ্যা, বিদ্যালয়ে পাঠের উপযুক্ত বয়সের বালকবালিকার সংখ্যা এবং পাঠশালা ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যার আলোচনা দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, বাংলা, আরবী ও ফার্সী বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বসমেত ৩৭টি প্রতিষ্ঠানে ২৬২ জন ছেলেপিলে পড়ছিল এবং আরো ১৫৮৮ পরিবারে ২৩৮২টি ছেলেপিলে গৃহশিক্ষা

পাচ্ছিল। ছেলেদের বিদ্যালয়প্রবেশের ও পরিত্যাগের বয়সের গড় যথাক্রমে আট ও পোনেরো বৎসর ও শিক্ষকদের বেতনের গড় ৫॥০ টাকা ছিল।

ওই থানার ৩৮টি টোল ও চতুষ্পাঠীতে ৩৯৭টি ছেলে পড়ছিল। তাদের বিদ্যালয় প্রবেশ ও পরিত্যাগের বয়সের গড় যথাক্রমে ১১ আর ২৭ বৎসর ছিল। তাদের মধ্যে ১৩৬টি ছেলে নিজের গ্রামের টোলে আর বাকি ২৬১ জন ভিন্ন গ্রামে গিয়ে পড়াশোনা করছিল; তাদের শিক্ষা, খাওয়া ও থাকার জন্য কোনো অর্থ দিতে হ'তনা।

স্ত্রীশিক্ষার অস্তিত্ব প্রায় ছিল না, এডাম লিখেছেন যে স্ত্রীজাতি "অজ্ঞতার গভীর ও হতাশাপূর্ণ অন্ধকারে" বাস করতো, কেবল সম্ভ্রান্ত পবিবারের মেয়েদের গোপনে স্ত্রীধনের রক্ষণাবেক্ষণোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রধানত চার স্তরে ভাগ করা হয়েছে, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, প্রাথমিক-শিক্ষিত ও সাক্ষরমাত্র। উচ্চশিক্ষিতদের, যারা শিক্ষকতা করে ও যারা করে না—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষিতদেরও অনুরূপ দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাছাড়া প্রাথমিকশিক্ষালব্ধ অনেকেও প্রাথমিকশিক্ষা-দানে নিযুক্ত ছিল। যারা কষ্টে সামান্য লিখতে, পড়তে ও নিজের নাম সই করতে পারে তাদের সাক্ষরমাত্রের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। ওই সব শ্রেণির লোক মিলিয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুপাত জনসংখ্যার ৩·১% বলে' গণ্য করা হয়েছে। কেবল পুরুষদের মধ্যে হিসাব করলে ওই অনুপাত ৬·১%। ওই হিসাব থেকে শিক্ষার ব্যাপ্তির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

এডামের প্রদত্ত গ্রাম্য পাঠশালার বর্ণনায় তখনকার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। ধরাইল গ্রামের পাঠশালাটির কথা ধরা যাক। গ্রামস্থ চারটি চৌধুরী পরিবারেব দ্বারা ওই বিদ্যালয় পৃষ্ঠপোষিত ছিল। এদের মধ্যে একজনদের বাড়ির একটি ঘর বিদ্যালয়কে ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত এবং পরিবারে পাঁচটি ছেলের বেতনরূপে অপর তিনজনের একজনের কাছে মাসিক চার আনা, একজনের কাছে আট আনা ও তৃতীয় জনের কাছে বারো আনা পাওয়া যেত। এ-ছাড়া অন্যান্য ছাত্রও পাঠশালায় পড়তো। গ্রামস্থ সাতটি ছেলের একজনের কাছে এক আনা, একজনের কাছে তিন আনা ও বাকি পাঁচজনের মাথাপিছু চার আনা হিসেবে পাঁচসিকে পাওয়া যেত। তাছাড়া তারা গড়ে মাসিক চার আনার পরিমাণে মাছ, তরকারি, কাপড় প্রভৃতি উপহার দিত। আধক্রোশ দূরের কাগবেড়িয়া গ্রাম থেকে আরো পাঁচজন ছেলে পড়তে আসতো। আসার পথ দূর না হ'লেও বর্ষাকালে

তাদের নৌকায় আসতে হ'ত। তাদের মধ্যে দু'জনে দু'আনা আর তিনজনে চার আনা দিত। বেতন ও উপহার নিয়ে শিক্ষকের মাসিক আয় সর্বসমেত ৩৷৵০ আনা ছিল। মিঃ এডাম এরূপ আরো বিদ্যালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু এই একটি থেকেই তৎকালীন গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থার কথা অনুমান করা যায়।

ফার্সীশিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। গড়ে সাড়ে চার থেকে তের বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকেরা ফার্সী বিদ্যালয়ে ঢুকতো আর বারো থেকে সতেরো বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ছাড়তো। শিক্ষার ব্যাপ্তি ছিল চার থেকে আট বৎসরকাল। এগুলির শিক্ষকরা পাঠশালার গুরুদের চেয়ে কিছু বেশি শিক্ষিত ছিল এবং তাদের মাসিক বেতনের গড় ছিল সাতটাকা। সাধারণত অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতো, আবার কখন কখন নিঃসন্তান, ধার্মিক মুসলমানেরাও পুণ্যার্জনের আশায় বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করতো। এডামের বর্ণিত একটি বিদ্যালয়ে স্থাপনকারী দুই পরিবারের সন্তান ব্যতীত অন্য দশটি ছেলেকে বিনাব্যয়ে শিক্ষা, খাওয়া ও পরা দেওয়া হ'ত। নাটোরের চারটি ফার্সী বিদ্যালয়ের মধ্যে দুটির দানলব্ধ বাড়ি ছিল আর দুটি ধনী ব্যক্তিদের বাইরের ঘরে বসতো। ছাপা বইয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল না বলে' হাতে-লেখা পুঁথি পড়ানো হ'ত। মিঃ এডাম এই শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতির একটি বিবরণ দিয়েছেন।

গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয় অপেক্ষা বেশি প্রচলিত ছিল। বিদ্যার মূল্য বোঝে, অথচ সামান্যতম বেতন দেবারও সাধ্য নেই, এমন লোকে ছেলেদের বাড়িতে পড়াতো, সংগে হয়তো আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের কয়েকটি ছেলেও পড়তো। কখন বা অতি দরিদ্র ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতায় ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতো। অপরপক্ষে, অপেক্ষাকৃত ধনিব্যক্তি, জমিদার, তালুকদার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, গোমস্তা, মোড়ল প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা অনেক সময়ে ছেলেদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিক্ষা পাঠশালার শিক্ষার চেয়েও সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ হ'ত। শিক্ষকেরা এত কম বেতন পেত যে তাদের আরো অন্যান্য কাজ করে' জীবিকা-নির্বাহ করতে হ'ত। পাঠশালার শিক্ষকরাও অনেক সময়ে দোকানদারী প্রভৃতি অন্য কাজ করতো।

ব্যবসায়ী, চাষী, কারিগর প্রভৃতিরা নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে সন্তানদের জাতিব্যবসা শেখাতো বলে' বৃত্তিশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা ছিল না।

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রকোপে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল।

এডামের তৃতীয় রিপোর্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। এটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে মুর্শীদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও দক্ষিণ বিহার এই চার জেলার দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ ও সাংখ্যানুপাতিক হিসাব দেওয়া হয়েছে। মিঃ এডাম লিখেছেন যে তৎপ্রদত্ত সংখ্যাগুলির বাস্তব অপেক্ষা কম হবার সম্ভাবনা, কারণ তথ্যসংগ্রাহকগণ সব সময়ে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেনি বলে' সব বিদ্যালয়ের খবর পাওয়া যায়নি। আবার, অনেক সময়ে সরকারি কর্মচারীর প্রতি অবিশ্বাসবশত স্থানীয় লোকেরা বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা গোপন করেছে।

এই রিপোর্টে প্রদত্ত প্রথম তদন্তের তালিকায় কেবল বিদ্যালয়গুলিকে গণনা করা হয়েছে, গার্হস্থ্যশিক্ষার হিসাব করা হয়নি। এই গণনায় প্রকাশ যে মুর্শীদাবাদ জেলায় ১,৮৬,৪৮১ অধিবাসীর মধ্যে ১১৩টি বিদ্যালয়ে ১৩৯৬ ছাত্র, বীরভূমে ১২,৬৭,০৬৭ অধিবাসীর মধ্যে ৯৩১ বিদ্যালয়ে ১৫,৮১৪ ছাত্র, দক্ষিণ বিহারে ১৩,৪০,৬১০ অধিবাসীর মধ্যে ৬০৫টি বিদ্যালয়ে ৫০৩৬টি ছাত্র ও ত্রিহুত জেলায় ১৬,৯৭,৭০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩৭৪টি বিদ্যালয়ে ১৩১৯টি ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। তাঁর প্রথম রিপোর্টের অনুমানের হিসাবে জনসংখ্যার প্রতি ৪০০ জনের পিছু একটি বিদ্যালয় থাকতে হ'লে মুর্শীদাবাদে ৪৬৭, বীরভূমে ৩১৬৮, বর্ধমনে ২৯৬৯, দক্ষিণ বিহারে ৩৩৫২ ও ত্রিহুতে ৪২৪৪টি বিদ্যালয় থাকার কথা (মিঃ হার্টগের হিসাব)।

অপরপক্ষে সে-সব স্থানে বিদ্যালয় ও গার্হস্থ্য শিক্ষাকেন্দ্র উভয়ের গণনা করা হয়েছে—সে-সব স্থানে একলক্ষ বিদ্যালয়ের হিসাব অসম্ভাব্য প্রতীয়মান হয় না। দুঃখের বিষয় ওই সম্পূর্ণ হিসাব মিঃ এডাম পাঁচটি জেলার সর্বত্র করতে পারেননি, কেবল কয়েকটি শহরে করেছিলেন। এই হিসাবে মুর্শীদাবাদে ৮৮টি বিদ্যালয় ও ২১৬টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৩০৪টি, দৌলতবাজারে ২৫টি বিদ্যালয় ও ২৫৪টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৭৯টি, নংগলিয়াতে ৩৬টি বিদ্যালয় ও ২০৭টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৪৩টি, কালনায় ১১৯টি বিদ্যালয় ও ৪৭৫টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৫৯৪টি, জাহানাবাদে ৯২টি বিদ্যালয় ও ৩৬০টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৪৫২টি এবং ভাওয়ারাতে ১৩টি বিদ্যালয় ও ২৩৫টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৪৮টি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। জনসংখ্যার প্রতি চারশত জনের জন্য একটি করে' বিদ্যালয় থাকতে হ'লে মুর্শীদাবাদে ৩১২,

দৌলতবাজারে ১৫৫, নংগলিয়াতে ১১৬, কালনায় ২৯১, জাহানাবাদে ২০৩ ও ভাওয়ারায় ১৬৪টি শিক্ষাকেন্দ্র থাকবার কথা (মিঃ হার্টগের হিসাব)। কাজেই দেখা যায় যে মিঃ এডামের অনুমানের অপেক্ষা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশিই ছিল। অবশ্য এই হিসাবের বিষয় তিনি নিজেই লিখেছেন যে গার্হস্থ্য শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাস্তব অপেক্ষা কিছু বেশী করে' ধরা হয়ে থাকতে পারে। আবার একথাও সত্য যে শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা যত বেশি হোকনা কেন ছাত্রসংখ্যার অল্পতাহেতু শিক্ষার প্রসার কমে আসছিল।

সাক্ষরতার সাংখ্যানুপাতিক তালিকায় মিঃ এডাম দেখিয়েছেন যে জন-সংখ্যার শতকরা হিসাবে মুর্শীদাবাদে ৭·৫১%, দৌলতবাজারে ৪·১৩%, নংগলিয়ায় ৫·৩%, কালনায় ৮·৯৯%, জাহানাবাদে ৪·৯১% ও ভাওয়ারায় ২·৩২% জন কোনো-না-কোন স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল। জেলা-হিসেবে সাক্ষরতার মান বর্ধমানে সর্বাপেক্ষা উঁচু ও ত্রিহুতে সর্বাপেক্ষা নিচু ছিল।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে সমাজের বর্ধিষ্ণু অবস্থায় যে গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, দুরবস্থার দিনে তার নামমাত্র বজায় ছিল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র পাওয়া সুকর ছিল না। বিদ্যালয়ের তুলনায় গার্হস্থ্য শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যাবাহুল্য দেখায় যে দেশের অধিকাংশ লোক ছেলেপিলের শিক্ষার জন্য মাসিক একাধ-আনা পয়সাও ব্যয় করতে অসমর্থ ছিল। উপরন্তু ধনীরা নিজেদের ছেলেপিলেদের পৃথক ব্যবস্থা করেছিল বলে' প্রাচীন সামাজিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সত্বর ধ্বংস হয়ে চলেছিল।

এই অঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯০টি টোল ও ২৯১টি আরবী ও ফার্সী বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে।

মিঃ এডামের অনুমানে বাংলাদেশে ১৮০০ টোল ও ১২,৬০০ অধ্যাপকের অস্তিত্ব ছিল। তিনি টোলগুলিকে, পাঠ্যবিষয়ের দিক থেকে, যেগুলিতে ব্যাকরণ, অলংকার ও সাহিত্য পড়ানো হ'ত, যেগুলিতে ধর্ম, নীতি ও পুরাণ পড়ানো হ'ত এবং যেগুলিতে ন্যায় পড়ানো হ'ত, এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। অনুসন্ধান-কৃত অঞ্চলে ১৯০টি টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে চারজন জাতিতে বৈদ্য ও অপর সকলে বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিল। তাদের বয়সের গড় ছিল ৪৫·২ বৎসর এবং বার্ষিক আয়ের গড় ছিল ৬৩৷১০। অধিকাংশ টোলের নিজের বাড়ি ছিল, যেগুলির ছিল না, সেগুলি কোনো ধনীর বৈঠকখানা বা চণ্ডীমণ্ডপে বসতো। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও সামান্য কয়জন অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিল।

ব্যাকরণ সর্বাপেক্ষা বেশি পড়ানো হ'ত, তারপর নীতি ও ন্যায়; সাহিত্য, অভিধান ও পুরাণ অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ছাত্র পড়তো। অপরাপর বিষয় খুবই কম। বেদপাঠের উল্লেখ এডাম করেননি।

আরবী ও ফার্সী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বয়সের গড় ছিল ৩৪.২ বৎসর। তারা সাধারণত মুসলমান হ'লেও একজন হিন্দু কায়স্থের উল্লেখ আছে। তাদের মাসিক আয়ের গড় ছিল প্রায় ৫।০। ২৯১টির মধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের ঘর ছিল, অন্যগুলির ছাত্রেরা কারো বাড়ীর দাওয়ায় বসে' পড়া করতো। বিদ্যালয়প্রতি ছাত্রসংখ্যার গড় ছিল ৫.১। আরবীর ছাত্র ছিল ৬০ জন মুসলমান আর ফার্সী পড়তো ৮৬৫ জন হিন্দু ও ৫৫৯ জন মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে ৭১১ জন জাতিতে কায়স্থ ছিল। সম্ভবত রাজকীয় কাজকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য হিন্দু কায়স্থরা অধিক সংখ্যায় ফার্সী পড়তো।

এই বিবরণের সঙ্গে মিঃ এডাম দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত ক্ষীয়মানতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেতন জোগাতে না পেরে ছাত্রসংখ্যা কমছিল এবং বেতনের হার ও পরিমাণ কমে' যাওয়ায় শিক্ষকগণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই অধঃপতনের অপর কারণ ছিল, দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে শ্রেণির লোকেরা এই ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা করতো সেই শ্রেণিই তখন লুপ্ত হ'তে বসেছিল। মিঃ এডাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ এবং বেশ কিছুদিন ধরে' এই অবস্থা চলে এসেছে"।

তৃতীয় রিপোর্টের শেষ অংশে মিঃ এডাম তাঁর নিজ মন্তব্য ও পরিকল্পনা নিবদ্ধ করেছেন। তিনি শিক্ষার "চুঁইয়ে-নামার" আদর্শকে অস্বীকার করে' সরকারী জিলাস্কুল-স্থাপনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এই নীতিতে দেশজ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে। যে শিক্ষা বৃটিশের আগমনের আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যারদ্বারা পুরুষানুক্রমে ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের চরিত্র গঠিত হয়ে এসেছে, সেই ব্যবস্থাকে অবহেলা করা অন্যায় ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। 'চুঁইয়ে-নামার' নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ব্যক্তির শিক্ষা সুরু হয় গোড়া থেকে, বর্ণপরিচয়ের জন্য লোকে কলেজে যায় না। কোন প্রাসাদকে উচ্চ ও দৃঢ় করতে হ'লে তার ভিত্তি প্রশস্ত ও গভীর করা চাই এবং সর্বনিম্ন স্তর থেকে আরম্ভ করে' প্রত্যেক ধাপের শিক্ষাকে পারম্পরিক সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করাতেই সাফল্যের একমাত্র সম্ভাবনা।

দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, স্থিতিশীল, উন্নতিশীল বা ক্ষয়শীল, যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন সেগুলিই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার একমাত্র সত্য ও দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের রীতিনীতি ঐতিহ্য ও স্বভাবের উপযোগী এবং লোকের চরিত্রোন্নয়নের সর্বাপেক্ষা সহজ, নিরাপদ, জনপ্রিয়, সুলভ ও সহজ অস্ত্রস্বরূপ। এই চিরাচরিত প্রথার অনুকরণ ভিন্ন দেশবাসীর সহায়তা আকর্ষণ করা সম্ভব নয় বলে এগুলিকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাসংস্কার স্থায়ী বা কার্যকর হ'তে পারবে না।

মিঃ এডাম লিখেছেন যে বিদ্যালয়গুলির মানের নিম্নতার জন্য এগুলির সংস্কার করে' তবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এবং তার একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন।

পরিকল্পনার প্রথমে লেখা হয়েছে যে এটি কার্যক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করে কিনা দেখবার জন্য আগে দুয়েকটি জেলায় এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতে হবে। পরীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট করে' তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী সেখানের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয় তদন্ত করতে হবে।

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী বাংলা, হিন্দী ও উর্দু পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করতে হবে।

প্রত্যেক জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিরূপে একজন পরীক্ষক (Examiner) নিযুক্ত করতে হবে। তিনি পূর্বোল্লিখিত তদন্তের অনুষ্ঠান করেন. শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তকগুলির ব্যবহার বুঝিয়ে দেবেন, পরীক্ষা নেবেন, পুরস্কার দেবেন ও সাধারণ ভাবে পরিকল্পনার প্রয়োগের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি জি-সি-পি-আইয়ের আঞ্চলিক কমিটির সহযোগিতায় কাজ করবেন।

পরিকল্পনার কাজের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়দেরই পুরস্কৃত করা হবে। বইগুলি শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করে' সেগুলি তাদের পড়তে ও পড়াতে উৎসাহিত করতে হবে, ছাত্রদের সাফল্যের জন্য ছাত্র ভিন্ন শিক্ষকও পুরস্কার পাবে এবং শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য আদর্শ 'নর্মাল স্কুল' স্থাপিত করা হবে। সেখানে বৎসরে দু'তিনমাস করে' চার বৎসরে গুরুমহাশয়দের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। এতে ছাত্রদের পড়ায় বাধা না ঘটিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হবে।

গুরুমহাশয়দের গ্রামে বসবাসে প্রলুব্ধ করতে সরকার বিদ্যালগুলির জন্য ভূমিদান করবেন।

এডামের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই মেকলে পাঠশালার ও গুরু-মহাশয়দের মানোন্নয়নের চেষ্টাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষকশ্রেণির সৃষ্টির পর প্রাথমিক শিক্ষার কথা চিন্তা করা যাবে। লর্ড বেন্টিংকও মিঃ এডামের নিয়োগপত্র দেবার পরই স্বদেশে ফিরে যান। এ বিষয়ে নিষ্পত্তির দায়িত্ব পড়ে পরবর্তী বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের ওপর। জি-সি-পি-আইয়ের অনেক সভ্য এডামের পরিকল্পনাকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী থাকলেও তিনি সেটিকে মুলতুবী রাখাই স্থির করেন। এই-ভাবে সরকারের দ্বারা মিঃ এডামের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হলেও পরবর্তী কালের ব্যবস্থায় তাঁর আদর্শের প্রভাব অনেক পরিমাণে পড়েছিল বলে' তাঁর রিপোর্ট আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করেছিল বলা যায়।

এই ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধির এক উক্তির প্রতিবাদ-কল্পে মিঃ ফিলিপ হার্টগ এডামের রিপোর্টকে কল্পিত অত্যুক্তিপূর্ণ বলে' বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন যে এডামের উল্লিখিত একলক্ষ বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং শিক্ষার প্রসারের কথাও অনেক বাড়িয়ে বলেছেন। ভারতের অনেক শিক্ষাবিদ্ হার্টগের ওই সমালোচনাপূর্ণ উক্তির খণ্ডন করেছেন।

প্রথমত, এডাম তাঁর একলক্ষ বিদ্যালয়ের কথাটি পূর্ববর্তী বিবরণসমূহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র এবং তাঁর অনুসন্ধানে পূর্ব ও পরবর্তী উক্তির তুলনায় দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অনুমান থেকে অগ্রসর হয়ে শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ওই ব্যবস্থাটি আত্যন্তিকরূপে ধ্বংসোন্মুখ।

দ্বিতীয়ত তাঁর সংগৃহীত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ ছিল না,—ব্যাপকভাবে তথ্য-সংগ্রহের অনুমতি তিনি পাননি এবং যা সংগ্রহ করেছিলেন তা সর্বাংশে নির্ভর-যোগ্য নয় বলে' তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। তথাপি তাঁর রিপোর্টের যেখানে গৃহশিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে গণনা করা হয়েছে সেখানের সাংখ্যানুপাতিক হিসেবে এডামের উক্তির সত্যতা প্রতিভাত হয়। ফিলিপ হার্টগ গার্হস্থ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল্য বোঝেননি। টোল-পাঠশালা-চতুষ্পাঠি-মক্তব-মাদ্রাসা ও গৃহশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের এক মহা অন্ধকারময় যুগে শিক্ষার ক্ষীণশিখাটিকে যে কি-ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

শ্রীরামপুরের মিঃ ওয়ার্ডের বিবৃতিতে আছে যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে

বিদ্যালয় ছিল। এমন কি লর্ড মেকলেও বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ৮০,০০০ বিদ্যালয় আছে। মাদ্রাজের সংগৃহীত গ্রামশিক্ষাবিষয়ক বিবৃতি এডামের রিপোর্টের এত বেশি অনুরূপ যে হয় দুটিকে সত্য নয় দুটিকেই মিথ্যা বলতে হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ভারতের সাক্ষরতার পরিমাণ জনসংখ্যার অনুপাতে ৭৩·% প্রকাশিত ওহয়ায় গান্ধিজি তার সংগে এডামের সময়ের ৬·১%এর তুলনা করে' বলেছিলেন যে বৃটিশ সরকার অশীতিপর বর্ষকালে ১%এর কিছু অধিক সাক্ষরতা দিয়েছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে এটুকু স্বীকার করা যায় যে মিঃ এডাম যেখানে পূর্ণ জনসংখ্যার হিসেব করেছেন সেখানে সাক্ষরতার পরিমাণ ৩·১%!

বস্তুত, মিঃ এডামের সাংখ্যানুপাতিক হিসেব ঠিক হোক আর ভুলই হোক, তিনি যে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার এক অতি বাস্তব মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া, তাঁর রিপোর্টে সর্বপ্রথমে এক সর্বাংগীন জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, জনশিক্ষার দাবী স্বীকৃত হয়েছে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

১৮৩৫—১৮৫৪

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লইলিয়ম বেন্টিংক নূতন সরকারি শিক্ষানীতির প্রবর্তন করে' দেশে ফিরে যান। এই নীতিকে কাজে পরিণত করার ভার পড়লো পরবর্তী অস্থায়ী বড়লাট স্যর চার্ল্‌স্ মেটকাফের ওপর। তিনি বড়লাটের পদ পেয়ে 'জিলাস্কুলের' প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেছিলেন বটে কিন্তু সংগে সংগে দেশে সাংবাদিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে' কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে' তাঁকে তাঁর পদে স্থায়ী করেননি।

এই কারণে, ওই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দেই লর্ড অকল্যাণ্ড বড়লাট নিযুক্ত হয়ে কলিকাতায় আসলেন। তখনকার শিক্ষানীতি অনেকাংশে বড়লাটের ব্যক্তিগত মতের ওপর নির্ভর করত বলে' তাঁর আসার সংগে সংগে প্রাচ্যবাদীরা আবার নূতন উদ্যমে নিজেদের দাবী ঘোষণা করতে লাগলো, কলিকাতা মাদ্রাসা আর সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা তাদের বৃত্তিগুলি বন্ধ করে' দেওয়ায় বিরুদ্ধে আপত্তি জানালো আর অন্যদিকে এডাম, হজসন, উইলকিনসন প্রভৃতি সাহেবদের নেতৃত্বে "ভার্নাকুলারিষ্ট"-দেরও শক্তি বর্ধিত হয়েছিল, কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড আসার পর থেকে নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে' ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেননি।

এই সময়ের মধ্যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির সানন্দের কতকগুলি বিশেষ সূত্রের প্রভাবে ইংরেজিশিক্ষার দ্রুত প্রসার হ'তে থাকে। সনন্দের ঘোষণায় ভারতীয়গণের সরকারি কর্মে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি থাকায় ইংরেজিশিক্ষার চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় আর বৃটিশ ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয় ও আমেরিকান মিশনারিরা ভারতে আসার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা ইংরেজিশিক্ষার নানান্ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত করতে থাকেন। উরন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সরকারি বিচারশালায় ফার্সীভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হওয়াতে ইংরেজি শিক্ষিতগণের সুযোগসুবিধা, তথা ইংরেজিশিক্ষার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে প্রাচ্যবাদীরাও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজিশিক্ষার গতিরোধের চেষ্টা সফল হবেনা এবং শিক্ষার অন্য প্রদত্ত সমুদয় সরকারি অর্থের দাবী তাঁরা করতে পারেন না। তাই তাঁরা অল্পে সন্তুষ্ট হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন!

কূটনীতিজ্ঞ অকল্যাণ্ড সহজেই অনুমান করেছিলেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-বাদীদের কলহের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং তার সংগে খানিকটা আহত আত্মাভিমানও জড়িত ছিল। তিনি মেকলের মতো হঠকারী বা বেন্টিংকের মতো সংস্কারক ছিলেন না ব'ল' এও বুঝতে পেরেছিলেন যে—সর্বদলীয় সহ-যোগিতা ভিন্ন এদেশে কোনো শিক্ষানীতি সাফল্য লাভ করবে না। তাই তিনি প্রাচ্যবাদী, পাশ্চাত্ত্যবাদী ও ভার্ণাকুলারিষ্ট এই তিন দলের মতের আলোচনা করে' ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর একটি 'বিবৃতি বা মিনিট (Minute) প্রকাশ করেন।

প্রাচ্যবাদীদের দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে' তিনি বিবৃতির প্রথমেই ইংরেজি শিক্ষার গতিরোধ না করে' প্রাচ্য শিক্ষার ব্যবস্থাটুকু বজায় রাখার কথা লেখেন। অর্থসাহায্যের হ্রাসের ফলে যে প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটেছে তা স্বীকার করে' সেগুলির স্থায়িত্বরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্দেশ দেন এই যে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকদের বেতনের জন্য যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হবে' এবং ছাত্রদের জন্য পূর্ব-প্রদত্ত বৃত্তিসমূহের একচতুর্থাংশ দেওয়া হবে। এবং প্রাচ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহের প্রকাশের জন্য পরিমিত অর্থব্যয় করা হবে। প্রচ্যবিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থার তিনি সমর্থন করেন। এই নূতন ব্যবস্থার জন্য অতি-রিক্ত ১,০০০৲ টাকা ব্যায় হবে ধরে' নিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে শিক্ষখাতে ৫০,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হবে।

শিক্ষার মাধ্যমবিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্যবাদের সমর্থন করে' লেখেন যে আরবী, ফার্সী বা সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা সফল হতে পারে না বলে' ইংরেজিভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ শিক্ষাই সরকারি নীতির উদ্দেশ্য। শিক্ষাখাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারা যত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে সম্ভব ইংরেজিশিক্ষা ছাড়িয়ে দিলে শিক্ষা ক্রমশ চুঁইয়ে নেমে দেশের আপামরসাধারণকে স্পর্শ করবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় ও তাদের শীর্ষস্থলে একটি কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

ভার্ণাকুলারিষ্টদের প্রতি লক্ষ্য করে' তিনি লেখেন যে প্রাদেশিক ভাষা সমূহে বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এত বেশি যে শীঘ্র সেগুলিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তবু তিনি জোর

করে' নিজমতের প্রতিষ্ঠা চাননি। তখন একদিকে যেমন বাংলাদেশে বেন্টিংকের নীতিতে জেলাস্কুল গড়ে' উঠছিল, অপরদিকে তেমনি বোম্বাইয়ে মনরো ও এলফিনষ্টোন সাহেবের প্রভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড তাই লেখেন যে ওই-দুই পরীক্ষার ফলাফল কালে সত্যের প্রমাণ করবে। এদেশের লোকে যে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় সেই যুক্তির খণ্ডন করে' তিনি লেখেন যে—"ভারতীয় যুবকগণ আমাদের বিদ্যালয়ে তাদের মাতৃভাষার রচনা শিখিতে আসবে না···অধিকাংশ ছাত্রের উদ্দেশ্য হ'ল ইংরেজিভাষার জ্ঞানলাভ"।

মিঃ এডামের রিপোর্টকে তিনি ব্যয়সাধ্য ও অপ্রযোজ্য বলে' বর্ণনা করেন। দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার আত্যন্তিক দুরবস্থার কথা স্বীকার করেও তিনি লেখেন যে সরকারের পক্ষে এ-ক্ষেত্রে সফলভাবে হস্তক্ষেপ করার সময় তখনও আসেনি। তিনি লেখেন যে দেশের লোক এত অজ্ঞ যে অজ্ঞতার কুফল তারা উপলব্ধি করতে পারে না আর এত দরিদ্র যে শিক্ষাগ্রহণের সামর্থ্যও তাদের নেই। এইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যায়ের উপোযোগী মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের প্রণয়ন ও ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বইয়ের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদকে তৎকালের প্রধান কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করে' তিনি লেখেন যে ও কাজ হ'লে পরে মিঃ এডামের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। সেই সময়ে সরকারি সাহায্য পাওয়া সত্বেও কলিকাতার স্কুল-সোসাইটির অত্যন্ত দুরবস্থা হয়েছিল লর্ড অকল্যাণ্ড স্বমত-সমর্থনে তার প্রতি নির্দেশ করেন এবং বোম্বাইয়ের তৎ-কালানুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলা-দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা স্থির করেন।

জি-সি-পি-আইয়ের সদস্যদের মধ্যে অনেকে এডামের পরিকল্পনাকে পরীক্ষা-মূলকভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী থাকলেও লর্ড অকল্যাণ্ড এইভাবে সম্ভবত কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশানুযায়ী, বেন্টিংকপ্রবর্তিত মেকলে-নীতিকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে অনুসরণ করেন।

মিশনারিশিক্ষার ঐতিহাসিক রিকেটসাহেব ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে 'মিশনারি স্কুলের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের মিশনারিসূত্রের কল্যাণে নানা দেশ থেকে মিশনারি দল আসতে লাগলো। জার্মানি থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে "বাসেল মিশনারি সোসাইটি," ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাণ্ট লুথারান মিশন সোসাইটি ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে

উইমেন্স এসোসিয়েশন অব্ এডুকেশন অব্ ফিমেলস্ ইন্ দি ওরিয়েণ্ট" প্রভৃতি এবং আমেরিকা থেকে "আমেরিকান বোর্ড" ও "আমেরিকান প্রেসবিটেরিয়ান" মিশন বোর্ড, "আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট য়ুনিয়ন" প্রভৃতি দলের আগমন হয়।

তখন সরকারি ও মিশনারি উদ্দেশ্যেরও মিল হয়েছিল। মিশনারিরা বিশ্বাস করতো যে ইংরেজিশিক্ষার প্রসারের দ্বারা ধর্মপ্রচারের ভিত্তি স্থাপিত হবে আর অনেক রাজকর্মচারীরা মনে করতেন যে ইংরেজিশক্ষার প্রসারের ফলে সমাজসংস্কারের পথ প্রশস্ত হবে। বেন্টিংকের প্রণোদিত ধর্ম ও সমাজসংস্কার-মূলক ব্যবস্থাগুলি সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করায় সরকারি ধর্মসম্বন্ধীয় নির-পেক্ষতার নীতি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছিল এবং মিশনারিগণের সংগে .সরকারের সম্পর্কও অনেকাংশে সহৃদয় হ য়ে উঠেছিল।

সরকারি শিক্ষাপ্রচেষ্টাও এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৩টি সরকারি বিদ্যালয়ে ৩৩৯০ জন ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে ১৮১৮ জন ইংরেজির মাধ্যমে আর বাকিরা আরবি-ফার্সী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে পড়তো ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে ৫১৯৬ জন ছাত্র ছিল, তাদের মধ্যে ৩৭২৯ জন ইংরেজি পড়তো। ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ৫:টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৮২০৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০০০ এর বেশি ইংরেজি, পড়তো।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে স্থাপিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ভারতীয় শিক্ষা-ক্ষেত্রে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংকএর শেষ দান। তখন সমাজের অচলায়তনের দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল। এই সুযোগ নিয়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "নেটিভদের" চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন এবং তার রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে' সংস্কৃত কলেজের ও কলিকাতা মাদ্রাসার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্লাশ এবং নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন উঠিয়ে দিয়ে ইংরেজির মাধ্যমে য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শেখবার জন্য কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের স্থাপনের আজ্ঞা প্রচার করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের "ইংলিশ স্কুল" এবং ক্রমে মুর্শীদাবাদ, মেদনীপুর বরিশাল, চট্টগ্রাম, শান্তিপুর, বারাসত, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে "ইংলিশ একাডমি" স্থাপিত হয়। এই ইংরেজি বিদ্যলয়ের মধ্যে কতকগুলি কলেজ পরিণত হয়েছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হাজী মহম্মদ মহসীনের বদান্যতায় হুগলির ইংরেজি বিদ্যালয় হুগলী কলেজে পরিণত হয়; তিন দিনের মধ্যে সেখানে ১২০০ ছেলে ভর্তি হয়েছিল। তারপর ঢাকা (১৮৪১) কৃষ্ণনগর (১৮৪৫) ও বহরমপুরেও

(১৮৫৩) কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে ইংরেজি কলেজগুলি স্থানাভাবের জন্য বেতনদায়ী ছাত্রদের পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, অথচ প্রাচ্য কলেজগুলি বৃত্তির লোভ দেখিয়েও ছাত্র সংগ্রহ করতে পারছিল না। শিক্ষা-খাতে ব্যয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চারলক্ষ টাকা থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার বর্ধিত হয়েছিল।

এই শিক্ষার মানও উঁচু ছিল। বিদেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ভারতীয়-দের তৎপরতায় অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ চমকৃত হয়েছিলেন।

আফগান যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন এবং লর্ড এলেনবরা বড়লাটের পদ নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জি-সি-পি-আই-কে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, লর্ড এলেনবরা তার স্থানে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশন" স্থাপিত করলেন। দেশজ ভিন্ন অন্যান্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত এই কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা প্রায় একটি পৃথক সরকারী বিভাগের সমান ছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে আলাদা করে' দেওয়ায় কাউন্সিলগুলির বর্ধিত ক্ষমতায় ক্ষুদ্রতর এলাকার তত্ত্বাবধানের সুবিধা হয়। যথা, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত আগ্রা প্রেসিডেন্সি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরিণত হয় এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ওই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব কলিকাতার কাউন্সিলের হাত থেকে নিয়ে পৃথক কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হয়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স লর্ড হার্ডিঞ্জকে ভারতের বড়লাটরূপে প্রেরণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে এসে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে একটি ঘোষণা (resolution) করেন।

এই ঘোষণার প্রথম প্রস্তাব ছিল ভারতীয়গণের সরকারি কাজে নিয়োগ সম্বন্ধীয়। এ-বিষয়ে লেখা হয় যে উচ্চতর পদসমূহে ভারতীয় কর্মচারীর নিয়োগের সময় যারা কাউন্সিলের স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষালাভ করেছে, বিশেষত যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদেরই সর্বপ্রথম সুযোগ দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সরকারি আপিসের অধিকর্তা কলিকাতার ও বাইরের সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহের তালিকা রাখবেন। তাদের নিযুক্ত করার প্রত্যেক সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করবেন, অন্যথায় জবাবদিহি করতে হবে। নিম্নতর পদে নিয়োগের বিষয়ে লেখা হয় যে নিরক্ষর অপেক্ষা সাক্ষর প্রার্থীকে অধিক মূল্য দেওয়া হবে।

ঘোষণার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় বংগ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে উচ্চমানের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালের অর্থভাণ্ডারের অবস্থানুযায়ী ১০১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এবং সেগুলিতে মাতৃভাষা, অংক ও ইতিহাস পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ইন্সপেকটরের নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর ঘোষণার প্রথম প্রস্তাবে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে চাকরির দ্বারা পুরস্কৃত করে' জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর কুফল হয়েছিল এই যে চাকরির লোভে দেশের লোকে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য উন্মত্ত ও কার্যিক শিক্ষালাভে বিমুখ হয়, কম সংখ্যক সরকারি ও ব্যবসাদারি আপিসের চাকরির জন্য অধিক সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি হওয়ায় বেকার সমস্যার উৎপত্তি হয় এবং শিক্ষার নিজস্ব মূল্যের পরিবর্তে চাকরির সম্ভাবনা দ্বারা তার মূল্য নির্ধারিত হয়।

হার্ডিঞ্জ-ঘোষণার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১০১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এইগুলি "হার্ডিঞ্জবিদ্যালয়" রূপে পরিচিত হ'ত। যে-সব স্থানের অধিবাসিগণ বিদ্যালয়গৃহ তৈয়ারী ও মেরামতের ভার নিয়েছিল সেই স্থানসমূহে বিদ্যালয়গুলি খোলা হয়। এ-গুলিতে অংক, লেখাপড়া, বাংলা, ভূগোল আর ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো হ'ত। শিক্ষকদের বেতনের ভার সরকারের ছিল কিন্তু তাদের উৎসাহবর্ধনের জন্য ছাত্রদের বেতনলব্ধ অর্থের কিয়দংশ তাদের দেওয়া হ'ত এবং বাকি অংশে বিদ্যালয়ের আনুসংগিক ব্যয় নির্বাহিত হ'ত। এই বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত শিক্ষকসৃষ্টির জন্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়।

দুঃখের বিষয় হার্ডিঞ্জের এই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেনি। স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতার অভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১০১টির মধ্যে কেবল ২৬টি বিদ্যালয় বজায় ছিল। এরূপ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে তখনকার গ্রামের লোকেরা সরকারি প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং তাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের বাড়ি জোগানো আর এক-আনা মাত্রও বেতন দেওয়া কষ্টকর ছিল। গরিবদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখতো তারা গ্রাম্য, সুলভ, নিম্নমান পাঠশালাগুলিই পছন্দ করতো আর অবস্থাপন্ন লোকেরা ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল।

হার্ডিঞ্জ-ঘোষণার তৃতীয় প্রস্তাবের অনুযায়ী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও আসামের স্কুলকলেজগুলির পরিদর্শন করার জন্য দুইজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্যও একজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

হার্ডিঞ্জ-ঘোষণার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি না হলেও মাধ্যমিক ও কলেজি শিক্ষার এত দ্রুত প্রসার হচ্ছিল যে শিক্ষার মানের স্থৈর্য বজায় থাকছিল না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মোয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয়নি। বহিঃস্থিত কোনো মানের অভাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি কর্মে নিয়োগপ্রার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষাব্যবস্থায় কল্পিত অথবা বাস্তবিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হ'তে লাগলো।

এই সময়ে ভারতীয়গণ অধিকসংখ্যায় শিক্ষাব্যবস্থার সংগে যুক্ত হ'তে থাকেন। হার্ডিঞ্জবিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মিঃ মার্শাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর তার শিক্ষকনির্বাচনের ভার দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের নানা কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করার পর তিনি সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সরকারি স্বীকৃতিতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগের জন্য ইংরেজি কলেজগুলির ছাত্রদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বগ্রামের বালকদের জন্য একটি ও কর্মাটাঁড়ের সাঁওতালদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভেঙে সিভিলিয়নদের পরীক্ষার জন্য "বোর্ড অব্ এগ্‌জামিনর্স" স্থাপিত হ'লে ঈশ্বরচন্দ্রকে তার একজন সদস্যরূপে মনোনীত করা হয়।

মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রেও তখন ভারতীয় সমাজের নেতৃবর্গ এগিয়ে আসছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বারাসতের সরকারি বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার, হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্যারিচরণ সরকার এবং নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্র মিলে ছেলেদের জন্য একটি ও মেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবন্ধু বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইনসদস্য এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতিরূপে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর উৎসাহে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ২১জন ছাত্রী নিয়ে হিন্দুবালিকাবিদ্যালয় বা ক্যালকাটা

ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয় ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। বিদ্যালয়ের বাড়ি করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশহাজার টাকা ও পাঁচবিঘা জমি দান করেন। বেথুনসাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়টির "বেথুন নারী বিদ্যালয়" এই নাম দেওয়া হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এটি বেথুন কলেজ নামে মহিলাদের প্রথম কলেজ হয়।

হিন্দুবালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ১৫ দিন পর রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার আশপাশের নানা স্থানে বালিকাবিদ্যালয় গড়ে' উঠতে থাকে। সরকার এগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও বিশেষ অর্থসাহায্য করেনি।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থানে লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি সরকারি পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিয়োগসম্বন্ধে এবং শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য ব্যাপারে হার্ডিঞ্জের নীতিসমূহের অনুসরণ করতে থাকেন ; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হার্ডিঞ্জনীতির অসাফল্য দেখে প্রাথমিক শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা করার জন্য কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন।

এই সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মিঃ জেম্‌স্ টমাসন্ তাঁর প্রদেশে এডামপরিকল্পনাকে কিঞ্চিৎ পরবর্তিতাকারে প্রযুক্ত করার চেষ্টা করেন। গ্রাম্য শিক্ষকদের সাহায্যে গ্রামীন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে পাঁচ-পাঁচটি গ্রামকে একত্র করে' একটি "হল্কা" ধরে' নিয়ে "হল্কাবন্দী" ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রত্যেক হল্কার পাঠশালাগুলির পরিদর্শনের জন্য একজন পরিদর্শক পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। গ্রামগুলিতে প্রাথমিক, মহকুমায় (তহশীল) মধ্য ও জিলায় উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করে' একটি পরস্পরসম্পৃক্ত, সমগ্র ব্যবস্থার বিবর্তনের চেষ্টা হয়। সাধারণ ভূমিকরের শতকরা একটাকা হিসেবে শিক্ষাকর নির্ধারিত হয়। তাতে শিক্ষার ব্যয়সৌকর্য হয় এবং জমিদারেরা জনশিক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে শেখে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার জন্য বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা সরকারি সাহায্য বরাদ্দ হয়। দশবৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থায় ৮৯৭টি বিদ্যালয়ে ২৩,৬৮৮ জন ছাত্র শিক্ষা পেতে থাকে।

আন্তঃপ্রাদেশিক অসামঞ্জস্য এই সময়কার শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির ক্ষমতাবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাস্তবিক কেন্দ্রীকরণের অভাবে প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ শিক্ষানীতি অনুসরণ করছিল। বাংলাদেশ যখন চুঁইয়ে-পড়ার নীতির অনুসরণে ইংরেজিশিক্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছিল,

তখন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে টমাসনের পদ্ধতিতে শিক্ষাকর স্থাপনের ও শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, বোম্বাইয়ে লর্ড এলফিনষ্টোন অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য-দানের নীতির দ্বারা মাতৃভাষামাধ্যম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার করছিলেন এবং মাদ্রাজের শিক্ষাপদ্ধতি সরকার ও সাধারণ্যের সহযোগিতায় অগ্রসর হচ্ছিল।

এই সময়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—মাধ্যমিক শিক্ষার অভ্যুত্থান ও উচ্চশিক্ষার প্রসার। মিশনারিরা প্রথম থেকে যে সব ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করেছিল সেগুলিকে মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের পূর্বগামী বলে' বর্ণনা করা গেলেও মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবিক সূত্রপাত হয় বেণ্টিংকনীতির অনুযায়ী "জিলাস্কুলের" প্রতিষ্ঠার থেকে। মিশনারিরা এই নীতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করে এবং ভারতবাসীরাও দলে দলে এই শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ইংরেজিশিক্ষার চাহিদার বৃদ্ধির ফলে অনেকগুলি কলেজও স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা আপাতপ্রয়োজনে খুব কার্যকরী হ'লেও এর মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে তখন ভাষা ও সাহিত্যই প্রধান ছিল, কার্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ অবহেলিত হ'ত। বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার যে দোষ,—কাজের অনুপযোগিতা, তা প্রথমাবধি এর মধ্যে নিহিত ছিল উপরন্তু শিক্ষার সংগে চাকরির প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের কি কুফল ঘটছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। একে শিক্ষার জন্য শিক্ষার মূল্য কমে যাচ্ছিল তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো শিক্ষানৈতিক মান না থাকায় সরকারি চাকরির পরীক্ষাই একমাত্র মানস্বরূপ ছিল।

মিশনারিদের প্রভাববৃদ্ধি এ-যুগের যুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিষয়ে উল্লেখ আগেই কিছু করা হয়েছে। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে এদের প্রচেষ্টা অনেক বেশি ছিল। ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সরকারি বিদ্যালয়-গুলিতে ৩০,০০০ ছাত্র ছিল কিন্তু মিশনারি বিদ্যালয়ে ৩০০,০০০ ছাত্র পড়তো। এরূপ শক্তিশালী হয়ে এদের ঔদ্ধত্যও বেড়ে গেছিল। খৃষ্টান মিশনারিদের নেতৃস্থানীয় আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রকাশ্যে লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রাচ্যবাদিতোষণ-নীতির বিরোধিতা করেছিলেন ও হার্ডিঞ্জের সরকারি পরীক্ষা-ব্যবস্থার নিন্দা করে' বলেছিলেন যে লৌকিক শিক্ষার চেয়ে খৃষ্টানশিক্ষাই সরকারি চাকুরেদের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়। সরকারি কর্মচারীরা যে মিশনারিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন সে কথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। বেণ্টিংক নিজে কেরি, ডাফ্ প্রভৃতি মিশনারির প্রভাবের বশবর্তী ছিলেন এবং কোম্পানির

১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক নীতির রচনায় ডাফ-সাহেবের প্রভাবের কথা অনুমান করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা তত আশাপ্রদ ছিল না। মিশনারিদের প্রতি সরকারি সৌহার্দ্যের সংগে সাধারণ্যের মনে তাদের প্রতি বিরোধিতা বাড়তে থাকে এবং সরকারের ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার বিষয়েও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব-বিলোপনীতির প্রয়োগ যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল কয়েক বৎসর মাত্র পরে তা সিপাহিবিদ্রোহের রূপ নেয়,।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কোম্পানির সনন্দ নূতন করে' দেওয়ার সময় আসে। তখন লর্ডস্ কমিটির সামনে কোম্পানীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অভিযোগ আসে যে হার্ডিঞ্জনীতি অনুসারে কৃতী ছাত্রদের সরকারি কর্মে নিয়োগের সময়ে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছিল। পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচন ও পরীক্ষার পরিচালনায় চাতুর্যের দ্বারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণের সাফল্য বেশি হচ্ছিল। এ-ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতির পরিবর্তে এক কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল।

এইসব কারণে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে এক তদন্তের অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ ডাফ মিশনারিদের এবং মিঃ উইলসন প্রাচ্যবাদীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। সরকারের পক্ষ থেকে স্যর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান ও মিঃ এর্সকিন পার্সি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের সত্যাসত্য যাই হোক, অনুসন্ধানে জানা যায় যে অসন্তোষের মূল কারণ ছিল সরকারি পদের অল্পতা, অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র দশজন ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয়কে সরকারের নিম্নতর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই তদন্তের ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা-বিষয়ক এক প্রস্তাবের প্রণয়ন করা হয়। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি উড-সাহেবের নামে এই প্রস্তাব "উডের-ডিসপ্যাচ" নামে ইতিহাসে পরিচিত। পরবর্তিকালের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে' একে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগনির্দেশক চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

উডের ডিস্প্যাচ্

উডসাহেবের ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের "ডিসপ্যাচ" বা ভারতের কোম্পানির সরকারকে প্রেরিত পত্রটিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, সহায়তা ও সহযোগিতায় পরিচালিত জনশিক্ষার একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পত্রে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের আলোচনা বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যসাধন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বাংগীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই পত্রের প্রস্তাবনায় শিক্ষাকে জরুরি সরকারি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বলে' ঘোষণা করা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে ইংলণ্ডের সংগে সংস্পর্শের ফলে ভারতবর্ষে যে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হবে তাতে জাতির আর্থিক ও নৈতিক উভয় প্রকারের উন্নতি ঘটবে। এই শিক্ষায় ভারতবাসীদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যিক বিষয়সমূহের জ্ঞানের প্রসারের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারে ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের সংগে ভারতীয় কাঁচা মালের বিনিময়দ্বারা উভয় জাতিই উপকৃত হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবাদী উভয় মতের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্যশিক্ষার মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়সমূহের এবং হিন্দু ও ইসলামীয় আইনের জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচ্যগ্রন্থের এবং আঞ্চলিক ভাষাসমূহের চর্চা ও উন্নতির জন্য প্রাচ্যভাষার আলোচনার প্রয়োজন। অপরপক্ষে দেখানো হয়েছে যে প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান সাংঘাতিক ভ্রমে পরিপূর্ণ ও আধুনিক পরিণতিবর্জিত বলে' য়ুরোপের উন্নত কলা, বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্যের শিক্ষা, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই হবে সাধারণ্যের শিক্ষার আদর্শ।

শিক্ষার মাধ্যমসম্পর্কে ইংরেজি ও ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের আপেক্ষিক মূল্য বিচারে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে উক্ত ভাষাসমূহে পাশ্চাত্ত্যজ্ঞানের গ্রন্থের অভাববশত অস্থায়িভাবে ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হবে। আঞ্চলিক ভাষার অবহেলার অভিযোগের উত্তরে বলা হয়েছে ইংরেজির প্রসার দ্বারা ওগুলির বিলোপসাধন সরকারের উদ্দেশ্য নয় এবং ইংরেজি ও মাতৃভাষার

পাশাপাশি ব্যবহারে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে যে বিদ্যালয়সমূহের ব্যবহার্য ভাষারূপে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলনের ফলে এবং বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আপামরসাধারণের শিক্ষা অসম্ভব হওয়ার দরুণ মাতৃভাষার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বরংচ উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ইংরেজিশিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে। যারা যথেষ্ট ইংরেজি জানে তারা ইংরেজির মাধ্যমে আর যারা ইংরেজি কম জানে বা জানে না সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে। ইংরেজি ও মাতৃভাষা উভয়ে পণ্ডিত শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষায় নিবদ্ধ করে' শিক্ষার মাধ্যমরূপে তার ব্যবহারের পথ সুগম করবেন।

তারপর এই পত্রে শিক্ষার এক সর্বাংগীন নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনার প্রথম প্রস্তাব হ'ল রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন। "কাউন্সিল অব এডুকেশন" শক্তিশালী সমিতি হ'লেও সরকারি বিভাগ ছিল না। এই প্রস্তাবে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে কোম্পানির ভারতীয় রাজ্য তখন যে কয় প্রদেশে (বাংলা, মাদ্রাজ বোম্বাই, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব।) বিভক্ত ছিল তার প্রত্যেকটিতে শিক্ষা অধিকর্তার (**Director of Public Instruction**) অধীনে জনশিক্ষাবিভাগ (**Department of Public Instruction**) স্থাপিত হবে। শিক্ষাবিভাগের অধীনে কতিপয় পরিদর্শক (**Inspectors**) থাকবেন। তাঁরা বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করে' শিক্ষক ও পরিচালকবর্গকে পরামর্শ দেবেন ও সরকারের নিকট বাৎসরিক বিবৃতি (**Report**) পেশ করিবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যখন শিক্ষা-কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ মোয়াট বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন তখন লণ্ডনের কর্তৃপক্ষগণ এদেশে তদুপযোগী শিক্ষার প্রসার হয়েছে বলে' মনে করেননি। এই পত্রে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের সময় উপস্থিত এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে একটি করে' এবং মাদ্রাজ বা অপর কোনো স্থানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়ে থাকলে পর সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব একজন চান্সেলর, একজন ভাইস-চান্সেলর ও কতিপয় সরকার-মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত "সেনেটের" ওপর ন্যস্ত থাকবে। পরীক্ষাগ্রহণ ও ডিগ্রিদান বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির প্রধান কাজ হ'লেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যে-সব বিষয়ের শিক্ষার সুবিধা

নেই যথা—চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা ও আইন, অথবা যে বিষয়গুলির অবহেলা ঘটার সম্ভাবনা আছে, যথা—ভারতের আঞ্চলিক এবং সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা, সেইসব বিষয়ের অধ্যাপনার ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাও করা হবে। প্রাচ্যভাষার অধ্যাপকগণকে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নয়নের চেষ্টা করতে বলা হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব হ'ল দেশে ব্যাপকভাবে স্তরবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সংশ্লিষ্ট **(Affiliated)** কলেজগুলির দ্বারা উচ্চাংগের শিক্ষা ও পরীক্ষা, পরের ধাপে উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ের ইংরেজি ও বাংলামাধ্যম সাধারণ শিক্ষা ও সর্বনিম্ন স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি থাকিবে।

শিক্ষার "চুঁইয়ে-নামার" নীতির খণ্ডন করে' বলা হয়েছে যে এতাবৎকাল অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণিজাত ভারতবাসীর মধ্যে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এরপর থেকে শিক্ষার ব্যয়বহনের সামর্থ্যহীন বিরাট সাধারণ্যের শিক্ষার দিকের সরকারি প্রচেষ্টা প্রধানত প্রযুক্ত হবে। এই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়স্থাপনের এবং উপযুক্ত শিক্ষকসৃষ্টির দ্বারা ক্রমান্বয়ে বাংলা ও ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার মানের পার্থক্যনিরসনের কথা লেখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশকে স্ব-পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বাধীনতা দিয়ে আদর্শস্বরূপ টমাসন সাহেবের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পরীক্ষার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে সর্বসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বৃত্তিদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিচক্ষণ পরিদর্শকের অধীনে এই ব্যবস্থা প্রত্যেক শ্রেণির শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভের সহায়তা করে' শিক্ষার উপকারিতা সমাজের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে।

অপর প্রস্তাবে সাহায্যদাননীতির প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাখাতের পরিমিত অর্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানস্থাপনের দ্বারা দেশব্যাপী শিক্ষার বেড়াজাল বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল না বলে' মিশনারিদের ও ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ ও উদ্যোগের সহায়তা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের সাহায্যনীতির অনুকরণে এদেশে অনুরূপ নীতির প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে-সব বিদ্যালয়ে যথেষ্ট উচ্চ মানের লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, স্থানীয় উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলী থাকবে, কম করেও ছাত্রদের নিকট কিছু-না-কিছু

বেতন নেওয়া হবে এবং যেগুলি সরকারি পরিদর্শন ও পরামর্শের অধীনতা স্বীকার করবে, সেইসব বিদ্যালয়গুলি সরকারি সাহায্যের উপযোগী বলে' বিবেচিত হবে। সাহায্য সাধারণভাবে দেওয়া হবে না, ইংলণ্ডের মতো, শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের বৃত্তি, বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য দেওয়া হবে। প্রত্যক্ষ সরকারি প্রচেষ্টার পরিবর্তে সাহায্যদাননীতির দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সরকারি সহযোগিতায় শিক্ষাবিস্তারকে সরকারের গৃহীত নীতি বলে' ঘোষণা করা হয়েছে।

তারপর, শিক্ষকশিক্ষণব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে "নর্মাল স্কুল" স্থাপিত হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের নির্ধারিত বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দিয়ে বর্ধিত বেতনে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে' লেখা হয়েছে যে তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ভারতের মতো বহুধর্মপ্রচলিত দেশে কোনো বিশেষ ধর্মের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মিশনারিদের পীড়াপীড়ির ফলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে একটি করে' বাইবেল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি সাহায্যদাননীতিকেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে' লৌকিক শিক্ষার উৎকর্ষবিচারের ওপর স্থাপিত করা হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে' লেখা হয়েছে যে দেশে স্ত্রীশিক্ষার দাবী দেখা দিলেও লোকে যথেষ্ট সচেতন হয়নি বলে' বিশেষ সাহায্য ও বৃত্তির দরকার।

বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় ভাষার উপযুক্ত কার্যিক পুস্তকপ্রণয়নের কথাও লেখা হয়েছে।

হার্ডিঞ্জনীতির পুনরুল্লেখ করে' আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের সময়ে উচ্চতর পদের জন্য ইংরেজিশিক্ষিত ও নিম্নতর পদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রার্থিগণকে বেশি সুয়োগ দেওয়া হবে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এই পত্রের অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে দোষগুণ দুইই দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, শিক্ষার আদর্শের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভবিষ্যত স্বাচ্ছন্দ্যের যে উজ্জ্বল চিত্র দেওয়া হয়েছে তার পশ্চাতে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়কামী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যশিক্ষাবিষয়ে অন্যান্য মত গ্রহণীয় হ'লেও প্রাচ্যদর্শনের ভ্রান্তিপূর্ণতার কথা ডাঃ ডাফের স্থূলহস্তাবলেপ সূচিত করে।

তৃতীয়ত, ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষার পরিণতির কল্পনা মেকলের প্রস্তাবজাত হ'লেও এই অংশে উদারতর যে এক্ষেত্রে উভয়মাধ্যমের ব্যবহারের বিকল্প দেওয়া হয়েছে। পরবর্তিকালে মাতৃভাষার যে অবহেলা ঘটেছিল তার জন্য এই পত্রের পরিকল্পনা অপেক্ষা ভারতীয়গণের পাশ্চাত্ত্যমোহকে বেশি দায়ী করা যায়।

চতুর্থত, নূতন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী। এগুলিই এই পত্রের শ্রেষ্ঠাংশ এবং এখানেই এই পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশি।

অনেকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে সাহায্যদাননীতির প্রস্তাবকে সরকারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা হিসেবে নিন্দা করেন, কিন্তু অর্থনৈতিক কৃপণতার দিকটা এরমধ্যে নিহিত থাকলেও শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ্যের স্বচেষ্টার বাঞ্ছনীয়তা তখনকার যুগের গৃহীত আদর্শ ছিল এবং ইংলণ্ডেও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগে রাষ্ট্রকর্তৃক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক দিক থেকে এই প্রস্তাবের বাস্তবিক ত্রুটি হ'ল এই যে বর্ধিত ব্যয়ের আভাস থাকলেও তার পরিমাণসম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি। উপরন্তু, সরকারের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণের কোনো সময় ঠিক করে দেওয়া না থাকায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে প্রবল সরকারি অনিচ্ছা শিক্ষাব্যাপারের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

স্তরবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটি চমৎকার হ'লেও সাধারণের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাধান্যঘোষণা যুক্তিসংগত হয়নি। অবশ্য এবিষয়ে সরকারি নীতির দোষাপনোদনের জন্য বলা যায় যে হার্ডিঞ্জপরিকল্পনার অসাফল্যের পর থেকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পরীক্ষার সাফল্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা করার মতো অভিজ্ঞতা সরকারের ছিল না।

সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির সনন্দে শিক্ষাকে কোম্পানির দায়িত্বরূপে গণ্য করা হ'লেও অন্যান্য কর্তব্যপালনের পর উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমিত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অংগীকরণের ফলে শিক্ষা

অবশ্যপালনীয় রাষ্ট্রকর্মরূপে গৃহীত হ'ল। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে ভারতীয় শিক্ষার পূর্ণাবয়বত্ব স্বীকৃত হ'লেও এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার অতিরিক্ত প্রাধান্য মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার পরিবর্তে মুখস্থবিদ্যার পরিপোষক হয়েছে।

ফলশ্রুতিসম্পর্কে হার্ডিঞ্জনীতির পুনরুল্লেখ শিক্ষার বৌদ্ধিক ও জ্ঞানিক আদর্শের ওপরে চাকরিকে প্রাধান্য দিয়ে দাসমনোভাবের সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

শেষে, এই পত্রের দোষগুণের, সামগ্রিক আলোচনা করলে এটিকে একটি যুগনির্দেশক চিহ্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

প্রথমত, এতে ভারতীয়গণের শিক্ষাসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে ভয় ছিল যে ভারতবাসী শিক্ষালাভ করলে বিপ্লবের সৃষ্টি করবে, কিন্তু এই পত্রে শিক্ষার প্রচারদ্বারা প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্কস্থাপনের আশা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এতদিন পর্যন্ত বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্যহীনভাবে শিক্ষা পদ্ধতি অগ্রসর হচ্ছিল,—এই পত্রে একটি কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ অথচ শাখায়িত জাতীয় শিক্ষার প্রথম পরিকল্পনা পাওয়া যায় এবং আজ পর্যন্ত বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সেই কাঠামই অনেক পরিমাণে বজায় আছে।

ঐতিহাসিক জেমস্ এই পত্রকে ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগ্‌নাকার্টা বলে' বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সে-কথাকে সর্বৈব সত্য বলে' স্বীকার করা যায় না। প্রথমত, রাজনৈতিক অধিকারের সংগে শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, এই পত্রে আইনগত নূতন অধিকার থাকলেও কোনো মৌলিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। তৃতীয়ত, কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের পথ সহজ করা ও অল্পবেতন, সুশিক্ষিত কর্মচারীর সৃষ্টিদ্বারা ভারতসাম্রাজ্যের শাসনের ব্যয় লাঘব করার উদ্দেশ্যে প্রণীত এই ব্যবস্থা স্বাধীন জাতীয় চরিত্রের গঠন অপেক্ষা দালাল ও চাকুরের সৃষ্টিরই উপযোগী ছিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষা থেকে রাজনৈতিক চেতনার দিকে যদি কিছু লাভ হয়ে থাকে তবে সেই কল্পনার দূরদৃষ্টি লর্ড মেকলেরই ছিল এবং ওই চেতনার বিবর্তনকে উড-সাহেবের প্রণীত ব্যবস্থার সৃষ্টি না বলে' উপউৎপাদন রূপে **(bye-product)** বর্ণনা করলেই বেশি সত্য হয়।

১৮৫৪—১৮৮২

এক নূতন ব্যবস্থার প্রারম্ভরূপে রচিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রটি কার্যত বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ দানে পরিণত হয়েছিল। এই পত্রের প্রকাশের চার বৎসরের মধ্যে কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্য সরাসরি মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হওয়ায় তার অধিকাংশ সুপারিশই কাজে পরিণত হয় নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে।

১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশসমূহে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু ওই বৎসরেই দেশব্যাপী সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলে' ওঠায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মহারানির রাজত্বের প্রবর্তন হয়। ওই সালের নূতন ভারত আইনে সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট ও পোনেরোজন সভ্যসমন্বিত 'কাউন্সিলের' শাসন আরম্ভ হ'ল।

নূতন শাসনব্যবস্থার অধীনে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের অনুসরণে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে' উঠলো সেই শিক্ষা হ'ল ভারতের প্রথম বাস্তবিক আধুনিক শিক্ষা এবং আজও সেই শিক্ষার ধারা বহুলাংশে দেশে প্রবহমান।

শুধু শিক্ষা নয়, ভারতের সর্বক্ষেত্রেই সার্ধ-উনবিংশ শতাব্দি থেকে আধুনিকতার পত্তন হয়েছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম রেলপথ খোলা হয়। প্রথম আধুনিক ডাক ও তার ব্যবস্থা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পীনালকোড লেখা হয়, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল স্থাপিত হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে' উঠিতে থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিকী ব্যবস্থায় (Quinquennial Settlement) শিক্ষা ও অন্য কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বের সংগে কয়েকটি বিষয়ের অর্থকোষ প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনাধীন হয়।

দেশের রাজনৈতিক চেতনার সংগঠনও এইযুগে অনেক পরিণতি লাভ করেছিল। পুনা সার্বজনিক সংঘ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্বগামী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে।

১৮৫৪ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মোপলাবিদ্রোহ পর্যন্ত পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে ভারতসাম্রাজ্যসম্পর্কে দ্বিতীয় আফগানযুদ্ধ (১৮৭৮-৮০), দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ (১৮৮৫) এবং তিব্বতযুদ্ধ (১৮৯৭-৯৮) এই তিনটি যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই দীর্ঘকালে ভারতের আভ্যন্তরিক শান্তির খণ্ডন হয়নি, শাসনব্যবস্থাও সামান্য সামান্য পরিবর্তনসত্ত্বেও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত মোটামুটি একই ভাবে চলেছিল। এই সব কারণে শিক্ষার ইতিহাসে ১৮৫৪ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি যুগ গণ্য হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের প্রকাশ পর্যন্ত একটি উপযুগ গণনা করা যায়। এইজন্য বর্তমান পরিচ্ছেদে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলির আলোচনা করা হবে। সুবিধার জন্য এই সময়ের ইতিহাসকে শিক্ষার স্তরানুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হ'ল।

১। কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা :—

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে যে কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেগুলিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভেদে দুইভাগে ভাগ করা যেত,—কলিকাতার মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, বেনারসের ও পুনার সংস্কৃত কলেজ ইত্যাদি এবং অন্যদিকে হিন্দু কলেজ, হুগলি কলেজ, স্কটিশ চার্চেজ কলেজ ইত্যাদি।

তখন ভারতীয়গণ কলেজীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থদান করেছিল, কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হওয়ায় এই যুগের আরম্ভের সময়ে বাংলাদেশে ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত একটিও কলেজ ছিল না। কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার ছাড়া মিশনারিরাই অগ্রণী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ১৬টি কলেজের মধ্যে একটি মেডিকেল কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ১৪টি সাধারণ শিক্ষার কলেজ ছিল। ওই চৌদ্দটি সাধারণ কলেজের মধ্যে সাতটি সরকারি ও সাতটি মিশনারিদের ছিল। সমগ্র বৃটিশ-ভারতে মোট ২৩টি সাধারণ শিক্ষার কলেজ, দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও তিনটি মেডিকেল কলেজ ছিল।

সাধারণশিক্ষার কলেজের মধ্যে অনেকগুলিই উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিবর্তিত হয়েছিল। 'কলেজ' কথাটি তখন মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে আল্‌গাভাবে প্রযুক্ত হ'ত। প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার পর কলেজী শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশেষ আইনপ্রনয়ণদ্বারা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির গঠনের জন্য যে য়ুনিভার্সিটি কমিটি গঠিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার একজন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'লে তিনি তার একজন 'ফেলো' হয়েছিলেন।

লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির অনুকরণে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠন ও আদর্শ একই প্রকার ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মাননির্ণয় করে' তাদের কৃতিত্বকে চিহ্নিত ও পুরস্কৃত করা এবং অন্যান্যভাবে বিদ্বানদের সম্মান প্রদর্শন এদের উদ্দেশ্য ছিল।

প্রতিষ্ঠা-আইনের অনুসারে চান্সেলর, ভাইসচান্সেলর ও "ফেলো"-দের নিয়ে গঠিত "সেনেটের" দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হ'ত প্রাদেশিক ছোটলাট চান্সেলর হ'তেন এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত ভাইস-চান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ কর্মচারী হ'তেন, তিনি দুইবৎসরের জন্য ওই পদে নিযুক্ত থাকতেন। ফেলোদের সকলেই সরকারের দ্বারা মনোনীত হ'তেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি যাঁরা সরকারি পদের কারণে মনোনীত হ'তেন তাঁরা যতদিন ওই পদে স্থাপিত থাকতেন, ততদিনের জন্য সেনেটেরও ফেলো থাকতেন, আর দ্বিতীয়ত,— কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সরকার মনোনীত করতেন, তাঁদের সভ্যপদ যাবজ্জীবন স্থায়ী হ'ত, কেবল দেশত্যাগ অথবা অন্য কোন কারণে তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম, সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা সেনেটের কার্জ ছিল। পরীক্ষাদ্বারা ডিগ্রি ও সম্মানচিহ্নদান, উক্ত বিষয়গুলির মাননির্ণয়, সেনেটের বৈঠকের সময় নির্দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার নিয়মসূত্রাদির প্রণয়ন ও প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সেনেট ভারপ্রাপ্ত ছিল। এইসব কাজের জন্য সপার্ষদ ছোটলাটের অনুমতির প্রয়োজন হ'ত। তাছাড়া 'ফি' নিয়ে পরীক্ষাগ্রহণের ববস্থা, পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগবিনিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমুদয় কাজ সেনেট করতো। কাজের সুবিধার জন্য সেনেটের এক প্রস্তাবদ্বারা চান্সেলর, ভাইস-চান্সেলর ও চার ফ্যাকাল্টির (আর্টস্, ল, মেডিশিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং) থেকে ছয়জন ফেলো নিয়ে 'সিণ্ডিকেট' নামে ছোট কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পাঠ্যবস্তু নির্দিষ্ট করতো। প্রবেশিকা **(Entrance)**

পরীক্ষা পাশ না করলে কেউ কলেজের পড়া করতে পারতো না। পরীক্ষণান্তে বি-এ, এম-এ, বি-এল, এল-এম-এফ ও বি-ই ডিগ্রি দেওয়া হ'ত। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সাধারণ শিক্ষার কলেজে দুই বৎসর পড়ে' এফ-এ (First Arts) পরীক্ষা দিতে হ'ত, তারপর ডিগ্রির জন্য পড়া ও পরীক্ষা। প্রথমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পরই বি-এ পরীক্ষা দেওয়া যেত, কয়েক বৎসর পরে এফ-এ পরীক্ষার প্রচলন হয়। কলেজে, বি-এ, বা এফ-এ, কি পর্যন্ত পড়া হয় সেই অনুসারে সেগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভাগ করা হ'ত। কলেজের অধ্যাপনা ইংরেজির মাধ্যমে হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অনেক খুঁৎ ছিল। যথা, প্রথমত, সেনেটের সভ্যপদে মনোনয়নের ব্যাপার সরকারকর্তৃক অনেকটা সম্মানচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হ'ত এবং সামান্য দুয়েকজন শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষাসম্পর্কহীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বারা সেনেট পূর্ণ হয়ে যেত। উপরন্তু ফেলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় এবং তাঁরা যাবজ্জীবনের জন্য মনোনীত হওয়ায় সেনেটের আয়তন বড় হ'ত। সিণ্ডিকেট নামে কার্যকরী সমিতি গঠিত হলেও তার কোনো আইনগত প্রতিষ্ঠা না থাকায় তৎকৃত সমুদয় কাজ সেনেটের সমর্থনের অপেক্ষা রাখতো।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্ত পরীক্ষাকেন্দ্রিক ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য সুপারিশ থাকলেও তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। পরীক্ষাগ্রহণদ্বারা ডিগ্রিদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হওয়ার ফলে তার আদর্শ অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষক ও অনুমোদক বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় এবং এই নিয়মে অনুমোদিত কলেজগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হয়। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা মাননির্ণয় ও ছাপ দেওয়া ছাড়া উচ্চশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হয়নি, পরীক্ষার প্রাধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, উচ্চশিক্ষা বিকেন্দ্রিত হয়েছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহকর্মিতার যে আদর্শসৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার যে ঐতিহ্যস্থাপন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যস্বরূপ তা ব্যাহত হয়েছিল।

এই সময়ে সরকারি সাহায্যনীতি, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়; এতে কলিকাতায় ১৬২, বোম্বাইয়ে ২১ ও মাদ্রাজে ৩৬, মোট এই ২১৯টি

ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এক কলিকাতাতেই ১০৫৮ ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, ১৮৬৬এ ১৩৫০ জন পরীক্ষা দেয় ও ৬৩৮ জন পাশ করে ; পাশকরা ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজে প্রবেশ করে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। ওই পরীক্ষায় ১৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন পাশ করিয়াছিলেন (বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু) এবং তাঁরা দুইজনেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন। তারপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ডিগ্রি আইন প্রণীত হয় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষায় ১৫ জন ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৭জন পরীক্ষার্থী ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা সমিতি (**Indian Society for tne Cultivation of Science**) স্থাপিত করেন।

পরীক্ষার মান উঁচু ছিল ; কোনো উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী বলেন যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রদত্ত ডিগ্রি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্যর জর্জ ট্রেভেলিয়ান বলেছিলেন যে এ-দেশের উর্চ্চশ্রেণির লোকেরা প্রাচীন গ্রীকদের মতো বিদ্যোৎসাহী ছিল এবং তরুণ ব্রাহ্মণেরা এডিসনের (**Addison**) মতো ইংরেজি লিখতো ও স্যামুয়েল জনসনের মতো বাগ্‌বিন্যাস করতো। অপরপক্ষে তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করলে চাকরি পাওয়া সহজ হ'ত বলে' লোকের মনে ডিগ্রি সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মেছিল ; শিক্ষার জন্য শিক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষা ও পদবীর মূল্যে শিক্ষার মান নির্ণিত হ'ত।

শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় দেশীয় ভাষাসমূহের অবহেলা ঘটেছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমুহের শিক্ষা ও পরীক্ষণের ব্যবস্থা তাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং তার পুনঃপ্রতিষ্টা পরে বহু কষ্টে হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে মনোগত বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার ভাষাগত কাঠিন্যের জন্য মুখস্থবিদ্যার প্রসারে নোটবুকের আধিপত্য বাড়ে। এই দোষগুলি উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষারও ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট ছিল।

এই সময়ে অনেক নোতুন কলেজ প্রতিষ্টিত হয়। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে কলিকাতার হিন্দু কলেজে সরকারি কলেজে পরিণত হয় ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সি হাই স্কুল থেকে প্রেসিডেন্সি

কলেজের উদ্ভব হয়। অন্যান্য সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের য়ুনিভারসিটি কলেজ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের জন্য ওরিয়েন্টাল কলেজ বহু হিন্দী ও উর্দু বই প্রকাশিত করেছিল। ওই কলেজগুলি নিয়ে পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এলাহাবাদে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মিওর (**Muir**) কলেজ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল কলেজে পরিণত হয়।

কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথমে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদারদের প্রতিষ্ঠিত ক্যানিং কলেজের নাম করা যায়। তাঁরা ব্যয়নির্বাহার্থ ভূমিকরের শতকরা আট-আনা অনুপাতে শিক্ষাকর দিতে স্বীকৃত হ'ন এবং সমপরিমাণ সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়। এই কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল এবং পরে এর থেকে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শংকর ঘোষ লেনে হিন্দুসন্তানদের জন্য ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ওই স্কুল হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান কলেজে পরিণত হয়। ওগুলি এখন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন ও বিদ্যাসাগর কলেজরূপে বর্তমান আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিটি স্কুল স্থাপিত ও কলেজে পরিণত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এলবার্ট স্কুল কলেজে পরিণত হয়েছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হ'তে পারে নি। মাদ্রাজে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টায় পচায়াপ্পা কলেজ, ভিজাগাপট্টম কলেজ, টিনেভেলি কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। রাজপুত্রদের জন্য রাজকোট কলেজ, (১৮৭০), আজমীরের মেও কলেজ (১৮৭২), ইন্দোরের ডালি কলেজ (১৮৭৬), লাহোরের আইচিসন কলেজ (১৮৮৬) প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানত স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁয়ের চেষ্টায় আলিগড়ে "মোহাম্মেডান এংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ" স্থাপিত হয়। প্রথমে ওই কলেজে কেবল মুসলমান ছাত্র নেবার কথা ছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণের সহানুভূতি ও দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে নেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের বাসাহারের পৃথক ব্যবস্থা থাকলেও পড়াশোনা ও পুরস্কারের ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না। ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে এই কলেজের ১৭১ জন ছাত্রের মধ্যে ১৬ জন হিন্দু ছিল। ক্রমশঃ এটি আলিগড় মুসলিম য়ুনিভার্সিটিতে পরিণত হয়।

মেয়েদের কলেজের মধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুলে কলেজ খোলা হয় ও কাছাকাছি সময়ে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে মেয়েদের এফ-এ পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা

হয়েছিল। প্রথম দু'জন বাঙালী মহিলা গ্রাজুয়েটের মধ্যে কাদম্বিনী বসু বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন ও চন্দ্রমুখী বসু ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে এফ-এ এবং বেথুন থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন।

মিশনারি কলেজের মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। লাহোরের ফর্মান কলেজ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, লক্ষ্ণৌয়ের রীড কলেজ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং দিল্লীর ষ্টিফেন্স কলেজ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ২৭টি ও ভারতবর্ষে ৭২টি কলেজ ছিল। বাংলাদেশে প্রাচ্য শিক্ষার জন্য ছয়টি সরকারি কলেজ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য ১২টি সরকারি, পাঁচটি সাহায্যপ্রাপ্ত ও চারটি অন্য কলেজ ছিল। এ-ভিন্ন আজমীরের একটি কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল।

এই যুগের কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রাধান্য ছিল কিন্তু তাঁরা সরকার বা সাধারণের পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। জনসাধারণ ধর্মপ্রচারকে অগ্রাহ্য করে' শিক্ষাটুকুকে গ্রহণ করতে চাইতো আর সরকারি সাহায্যনীতির চেষ্টা ছিল সাধারণ্যের প্রচেষ্টার বৃদ্ধিদ্বারা মিশনারিদের খর্ব করা। ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও এই সময়ে কলেজী শিক্ষার প্রসারক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ও উদ্যম নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

অপর পক্ষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের অপসরণের নির্দেশ সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাধারণ্যের চেষ্টার অপ্রাচুর্য এবং সরকারি সন্দিগ্ধতা ও প্রতিযোগিতার ভাবকে এর কারণ স্বরূপ নির্দেশ করা যায়।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে কয়েকজন মাত্র যুবককে অত্যুচ্চ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে বহুর সাধারণ শিক্ষার নীতির ঘোষণা করে' মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের বিভিন্ন পথে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কার্যিক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর সরকারি সাহায্য, মিশনারিদের প্রচেষ্টা ও সাধারণের চাহিদা ও উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হ'তে থাকে।

১৮৫৪ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ বেশি ছিল কিন্তু ১৮৬৫ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষজনিত অর্থসংকটের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে কিছুটা শৈথিল্য আসে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ১৩৬৩টি সরকারি বিদ্যালয়ে ৪৪,৬০৫ জন ছাত্র পড়ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে সরকারি সাহায্যে বহু বে-সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বাংলাদেশে ৫৮২টি ভারতীয় পরিচালিত স্কুল ১,৯৮,৯১১ টাকা সরকারি সাহায্য পেত এবং ২৩টি অভারতীয় পরিচালিত স্কুল ১৬,৪২০৲ সরকারি সাহায্য পেত। সমগ্র ভারতে ১৩৪১টি ভারতীয় বিদ্যালয় ৩,৩৬,৮৩৭৲ আর ৭৫৭টি অভারতীয় বিদ্যালয় ২,৮৬,৮৭৭ টাকা সাহায্য পেত।

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় চেতনাও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা লেখা হয়। ঐ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন অগ্রণী হ'লেও তাঁর প্রচেষ্টা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই অধিক প্রযুক্ত হয়েছিল। মিস মেরি কার্পেণ্টার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন ঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগে তাঁর সহযোগিতা ছিল এবং কেশব চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, এস, এম, ঘোষ প্রভৃতির শিক্ষা-প্রচেষ্টার সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন কলেজের সংগে শিক্ষিকাশিক্ষণের জন্য 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' স্থাপিত হয়, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে (১৮৭২) ছাত্রীর অভাবে বিদ্যালয়টি উঠে গেল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের নায়কত্বে ব্রাহ্মবন্ধু সভার দ্বারা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হয় এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ওই প্রচেষ্টা উমেশচন্দ্র দত্তের বামাবোধিনী সভার হাতে ন্যস্ত হয়। ওই সভা বামাবোধিনী পত্রিকাও প্রকাশ করতো। উত্তরপাড়ার জমিদারেরা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া হিতকারী সভার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া নারীরক্ষা সমিতি, নারীকল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি নারীর অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। মেয়েদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মিকাসমাজ (১৮৬২), বামাহিতৈষিণী সভা (১৮৭১), আর্য নারীসমাজ (১৮৭৯), বংগ মহিলা সমাজ (১৮৭৯) প্রভৃতি কাজ করতো।

মিশনারি প্রচেষ্টা এই যুগের প্রারম্ভের অভিজ্ঞতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত প্রাধান্য ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছিল ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে সরকার ও সাধারণের মিশনারিদের ওপর বিশ্বাস ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের পর অনেক ইংরেজের ধারণা হয় যে মিশনারিদের কার্যকলাপ বিপজ্জনক। এইজন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানির ঘোষণায় ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার কথা বিশেষ করে বলা হয় এবং তারপর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতানীতির প্রয়োগে কড়াকড়ি বেড়ে যায়। ডাঃ ডাফ্ ধর্মবিহীন শিক্ষাকে দানবীয় বলেছিলেন এবং মিশনারিরা লৌকিক শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে "কলংকপূর্ণ" ও "ভগবানের

নিকট সাংঘাতিক পাপ" বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টার ফলেও সরকার প্রত্যেক স্কুলের লাইব্রেরিতে একটি করে' বাইবেল রাখার ব্যবস্থার বেশি অগ্রসর হ'তে রাজি হননি।

কয়েকটি কারণে মিশনারিদের অসন্তোষ খুব বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ সরকারি সাহায্যদাননীতিতে লৌকিক শিক্ষার দিকটাই মাত্র বিচার করা হ'ত বলে' মিশনারিরা তাঁদের বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাকে সমগ্রভাবে ধর্মকেন্দ্রিক করে' তুলতে পারতেন না এবং ইন্সপেক্টরদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু ব্রাহ্মণ বা ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ হওয়ার ফলে তাঁদের বিচারে কোন শৈথিল্য থাকতো না।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ থেকে অপসরণের প্রস্তাব থাকায় তাঁরা আশা করেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে তাঁরাই নেতৃস্থানীয় হবেন, কিন্তু সরকারি অপসরণনীতি কার্যকরী না হওয়ায় এবং সাধারণ্যের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি।

তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষার মাননির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁদের হাত থেকে চলে যায় এবং সরকারি পাঠ্যপুস্তক কমিটির প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁদের প্রচারিত পাঠ্যপুস্তকগুলিও ক্রমশঃ অচল হয়ে যেতে থাকে।

এইসব বিভিন্ন কারণে মিশনারিরা তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে যান, কিন্তু তাতে পরীক্ষালোভী জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে তাঁদের স্কুলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে আবার সরকারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে' রক্ষা করতে হয়। এইসব অসন্তুষ্ট মিশনারিদের অভিযোগ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের অনুষ্ঠানের একটি প্রধান কারণ ছিল।

সরকারি সাহায্যনীতির ফলে যে এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের পরিবর্তে ভারতীয় প্রচেষ্টাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেকথা আগে বলা হয়েছে; কিন্তু এই আকস্মিক বিস্তার সর্বাংশে শুভকর হয়নি। অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত বে-সরকারি বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল; উপরন্তু, সাধারণ্যের চাহিদার এমন অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেগুলি সরকারি সাহায্যনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদননীতির সর্তগুলি পূর্ণ করতে পারতো না, কেবলমাত্র বেতনের অর্থের ওপর নির্ভর করে' ছাত্রদের প্রাক্-প্রবেশিকা শিক্ষা দিত। আর্থিক দুরবস্থা ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এই বিদ্যালয়গুলির দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার মান অনেকাংশে নিচু হয়ে পড়তো।

এই যুগের মাধ্যমিক শিক্ষায় আরো অনেক খুঁৎ ছিল; তার মধ্যে প্রধান হ'ল

বৃত্তি-মূলক শিক্ষার অভাব। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে প্রয়োজনীয় কায়িক শিক্ষার জন্য বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে বোম্বাইয়ের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে কৃষিকেন্দ্রের সংযোগ করে' চাষীদের ছেলেদের বৃত্তি দিয়ে সেখানে পড়তে পাঠানো হ'ত ; কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোথাও আর কোনো উদ্যোগ হয়নি। অপরপক্ষে এণ্ট্রান্স পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার স্বরূপ গণ্য করা হ'ত এবং কিছু ইংরেজি লেখাপড়া শিখে সরকারি ও সওদাগরি আপিসে চাকরি পাওয়া যেত বলে' উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার ওপর অত্যন্ত ঝোঁক পড়েছিল। সরকারি বিদ্যালয়গুলি এই দোষে দুষ্ট ছিল আর সাধারণ্যের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষার চাহিদা জাগেনি এবং বেসরকারি স্কুলের পক্ষে কায়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাই এই মাধ্যমিক শিক্ষা হ'ল কলেজমুখী—জীবনমুখী নয়। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাবর্জিত বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষের দ্বারা এর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হ'ত এবং শিক্ষার ইংরেজিমাধ্যমকে বাধ্যতামূলক করার জন্যও বিদ্যালয়ই দায়ী ছিল।

ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার কুফলের বিষয়ে কলেজী শিক্ষার প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজের প্রয়োজন আর দেশের লোকের মোহ মিলিয়ে ওই কুব্যবস্থার প্রচলন ঘটলো।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির সমর্থন করা হ'লেও আঞ্চলিক ও ইংরেজিভাষার পাশাপাশি ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। তাতে এংলোভার্নাকুলার ও ইংরেজি এই দুই প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে' বলা হয়েছিল যে এংলোভার্নাকুলার স্কুলের মান স্বভাবতই নিচু হ'লেও উভয় প্রকারের বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্যনিরসনের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলার ব্যবহারে আগ্রহ দেখা যায়নি। মাতৃভাষা ভাল করে' শেখাবার আগে, প্রথম থেকে, তার পাশাপাশি ইংরেজিভাষা একটি বিষয়রূপে শেখানো হ'ত। এংলোভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে ইংরেজিভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানো হ'ত আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি অবধি ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য বিষয় বাংলায় পড়ানো হ'ত এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় ইংরেজিতে পড়ানো হ'ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস ও অংকের প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা বা ইংরেজিতে দেওয়ার বিকল্প ছিল কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে বলা হ'ল। এরপর আর এংলোভার্নাকুলার বিদ্যালয়গুলির আত্মরক্ষার উপায় রইলোনা।

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতার একটা কারণ ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে শিক্ষকশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার প্রস্তাব থাকলেও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয়নি। ওই সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মাত্র দুটি মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী শিক্ষকশিক্ষণকেন্দ্র ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ওই কলেজে আটজন গ্রাজুয়েট, তিনজন প্রথমবর্ষ কলা পর্যন্ত পড়া ও ১৮জন প্রবেশিকোত্তীর্ণ ছাত্র ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হয়; সেখানে এককালীন তিরিশজন ছাত্র নেওয়া হ'ত; প্রবেশের মান ছিল প্রথম বর্ষ কলা পর্যন্ত পড়া। এই কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকতার অভ্যাসের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে শিক্ষকশিক্ষণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হ'ত। কলিকাতার ফিমেল নর্মাল স্কুলের অসাফল্যের কথায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের অভাব বেশি ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সকল স্তরের শিক্ষার জন্য টেক্স্‌ট্‌ বুক কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু এদের প্রচারিত বইগুলি, বিশেষত বাংলা বই, বিলেতের বিদ্যালয়ের বইয়ের অনুকরণ বা অনুবাদমাত্র হওয়াতে এদেশে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা :—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোম্পানিকর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত পরীক্ষামূলকভাবে চলেছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে "জীবনের প্রত্যেক স্তরের উপযোগী প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষা" এবং "যাদের নিজব্যয়ে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নেই" তাদের শিক্ষার উল্লেখ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশকে পরিকল্পনার স্বাধীনতা দিয়ে, আদর্শস্বরূপ মিঃ টমাসনের পদ্ধতির উদাহরণ দিয়ে, দেশজ বিদ্যালয়গুলিকে বিচক্ষণ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা সাধারণ্যের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে' নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশের সুপারিশ ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সরকারি দৃষ্টি উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকায় এই শিক্ষা আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে প্রণীত সাহায্যনীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল এবং তাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আদর্শ তো ছিলই না বরংচ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পক্ষে বেতন নেওয়া আবশ্যিক ছিল। বেতনের হার অত্যন্ত কম থাকলেও এ-দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মিত বেতনের

ধারণা না থাকায় ও লোকের আত্যন্তিক দারিদ্র্যবশত এই ব্যবস্থা সফল হ'তে পারেনি। তাছাড়া গ্রামের সামান্য প্রয়োজন গ্রাম্য পাঠশালার দ্বারাই মিটতো। উচ্চতর শিক্ষার মূল্যবোধ করার মতো সাংস্কৃতিক মান তাদের ছিল না। গ্রামাঞ্চলে সরকারের প্রতি অবিশ্বাসও নূতন ব্যবস্থার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়েছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের নির্দেশানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার কিছু কিছু পরিকল্পনা প্রত্যেক প্রদেশেই গৃহীত হয়েছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে আংশিক স্বনির্ভরতার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। যে যে বিদ্যালয় শিক্ষকের বেতনের অর্ধেক দিতে ও আনুসংগিক ব্যয়-নির্বাহ করতে পারত এবং ছাত্রদের কাছে মাসিক অনূ্যন এক আনা বেতন নিত, সেগুলি সরকারি সাহায্য পেত। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্বের অর্ধেকের বেশি স্থানীয় লোকদের ওপর ন্যস্ত ছিল। বেতনলব্ধ অর্থ স্কুল সুপারিন্টেণ্ডের নির্দেশানুযায়ী স্কুলের কাজে প্রযুক্ত হ'ত এবং ছাত্রদের বেতন ভিন্ন নিজেদের বইপত্রও জোগাতে হত; দেশের গরিব লোকেরা এই শিক্ষাকে অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য ও উচ্চ মানের মনে করে' পুরনো গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাতো এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ এগুলিকে অবজ্ঞা করতো বলে' এই পরিকল্পনা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্জিত হয়।

এরপর বোম্বাই ও মাদ্রাজে উত্তরপ্রদেশের "হল্কাবন্দী" পদ্ধতির অনুকরণ করা হয়। ওই পদ্ধতির বিবরণ অন্য পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। জমিদারদের করদানস্বীকৃতি তথা, শিক্ষাক ওই পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল। বোম্বাইয়ে সরকারি বিদ্যালয়ই প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচারের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর দেশজ বিদ্যালয়ের সাহায্যের কিছু ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজে নানাকারণে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অবহেলার পর পরীক্ষাফলের ওপর ভিত্তি করে' নূতন সাহায্যনীতি প্রণীত হয়। সাধারণ ও মিশনারিদের প্রচেষ্টা সরকারের নির্ভরস্থল ছিল। অভাবপক্ষে সরকারি বিদ্যালয় খোলা এবং দেশজ বিদ্যালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা করা হ'ত।

বাংলাদেশে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগেই পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট বংগীয় শিক্ষাকাউন্সিলকে এডাম ও টমাসনের পরিকল্পনা মিশ্রিত করে' প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি খসড়া প্রস্তুত করতে বলেন। ওই পত্রের উত্তরের সঙ্গে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত একটি পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। উক্ত পরিকল্পনায় সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাংলামাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্র

শিক্ষার মানসম্বন্ধে লিখেছিলেন যে শুধু সামান্য বাংলা লেখাপড়া আর অংক শেখালেই চলবে না ; শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্ব শেখানোর প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকরূপে তিনি কতকগুলি বইয়ের নাম করেছিলেন এবং আরো উপযুক্ত পুস্তকসমূহেরও প্রণয়ণের একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়গুলিতে তিন থেকে পাঁচটি করে' শ্রেণি থাকে বলে তিনি অন্ততঃ দুইজন করে' শিক্ষক রাখার কথা লিখেছিলেন। গুণ ও উপযোগিতা অনুসারে সাধারণ পণ্ডিতদের অন্যূন ৩০৲, ২৫৲ বা ২০৲ এবং হেড পণ্ডিতের ৫০৲ টাকা বেতন দেওয়ার স্থপারিশ করেছিলেন। পরীক্ষামূলকভাবে হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জিলায় পঁচিশটি বিদ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব করেছিলেন। লিখেছিলেন যে যে-সমস্ত জায়গায় ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেখানেই এগুলি স্থাপন করতে হবে, কেননা ইংরেজি স্কুল কলেজের আশেপাশে বাংলা শিক্ষার আদর হবে না। দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য হার্ডিঞ্জনীতির পুনর্ঘোষণার স্থপারিশ করেছিলেন। তত্ত্বাবধানের জন্য দুইজন বাঙালী তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগের কথা লিখেছিলেন। স্কুলগুলির ঘন ঘন পরিদর্শন করে' ও ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধন ও উন্নয়ন তাদের কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলিকে নিতান্ত অকেজো বলে' মিশনারি ও সাধারণ্যের প্রতিষ্ঠিত নূতন স্কুলগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি আদর্শে নূতন স্কুলস্থাপনের জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করার সমর্থন করেছিলেন। তত্ত্বাবধায়কদের সাহায্য করার জন্য সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং সর্বোপরি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে সামান্য অতিরিক্ত দক্ষিণায় প্রধান তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করার স্থপারিশ করেছিলেন। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পুস্তক প্রণয়ন ও নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত হবেন এবং সংস্কৃত কলেজ শিক্ষকসৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ এক নর্মাল স্কুলের কাজ করবে। বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা সমগ্রভাবে গৃহীত হয় নি।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে "সার্কেল-সিষ্টেম" প্রবর্তিত হয়। এতে তিন চারটি গ্রাম নিয়ে একেকটি "সার্কেল" (circle) করে' তার পরিদর্শনের জন্য সরকারি পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ ত। শিক্ষাধীন ছাত্রেরা কিছুদূর অগ্রসর হ'লে অগ্রগতির মান অনুযায়ী পুরস্কৃত হ'ত আর গুরুকে তাদের সকলের পুরস্কারের সমান বেতন দেওয়া হ'ত। সরকার শিক্ষক ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিদ্বারা গ্রামবৃদ্ধদের উদ্যোগিতা বাড়াবার চেষ্টা করতেন।

সার্কেলসিষ্টেম বিদ্যাসাগরমহাশয়কে দক্ষিণবাংলার "মডেল" বংগবিদ্যালয়-গুলির পরিদর্শনের জন্য সহকারী ইন্সপেক্টরের (পরে স্পেশাল ইন্সপেক্টর) পদে নিয়োজিত করা এবং সংস্কৃত কলেজের সংশ্লিষ্ট 'পাঠশালা' নামক বাংলা-বিদ্যালয়কে নর্মালস্কুলে পরিণত করে' ছয়মাস অন্তর ষাটটি করে' শিক্ষকশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ প্র্যাট হুগলিতে নর্মাল স্কুল স্থাপিত করেন, তৃতীয়টি ওই বৎসর ঢাকার এবং চতুর্থটি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায় স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা ও পাটনায় নর্মালস্কুলে ইংরেজির শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ইংরেজিবিভাগ খোলা হয়। হাণ্টার কমিশনে বাংলাদেশে আটটি নর্মালস্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকার পাঁচটি জেলার (নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর) প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে' পঁচিশটি স্কুল স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়প্রতি মাসে ৫০৲ খরচ হ'ত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা মিঃ উড্রো এই ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত বলে' ঘোষণা করলেও দেখা যায় যে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর অধীনে মাত্র ১৭২টি স্কুল ৭৭৩১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করছিল। এই ব্যবস্থা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলিসাহেবের পত্রেও অনুমোদিত হয়নি। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ্যের চেষ্টা স্বপ্রণোদিত হয়নি বলে সরকারি উদ্যম দেশের লোকের কাছে জুলুমের মতো প্রতিভাত হয়েছিল।

ইন্সপেক্টরের পদে নিয়োজিত থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সার্কেল-সিষ্টেমের অধীনে তিনি ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকেন। তখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আংশিক স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ত, কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় উদ্যমের অভাববশত বিদ্যাসাগর সেগুলির জন্য পূর্ণ সরকারি দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর এই স্বীকৃতির পশ্চাতে ছোটলাট হ্যালিডেসাহেবের সমর্থন থাকলেও শেষপর্যন্ত শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন পাওয়া যায়নি এবং প্রধানত এই বিষয়ের মনোমালিন্যের জন্যই তিনি সরকারি পদ ত্যাগ করেন। কাজ ছাড়ার পরও বহুদিন তিনি চাঁদা তুলে স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্য করেন।

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বার্ষিক দশলক্ষ টাকার কম থেকে বেড়ে সাড়ে একুশ লক্ষের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। এই সম্পর্কে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের তদানীন্তন সভাপতি লর্ড এলেনবরা বলেছিলেন যে এত কম সময়ে এত অধিক ব্যয়বৃদ্ধি সহজ কথা নয়। অপরপক্ষে তখনকার

শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় সরকারের আয়ের শতকরা একাংশের সামান্য বেশি ছিল এবং তার অধিকাংশই ব্যয় হ'ত কলেজী ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য।

বৃটিশ ভারতের শাসনভার কোম্পানীর কাছ থেকে পার্লামেণ্টের কাছে হস্তান্তরিত হ'লে পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতরাষ্ট্রের সেক্রেটারি লর্ড ষ্ট্যানলির কাছ থেকে শিক্ষাবিষয়ক একটি পত্র আসে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকশিক্ষণের কথা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যদানীতির অসাফল্যজনিত পরিমিত অর্থব্যয়ে ওই বিরাট ব্যাপারের সাধনের সমস্যা এই পত্রের প্রধান বিষয় ছিল। উডের পত্রের অন্যান্য বিষয়ের সমর্থনের পর এই পত্রে লেখা হয় যে প্রচলিত সাহায্যনীতির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভবপর নয়। দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও দোষপূর্ণ হ'লেও তার ওপর লোকের আস্থা বেশি বলে' নূতন স্কুলের উদ্যোগের জন্য সরকারি তৎপরতা গরিবের কাছে জুলুমের মতো হচ্ছিল এবং সরকার অপ্রীতিভাজন হয়ে সম্মান হারাচ্ছিল। এইসবের উল্লেখ করে' নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে জনসাধারণের মাতৃভাষামাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চাঁদা চাওয়ার পরিবর্তে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার দ্বারা তার ব্যবস্থা হবে। তদুপলক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকারদের পরিকল্পনারচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অর্থসংগ্রহের জন্য শিক্ষাকরের প্রস্তাব করা হয়েছিল। পূর্তবিভাগের কাজ-কর্মের জন্য তখন যে কর নেওয়ার প্রথা ছিল তার আদর্শে বাৎসরিক ভূমিকরের অনুপাতে শিক্ষাকর নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে সেই সময়ে শিক্ষাকর প্রচলিত ছিল বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে অন্যান্য প্রদেশেও সে বিষয়ে কোনো বাধা ঘটবে না, বরংচ চাঁদা আদায় করার চেয়ে করস্থাপন সহজ হবে বলে, অনুমান করা হয়েছিল। আরো লেখা হয়েছিল যে শিক্ষাব্যবস্থার ভার সরকার নিলেও শিক্ষা অবৈতনিক হবে না কারণ তাতে জনসাধারণের মধ্যে সাবলম্বিতার ভাব গড়ে' উঠতে পারে না।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবসমূহের পশ্চাতে ইংলণ্ডের ঘটনাবলির প্রভাব দেখা যায়। ইংলণ্ডে ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনেক দলাদলির পর আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা শিক্ষাকর স্থাপিত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক পিক্ষার আইন প্রণীত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পত্রের রচনার কালে ওই বাদানুবাদের মূল প্রসংগ-গুলি সম্ভবত রচয়িতাদের মনে ছিল। ভারতবর্ষেও এই পত্র মতানৈক্যের সৃষ্টি করেঃ কেউ কেউ নূতন নীতির স্বীকার করেন এবং কেউ কেউ ১৮৫৪

খৃষ্টাব্দের নীতির অনুবর্তন করে' চলতে চান। এই মতভেদের দুটি প্রধান বিষয় ছিল,—দেশজ বিদ্যালয়গুলি এবং শিক্ষাকর ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পত্রে সরাসরি সরকারি ব্যবস্থার কথা থাকায় অনেকে দেশজ বিদ্যালয়গুলির পক্ষাবলম্বন করে' আপত্তি জানান এবং অনেকে দুই বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করে' দেশজ বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত করার প্রস্তাব করেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে।

বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিকরের ২½% থেকে ৭½% পর্যন্ত অনুপাতে বিভিন্ন হারে শিক্ষাকর প্রবর্তিত হয়। কোনো কোনো প্রদেশে পৃথক শিক্ষাকরের পরিবর্তে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভাণ্ডারের অংশবিশেষ শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করে' দেওয়া হয়। বাংলাদেশের জমিদারসম্প্রদায় শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করেন, তাঁরা বলেন যে সরকারি পাঠশালাগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষি ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য হওয়ায় কেবল ভূমিজীবিসম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষাকর নেওয়া একদেশদর্শিতার কাজ হবে। উপরন্তু, তাঁরা বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একবার ভূমিকর নির্ধারিত হয়ে যাবার পর সরকারের তদুপরি অন্য করগ্রহণের অধিকার নেই।

সিপাহিবিদ্রোহের পর ভারতসরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হয়ে মিঃ জেম্‌স্ উইলসন ইংলণ্ড থেকে এদেশে এসেছিলেন, তিনি বলেন যে ভূমিকরের সংগে শিক্ষাকরের পরিমাণগত হিসেব ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার প্রবর্তনের পক্ষে কোনো আইনগত বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেননি! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডিউক্ অব্ আর্গাইলের পত্রে জেম্‌স্ উইলসনের মতের সমর্থন করেও জমিদারগণের অসন্তোষের ভয়ে করগ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের নানাস্থানে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তারপর, বাংলা ও বিহারের দুর্ভিক্ষের (১৮৭৩-৭৪) পর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষকমিশন বসে এবং তার রিপোর্টে ভূমিকরের ওপর যে-কোনো নূতন করস্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। এইভাবে বাংলার সরকার সাহায্যনীতির দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করতে বাধ্য হ'ন।

এই কারণে বোম্বাই ও মাদ্রাজে যখন নূতন স্কুল খোলা হচ্ছিল তখন

বাংলাদেশে দেশজ বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে' ওঠে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত সার্কেল সিষ্টেমের কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্যর পিটার গ্রাণ্ট ওই ব্যবস্থার সংগে নর্মালস্কুলব্যবস্থা যুক্ত করেন। তাতে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা তাঁর কোনো নিকট আত্মীয় বা উত্তরাধিকারীকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দিয়ে নর্মালস্কুলে পড়ানো হ'ত। গ্রামবৃদ্ধগণের সংগে চুক্তি করা হ'ত যে একবৎসর শিক্ষালাভের পর অন্যূন মাসিক পাঁচটাকা বেতনে তাদের ওই গ্রামের বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হবে। নর্মালস্কুলে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অনুস্থত রীতির লেখাপড়া, অংক, হিসাব ও জমিজরীপ পূর্ণমানে শেখানো হ'ত। এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল যে এতে শিক্ষগণ বাস্তবিক গুরুমহাশয়শ্রেণির ও শিক্ষাটি প্রকৃত দেশী শিক্ষা হ'ত। পণ্ডিতদের বৃত্তির প্রলোভন দেখিয়ে সমগ্র দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে এর প্রয়োগ ব্যাহত হয় এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ২৪৩০টি পাঠাশালা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নূতন ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেল দেশজ বিদ্যালয়ের দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে জনশিক্ষার প্রচারকল্পে বার্ষিক চারলক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেন। তাঁর পরিকল্পনায় বিভাগীয় পরিদর্শকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করতেন এবং শিক্ষকদের স্কুল থেকে লব্ধ বেতনের ওপর অনূর্ধ পাঁচটাকা থেকে অন্যূন দুই টাকা পর্যন্ত সরকারি ভাতা দেওয়া হ'ত। সাধারণ গুরুমহাশয় শ্রেণির পণ্ডিতদের ওপর দেশের লোকের অধিক আস্থা দেখে তিনি তাদের দ্বারা শিক্ষা-ব্যবস্থার সমর্থন করতেন এবং বেশি শিক্ষা পেলে গ্রামের লোকেরা পিতৃকর্ম ছেড়ে দেবে বলে' দোকানদার ও তালুকদার, মোড়ল, ছুতোর, তাঁতি, কামার, মাঝি জেলে প্রভৃতি সাধারণ লোকের স্বার্থরক্ষার উপযোগী সামান্য লেখাপড়ার চেয়ে উচ্চমানের শিক্ষার দরকার নেই বলে' ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে শিক্ষার মান নিচু করে' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে যারা বাস্তবিক কৃতিত্ব দেখাতে পারবে তাদের বৃত্তির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার মান নীচু ও ব্যয় কম হওয়ায় অনেক বিদ্যালয় সরকারি সাহায্যের অধীন হয়, কিন্তু শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়ার সংগে সংগে বহু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তদনুপাতে তাদের বেতন কমিয়ে দিতে থাকেন। এই দুর্নীতি দূর করার জন্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের জিলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এল, হ্যারিসন তাঁর

জিলায় পরীক্ষাফলে বৃত্তি, পুরস্কার ও সাহায্যদানের নীতির (payment by results) প্রবর্তন করেন ; ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, ছোটলাটের আদেশে এই নীতি বংগদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়।

এই নিয়মে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে বৎসরে দুটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নেওয়া হ'ত। একটি সাবসেণ্টার পরীক্ষা, তাতে লেখাপড়া ও অংকের পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জমিদারী ও মহাজনী হিসেব, শ্রুতলিপি ও ব্যাখ্যার পরীক্ষা হ'ত। পরীক্ষা পাশের দুটো শ্রেণি ছিল। শিক্ষক প্রথম শ্রেণিতে পাশকরা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাশকরা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আট আনা পুরস্কার পেত। জমিদারী ও মহাজনী হিসেবে পাশকরা প্রত্যেক ছাত্রের দরুণ একটাকা এবং শ্রুতলিপি ও ব্যাখ্যায় পাশকরা প্রত্যেক ছাত্রের দরুণ দুটাকা পুরস্কার শিক্ষক পেত এবং শ্রুতলিপি ও ব্যাখ্যায় পাশ করলে ছাত্রেরাও দু টাকা পুরস্কার পেত। একজন গুরু পঞ্চাশজন ছাত্র একবারে পাঠালে এবং মেয়েদের জন্য প্রথম তিন বিষয়ের পুরস্কার দ্বিগুণীকৃত হ'ত। তাছাড়া স্কুলের স্থায়িত্ব, সুরক্ষিত রেজিষ্টার বই প্রভৃতির জন্য ছোটখাট পুরস্কার ছিল। এই ব্যবস্থায় গুরুমহাশয়দের আয়বৃদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত করা হ'ত।

অপরটি ছিল সেণ্ট্রাল ওরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফল অনুসারে ছাত্রদের পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়া হ'ত। তার জন্য উপরিউক্ত বিষয়সমূহের গভীরতর জ্ঞান চাওয়া হ'ত। তাছাড়া জমিজরীপের পরীক্ষাও ছিল। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের সেণ্ট্রাল পরীক্ষায় ৩১১০টি পাঠশালা থেকে ১১,৪৬২ জন ছাত্র উপস্থিত হয় ও ৫২৪৬ জন পাশ করে। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৮৮৭টি পাঠশালা থেকে ২৬,২৯৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয় ও ১৩,৯৫১ জন পাশ করে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সমস্ত পাঠশালা বিভাগীয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে তার অর্ধেকের বেশি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই নিয়মে সর্বপ্রথম দেশীয় পাঠশালার উদ্যোগকর্তাদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত হবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়, কিন্তু সরকার ওই বর্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করতে পারলেন না। শিক্ষকদের পুরস্কার এবং সংগে সংগে তাদের উৎসাহও কমে' যেতে লাগলো।

এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়পিছু অর্থের প্রয়োজন কিছু কমলেও সরকারি সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে সরকারি বিভাগের অধীনে ২৮টি বিভাগীয় বিদ্যালয়ে ৯১৬ জন ছাত্র, ৪৭,৩৭৪টি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৮,৩৫,৪৩৫ জন ছাত্র এবং সরকারের গোচরীভূত ৩২৬৫টি

পাঠশালায় ৪৯,২৩৮ জন ছাত্র পড়তো সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলপ্রতি গড়ে ১১৲ সাহায্য দেওয়া হ'ত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গঠিত হতে থাকে এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রাদেশিক সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এইসব পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার অধিকর্তাদের দায়িত্ব-বিভাগসম্বন্ধে অস্পষ্টতার নিরসনকল্পে বড়লাটের এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হবে এবং তার পরিমাণনির্ধারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ করবেন। অপরপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যনীতির অসাফল্যের কথা স্মরণ রেখে সে বিষয়ে আঞ্চলিক কর ও প্রচেষ্টার ওপরই প্রধানভাবে নির্ভর করতে হবে। বস্তুত, স্থানীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় অর্থের সুসমঞ্জস ব্যবহারে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হবে।

আরো বলা হয়েছিল যে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ আদৌ কম তাই তাকে বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু কমান হবেনা। বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনবোধে স্থানীয় লব্ধ সমুদয় অর্থের অর্ধপরিমাণ পর্যন্ত সাহায্য করা যেতে পারবে এবং প্রাদেশিক অর্থভাণ্ডার থেকে বিদ্যালয়ের বাটিনির্মাণ প্রভৃতির জন্য যে সাহায্য দেওয়া যাবে তার অনুপাতও অনুরূপ হবে। পশ্চাদ্পদ অঞ্চলে স্থানীয় প্রচেষ্টার পরিমাণ বিচার না করেই সাহায্য দেওয়া হবে।

তারপর থেকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার উদ্বর্তনের সংগে প্রাথমিক শিক্ষার ভার ক্রমশ তাদের হাতে চলে গেছিল এবং শিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছিল তাতে ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রাদেশিক সরকারি অর্থ ৫,৯৭,০০০৲, স্থানীয় বোর্ডের অর্থ ১৩,০০০৲, বেতনলব্ধ অর্থ ১০,৭৭,০০৲, ও অন্যান্য স্থান থেকে লব্ধ অর্থ ২,৮০,০০০৲, মোট ১৯,৬৭,০০০৲ ব্যয় হত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত অর্থ তার আয়ের অনুপাতে শতটাকা পিছু আট আনাও ছিলনা (·০৪৮%)। তখন সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক ভাণ্ডারসমূহ থেকে ১৭,৭৭,০০০৲, বিভিন্ন বোর্ড থেকে ২৪,৮৮,০০০৲, বেতন থেকে ১৭,৮২,০০০৲ ও অন্যান্য স্থান ১০,১৭,০০০৲, এইভাবে মোট ৬৯,৬৪,০০০৲ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছিল।

বাংলাদেশের দেশজ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই এই সময়ে হয় নষ্ট নয়

সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত হয়েছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রতি দশজন হিন্দু ইস্কুলের ছাত্রের মধ্যে একজন পাঠশালায় পড়তো আর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতি চল্লিশজনের মধ্যে একজন পড়তে। বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় সবচেয়ে বেশি হলেও সরকারি বিদ্যালয়ের প্রাধান্যের ফলে বিস্তারের অনুপাত কম ছিল। অর্থব্যয় ও শিক্ষাবিস্তার দুই দিকেই পঞ্জাব সবচেয়ে পেছনে ছিল।

এই সময়ে শিক্ষার সবদিকেই মিশনারিদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধিত ধর্মপ্রচারের ফলে ১৮৭১-১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ২২% বৃদ্ধি পায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মিশনারিরা প্রায় একলক্ষ ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছিল। তার একতৃতীয়াংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, সামান্য কিছু কলেজে আর সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তারা প্রায় দুই লক্ষ ছাত্রকে পড়াচ্ছিল, তার অর্ধেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কিছু কলেজে আর বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো। এই সব বিদ্যালয়ে লৌকিক শিক্ষা ভিন্ন খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল পড়ানো হ'ত। মিশনারিশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে এই কথা মনে রাখার দরকার যে তার সাংখ্যিক বিস্তার যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ও ভারতীয় জনসাধারণকৃত শিক্ষার আরো অনেক বিস্তার হওয়ার ফলে মিশনারির প্রচেষ্টা আনুপাতিক ভাবে অপ্রধান হয়ে পড়েছিল।

এই যুগের শেষে বাংলাদেশের স্কুলে যাবার বয়সের ছেলেদের মধ্যে প্রায় ২১% (২০·২৮%) আর মেয়েদের মধ্যে প্রায় ১%. (০৮%) পাচ্ছিল। সমগ্র ভারতের ছেলেদের ১৬·২৮% আর মেয়েদের ·৮৪% প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল (এই হিসেবে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয়দের শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে), অর্থাৎ ভারতের ছেলেদের মধ্যে শতকরা আশীজনেরও বেশি আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮৯ জনেরও বেশি অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

———

"হাণ্টার কমিশন"

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের স্থপারিশগুলি যে তৎপরবর্তিকালে স্থযোগ্যভাবে কাজে পরিণত করা যায়নি সে-কথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। ঐ অপপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগজনিত অসন্তোষই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের নিয়োগের প্রধান কারণ ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পরে স্পষ্টত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সরকারি প্রচেষ্টা উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অপসৃত করে' নিম্নশ্রেণির যে-সব লোকের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নেই তাদের জন্য প্রযুক্ত হবে, কিন্তু কার্যত তার পরিবর্তে পুরাতন চুঁইয়ে-পড়ার নীতিই অবলম্বিত হ'য়ে চলেছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষার অবহেলা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত প্রযত্ন হচ্ছিল। দেশের অধিকাংশ অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকছিল।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় সাধারণচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি হ'ত বলে' সাহায্যনীতির দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা থেকে সরকারি অপসরণের ফলে শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে ব্যাপকতার বৃদ্ধি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের একটি উদ্দেশ্য ছিল। অথচ কার্যক্ষেত্রে সরকারি অপসরণের কোনো চেষ্টা ও ইচ্ছা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখা না যাওয়াতে একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসার ব্যাহত হচ্ছিল আর অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাও যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছিল না। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত সাফল্যের সময়েও যে সে প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল না তার ইংগিত পূর্বপরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হয়েছে। সরকারি অপসরণের অভাবে, দেশের লোকের উদ্যমকে নষ্ট করাই সরকারের উদ্দেশ্য বলে' মনে করে' দেশের বিদ্যোৎসাহিগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। অপরপক্ষে মিশনারিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য হারিয়ে সরকারপ্রবর্তিত ধর্ম ও ঈশ্বরবর্জিত লৌকিক শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে বিরক্তিভরে দেশে ফিরে গিয়ে আর্ল অব্ শাফ্‌ট্‌বেরী, লর্ড লরেন্স, লর্ড হ্যালিফাক্স (স্যর চার্লস উড) প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভ্যরূপে নিয়ে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "জেনেরাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া" নামক সমিতি স্থাপন করেন। তার সেক্রেটারি রেঃ জেম্‌স্ জনষ্টন প্রমুখ ব্যক্তি সমিতির পক্ষ থেকে তখনকার ভারতের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট, লর্ড হার্টিংটনের সংগে দেখা করে' অনুরোধ করার

ফলে তিনি লর্ড রিপন ভারতে যাবার সময়ে তাঁকে এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা সত্ত্বেও যথেষ্টসংখ্যক ভারতবাসী সরকারি চাকরি না পাওয়াতে দেশের লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। মিশনারি ও সাধারণ স্কুলের ছাত্রগণ ভাবতো যে পরীক্ষা ও কর্মে নিয়োগ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অযথাভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। বস্তুত অসন্তোষের মূল কারণ ছিল সরকারি চাকরির সংখ্যাল্পতা, ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত আটাশ বৎসরের মধ্যে এগারো জন মাত্র ভারতবাসী উচ্চতর সরকারি পদে নিযুক্ত হন। যাই হোক, সর্বসমেত দেশের নিরক্ষরতাদূরীকরণের ব্যবস্থা, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থান, সাধারণ প্রচেষ্টার সংগে সরকারের সম্পর্ক, ভারতীয় শিক্ষায় মিশনারিদের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

লর্ড রিপন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের তেসরা ফেব্রুয়ারি ভারতের ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষাকমিশনের নিয়োগ করেন। বড়লাটের পরিষদের সভ্য স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের সভাপতিত্বে কুড়িজন সভ্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সরকারি কর্মচারী ভিন্ন মাদ্রাজের ডাঃ মিলার প্রমুখ যথেষ্টসংখ্যক মিশনারি এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, কে, টি, তেলাং, স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি ভারতীয়গণ এর সভ্য ছিলেন। সভাপতির নামে এই সভা "হাণ্টার কমিশন" রূপে সুপ্রসিদ্ধ।

তদন্তের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে' দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের প্রস্তাবগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছে অনুসন্ধান করে তদুক্ত নীতিসমূহের সুপ্রয়োগের উপায় নির্দেশ করা কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন ইংলণ্ডে সদ্য (১৮৮০) নূতন প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছিল এবং এদেশের লোকের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়েছিল বলে' প্রাথমিক শিক্ষার প্রসংগকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সাহায্য নীতির প্রসার ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলির শিক্ষাসম্বন্ধীয় কার্যকলাপের অনুসন্ধানও কমিশনের বিষয়ীভূত ছিল। অপর পক্ষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা কমিশনের আলোচনার বহির্ভূত করা হয়েছিল।

কমিশনের সামনের সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি ছিল—সরকারের উচ্চ-শিক্ষায় অত্যধিক মনোনিবেশ প্রাথমিক শিক্ষার অবহেলার কারণস্বরূপ হয়েছিল কিনা, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি শিক্ষায়তনগুলির স্থান কি এবং সাধারণের প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত।

প্রথমে সাত সপ্তাহ কলিকাতায় অধিবেশনের পর কমিশনের সভ্যগণ আটমাস দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সাক্ষ্য ও স্মারকপত্র সংগ্রহ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২২২টি সূত্রসম্বলিত ছয়শত পৃষ্ঠার 'রিপোর্ট' প্রকাশিত হয়। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল :—

অপসরণ :—

শিক্ষানীতিসম্বন্ধীয় প্রারম্ভিক মন্তব্যে বলা হয়েছে যে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের স্বনির্ভরতা অতিরিক্ত প্রাধান্য পাওয়ায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবিত নীতি অল্পবিস্তর অবহেলিত হয়েছে। এইজন্য কমিশনের প্রথম প্রস্তাব হ'ল যে প্রয়োজনানুসারে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের মতো পরিচালিত হ'লেও সাধারণের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিই শিক্ষাবিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

অর্থনৈতিক সুবিধাকে সরকারি অপসরণের প্রধান কারণস্বরূপ দেখান হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়সমূহ অধিক ব্যয়সাধ্য এবং সরকারি শিক্ষাখাতে অর্থ কম, এইজন্য দেশের লোকের আংশিক অর্থে ও সস্তা দেশী স্কুলে তদানীন্তন পরিমিত বরাদ্দের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশি হতে পারবে,—শিক্ষার উপায় ও চাহিদার সামঞ্জস্য সাধিত হবে। এইজন্য সরকার কেবল নোতুন বিদ্যালয় খোলা বন্ধ করবেন না. পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকেও সম্ভবমতো সাধারণের হাতে দিয়ে সরে' আসবেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার স্থানীয় সুগঠিত পরিচালক সমিতির নিকট হস্তান্তরিত করবেন আর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সরকারি প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করে' ওই শিক্ষার সমুদয় ভার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট দেওয়া হবে।

হাইস্কুল ও কলেজ থেকে অপসরণের কতকগুলি মূলসূত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল। যথা—(ক) উত্তম, বা যেগুলি এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে সরকার অপসৃত হ'লেও সমান উৎকর্ষ বজায় রেখে চলতে পারবে, (খ) মধ্যম,—বা যেগুলি থেকে কালক্রমে সরকার অপসরণ করতে পারবেন, কিন্তু সহসা অপসৃত হলে সে-গুলি উঠে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকবে, এবং (গ) অধম, বা যেগুলি এত অপকৃষ্ট যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে সেগুলি থাকা বা না-থাকা সমান। মধ্যম শ্রেণির প্রতিষ্ঠান থেকে অপসৃত হবার পূর্বে সরকার সেগুলিকে

প্রতিষ্ঠিত হবার মতো সময় দেবেন এবং উত্তম ও অধম কলেজগুলি থেকে শনৈঃ অপসৃত হবেন। মোটামুটি হিসেবে, যে বিদ্যালয়ের ব্যয়ের শতকরা ষাট্-অংশ বেতনলব্ধ অর্থ থেকে চলে সেগুলিকে অপসরণের উপযোগী বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারনীতির মধ্যে প্রভেদ এই যে স্থানীয় সহযোগিতার অপেক্ষা না রেখে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু অন্য ছ'টি স্তরের জন্য স্থানীয় সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা হবে।

তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে একমাত্র সাহায্যনীতির সহায়তার নোতুন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় খোলা হবে এবং প্রত্যেক জিলায় একটি করে উক্ত প্রকার বিদ্যালয় খোলা হয়ে গেলে আর অধিক প্রসারের জন্য সরকার ব্যস্ত হ বেন না। স্থানীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রথম কয়বৎসর সাহায্যদানে বিশেষ উদার-নীতির অবলম্বন করা হবে।

চতুর্থত, কোন সরকারি স্কুল বা কলেজ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত করার সময়ে তার গৃহ ও অন্যান্য সমুদয় সম্পত্তি সংগে দেওয়া হবে এবং নিযুক্ত কর্মচারিগণের চাকরির অবস্থার যাতে অবনতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

সাহায্য দান :—

অপসরণের সংগে সাহায্যদানের নীতি অংগাংগিভাবে জড়িত, এইজন্য তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদাননীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যথা, প্রথমত, বিশেষভাবে মাদ্রাজে প্রচলিত "বেতন-সাহায্য" (Salary Grant System)—এই পদ্ধতির অধীনে শিক্ষকদের গুণানুসারে নির্দিষ্ট ক্রমের বেতনের জন্য সরকারি সাহায্য পাওয়া যেত। তাতে পরীক্ষাফলের ওপর বেশি ঝোঁক না দিয়ে নিজেদের নৈপুণ্যের বৃদ্ধির জন্য তাঁরা বেশি চেষ্টা করতেন বলে শিক্ষার মান উঁচু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্টকালের জন্য সাহায্যের (Fixed Period Grant) প্রথা প্রধানত উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত ছিল। এতে বেতনের জন্য সাহায্যদানের মতো জটিল পরিদর্শনের নিয়ম ছিল না এবং পরীক্ষাফলের জন্য অপেক্ষা করা হ'তনা বলে এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ছিল। উপরন্ত নির্দিষ্টকালের পর সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে সেই অর্থ অন্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যেত। অপর পক্ষে এই নীতির প্রয়োগে সরকারি অফিসারদের খেয়ালখুশির সুযোগ বেশি থাকা এর প্রধান দোষ ছিল।

তৃতীয়ত, পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের প্রথা প্রধানতঃ বোম্বাই ও

মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এতে শিক্ষার মাননির্ণয় সহজ ছিল, সাহায্যের অপচয় ঘটার সম্ভাবনা কম ছিল, কিন্তু পরীক্ষাফলের ওপর অত্যধিক নির্ভরের ফলে শিক্ষায় স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের হানি হ'ত এবং মুখস্থবিদ্যার প্রধান্য ঘটতো।

এইভাবে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থার আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত সূত্রের নির্ধারণ করা হয় যে—প্রত্যেক প্রদেশে যাতে উচ্চতম অনুপাতে স্থানীয় সহায়তা পাওয়া যায় সেইরূপ নীতির নির্বাচন করতে হবে, নীতির প্রণয়নে দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা থাকবেনা এবং গৃহোপকরণ, আসবাব প্রভৃতির জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।

সাহায্যনীতির দ্বারা দেশের লোকের উদ্যোগিতাকে স্বাংগীকরণের কতকগুলি মূলসূত্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ স্থানীয় উদ্যোক্তৃবর্গকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংগরূপে স্বীকার না করলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে পারবেন না বলে' তাঁদের নিয়ে এমন একটি বোর্ডের গঠন করতে হবে যারদ্বারা তাঁরা শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। অভাবপক্ষে রাষ্ট্র ও শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। উপরন্তু সহযোগিতার কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রত্যেক ব্যাপারে উদ্যোক্তৃবর্গের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বিভাগীয় পরীক্ষাগ্রহণে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার এবং সরকারি মানচিত্র, বৃত্তি, পুরস্কার প্রভৃতির ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমান গণ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সরকারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছেড়ে যতদূর সম্ভব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সাহায্যের নিয়মকানুনের মধ্যে অসুবিধা থাকবেনা, প্রত্যেক আবেদনের সত্বর উত্তর দিতে হবে এবং সাহায্য না দিলে তার কারণ নির্দেশ করতে হবে, প্রাপ্য সাহায্য দিতে দেরি করা হবেনা, সাহায্য নীতির কোনো পরিবর্তন হলে গেজেটে প্রকাশিত হবে ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহে অনুবাদ করে' বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে ও খবরের কাগজে প্রকাশিত করতে হবে। বিশেষ অবস্থায় সাহায্যনীতির প্রকারভেদ ঘটবে, যথা, পশ্চাদপদ অঞ্চলের বা অনুন্নত শ্রেণির জন্য সাহায্যের অনুপাত বেশি হবে।

চতুর্থতঃ শিক্ষার অবাধ প্রসারের জন্য প্রত্যেক বাৎসরিক বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের বৃদ্ধি করতে হবে।

পঞ্চমতঃ সাহায্যদাননীতি ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। কোনো অঞ্চলের একমাত্র বিদ্যালয়ে যদি ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তবে ছেলেদের জন্য ধর্মশিক্ষাটুকু বর্জন করে' বিদ্যালয়ের অন্য সমুদয় সুযোগসুবিধা গ্রহণের অধিকার অভিভাবকদের থাকবে।

ষষ্ঠতঃ শিক্ষায় বৈচিত্র্যের উৎসাহ দেবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য সাহায্য দিতে হবে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার মাধ্যম ও পুস্তকনির্বাচনের স্বাধীনতা দিতে হবে, পরীক্ষাব্যবস্থার দ্বারা একীকরণ যাতে না ঘটে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সপ্তমতঃ যতদূর সম্ভব সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত ভারতবাসিগণকে ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করতে হবে।

দেশজ ও প্রাথমিক শিক্ষা :—

বলা হয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার প্রথম ধাপ নয়, জনসাধারণের নিজ নিজ ভাষায় তাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সম্পূর্ণ শিক্ষা।

রাষ্ট্রকে অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনগণের আগ্রহসৃষ্টির জন্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের লর্ড হার্ডিজের প্রচারিত নীতি অনুসারে নিম্নতম সরকারি কর্মচারিপদে নিয়োগের সময়ে নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে অধিক সুযোগ দেওয়া হবে এবং আদিবাসী অধ্যুষিত পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। প্রথমে প্রত্যেক প্রদেশকে প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রণয়ন করতে হবে। তারপর স্বায়ত্ত শাসনাঞ্চলগুলিকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনের অঞ্চলরূপে গ্রহণ করে' প্রত্যেক অঞ্চলে "স্কুল-বোর্ড" গঠন করতে হবে। মিউনিসিপালিটি বা জিলাবোর্ডের স্কুল ইন্সপেক্টর স্কুলবোর্ডের সভ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। জিলা, মিউনিসিপাল ও লোকাল বোর্ড-গুলির শিক্ষাসম্বন্ধীয় কর্তব্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে নির্দিষ্ট করতে হবে।

স্কুলবোর্ডগুলির কাজ, তদঞ্চলস্থিত স্কুলগুলির ওপর স্কুলবোর্ডের ক্ষমতা ও সরকারের সংগে সম্বন্ধের নিয়ন্ত্রণের কতগুলি সূত্র দেওয়া হয়েছে, যথা—

(ক) কেবলমাত্র ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্কুলবোর্ডের অধীন থাকবে।

বিশেষ অবস্থায় অন্য কোন স্কুল থাকবে কিনা তা সরকার স্থির করবেন। কোনো ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বোর্ডের অর্থসাহায্য না নিলে স্বেচ্ছায় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে পারবে।

(খ) সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বোর্ডের সাধারণ নিয়ম ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে আত্মকর্তৃত্বশীল হবে।

(গ) বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের ক্ষমতা বোর্ডের থাকবে।

(ঘ) স্কুলবোর্ডের হাতে কি কি অর্থ থাকবে এবং তা কি ভাবে, কোন কোন স্তরের শিক্ষার জন্য দেওয়া হবে, তা আঞ্চলিক সরকার নির্দিষ্ট করে' দেবেন। প্রত্যেক স্কুল বোর্ড বাৎসরিক আয়ব্যয়ের অগ্রিম পরিকল্পনা তৈরি করবে, কোন কোন স্কুল বিভাগপরিচালিত ও কোনগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে তা ঠিক করবে, স্কুলগুলির তালিকা রাখবে ; স্কুলবাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার বা তদ্বিষয়ে সাহায্যদানের জন্য দায়ী থাকবে এবং সাধারণভাবে শিক্ষাকমিশনের নির্দেশসমূহ পালন করবে।

(ঙ) সরকার শিক্ষকশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুলের ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করে দেবেন। শিক্ষকদের নিয়োগ-বিনিয়োগ ও বেতনের হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে বোর্ড ক্ষমতাশীল থাকবে কিন্তু অযথা ব্যবহারে মাষ্টারদের সরকারের নিকট আবেদনের অধিকার থাকবে।

(চ) স্কুলবোর্ড প্রতিবৎসর সরকারের নিকট হিসাব ও বিবরণী পেশ করবে এবং সরকার তার কার্যের বিচার করে' অধিকতর প্রসারের উপায় নির্দেশ করবে। সরকারের অনুমোদন ভিন্ন বোর্ডের নিয়মকানুনের পরিবর্তন হবে না।

দেশজ বিদ্যালয়গুলির বিষয়ে কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ নিচ সর্বস্তরের দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করতে হবে। সেগুলির সংস্কার ও উন্নতি করে' সেগুলিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অংগীভূত করে' নিতে হবে। পাঠশালাগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাহনরূপে গণ্য করতে হবে, বংশানুক্রমিক গুরুমহাশয়দের বিশেষ শিক্ষাদানের পর পদে স্থায়ী করতে হবে এবং এই ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্কুলবোর্ডগুলিকে পাঠশালাগুলির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হবে এবং এগুলি আঞ্চলিক শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যক অংগরূপে স্কুলবোর্ডের সাধারণ নিয়মকানুনের অধীন হবে।

পাঠশালাগুলির ওপর জাতিভেদপ্রথার প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করে' বলা হয়েছে সেগুলির দ্বার জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বিশেষ

শ্রেণির লোকেরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে স্ব স্ব শ্রেণির জন্য পৃথক পাঠশালা খুলতে পারবেন কিন্তু সর্বসাধারণের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্টসংখ্যক সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নিম্ন শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'পরীক্ষাফলের' ভিত্তিতে সাহায্যদানের নীতিকেই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে' উল্লেখ করা হয়েছে।

পরীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা গুরুমহাশয়দের শিক্ষার ও দেশজপদ্ধতিসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু উচ্চ বা নিম্ন প্রাথমিক কোন পরীক্ষাই বাধ্যতামূলক করা হবে না। ইন্সপেক্টরেরা যতদূর সম্ভব প্রত্যেক অঞ্চলে গিয়ে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রত্যেক স্কুল পরিদর্শন করতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন।

শিক্ষার বিস্তারের পথ সুগম করবার জন্য পাঠ্যক্রমকে সরল এবং প্রয়োজনবোধে দেশীয় পদ্ধতির পাটিগণিত, গ্রাম্য হিসাব, জমিজরীপ, প্রাথমিক জড়বিজ্ঞান ও কৃষির জন্য তার প্রয়োগ, স্বাস্থ্য ও যন্ত্রশিল্পের শিক্ষা এর অংগীভূত করে' অধিকতর কার্য্যকরী করতে হবে। অপরপক্ষে পাঠ্যক্রমবিষয়ে সর্বভারতীয় মানের একীকরণের প্রচেষ্টা হবেনা এবং পুস্তকনির্বাচনের পূর্ণস্বাধীনতা পরিচালকবর্গের থাকবে। শ্রেণির প্রোমোশনের পরীক্ষা বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বের বিষয়ীভূত হবে,—কোনো সাধারণ প্রাদেশিক ব্যবস্থা থাকবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অবস্থানুযায়ী খেলা, জিম্‌ন্যাষ্টিক, ড্রিল প্রভৃতির দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা থাকবে। ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধীয় সাধারণ সরকারি নীতি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুসৃত হবে, এবং শিক্ষা যাতে সুশৃঙ্খল ও চরিত্রগঠনোপযোগী হয় তা ইন্সপেক্টররা দেখবেন এবং শিক্ষকদের সহায়তার জন্য এবিষয়ের নির্দেশপুস্তিকা রচনা করা হবে। প্রত্যেক অঞ্চলে, বিশেষ করে' গ্রাম্য ও পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলে, স্কুলের ছুটি ও ক্লাশ বসার সময় স্থানীয় প্রয়োজনানুযায়ী নির্ণিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে কোন অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার হবে তা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বোর্ডের অনুমোদনে স্থির করবেন। কোন ভিন্ন ভাষাভাষী যথেষ্টসংখ্যক ছেলেপিলে থাকলে শিক্ষাবিভাগ তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এ-গুলি যেন যতদূর সম্ভব সুলভ ও সরল হয়।

আর্থিক ব্যবস্থার সম্বন্ধে কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে :—

(ক) শিক্ষাখাতে ব্যবহার্য স্থানীয় ফণ্ডের সমুদয় ও সরকারি প্রাদেশিক ভাণ্ডারর নির্দিষ্ট অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হবে।

(খ) প্রত্যেক বোর্ডের অধীনে স্কুলে নির্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের বিনাবেতনে পড়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং দরিদ্র অঞ্চলের বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থার অনুপাত বেশি হবে। অবৈতনিক দরিদ্র ছাত্র ভিন্ন অপর সকলের নিকট বেতন নেওয়া হবে।

(গ) নিম্নলিখিত অর্থসমূহ নিয়ে মিউনিসিপাল স্কুলফণ্ড গঠিত হবে :— স্থানীয় সরকারকর্তৃক নির্ধারিত মিউনিসিপালিটির অর্থভাণ্ডারের যথেষ্ট অংশ, যে সব স্কুলের সমগ্র ব্যয় মিউনিসিপালিটি বহন করে তার বেতনলব্ধ অর্থ, লোকাল স্কুল ফণ্ডের কোন প্রদত্ত অংশ, প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য, শিক্ষার জন্য লব্ধ অন্যান্য ভাণ্ডার ও পূর্ববৎসরের উদ্বৃত্ত। স্থানীয় সরকারের দেয় অর্থ মিউনিসিপাল স্কুল ফণ্ডের অর্ধাংশ বা সমুদয় ব্যয়ের একতৃতীয়াংশ হওয়া উচিত বলা হয়েছে।

(ঘ) লোকাল স্কুলফণ্ড গঠিতহবে নিম্নলিখিত প্রকারে :—লোকাল ফণ্ডের নির্দিষ্ট অংশ, লোকাল স্কুলফণ্ডের অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়ের বেতনলব্ধ অর্থ, মিউনিসিপাল বোর্ডের প্রাদেশিক সরকারের এবং অন্য ফণ্ডের নিকট প্রাপ্ত অর্থ ও পূর্বতন বৎসরের উদ্বৃত্ত।

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার এই 'ফণ্ড'গুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্কুলবোর্ডের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

শিক্ষাকমিশন এইসব বিভিন্ন খাতের অর্থের বৃদ্ধির জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেননি কেবলমাত্র দায়িত্বের নির্দেশ করে' বলেছেন প্রাথমিক-শিক্ষায় সাহায্যবৃদ্ধির জন্য ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : –

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অধিকতর দায়িত্বগ্রহণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপের পরিবর্তে অপসরণনীতি-প্রয়োগ ও সাহায্য-সহায়তায় সাধারণের প্রচেষ্টা দ্বারা শিক্ষাবিস্তারই সরকারের উদ্দেশ্য বলে' ঘোষিত হয়েছে।

অপসরণ ও সাহায্যনীতির মূলসূত্রগুলি পূর্বেই নিবদ্ধ হলেও বর্তমান বিষয়ে তাদের প্রয়োগসম্বন্ধে স্পষ্টতার জন্য কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা— প্রথমত স্থায়িত্বের আশ্বাস পেলে সরকারি স্কুলগুলি সাধারণ্যের নিকট হস্তান্তরিত হবে কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ ও দরিদ্র অঞ্চলে সরকারি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত

হ'তে থাকবে এবং উন্নত অঞ্চলেও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শরূপে সরকার করবেন। তৃতীয়ত, তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন সাহায্যদাননীতির মধ্যে যে-কোনোটির অবিমিশ্রভাবে বা মিশ্রিত নীতির ব্যবহার প্রাদেশিক সরকারের বিচারের অধীন হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার আলোচনা এই কমিশনের আলোচ্যবিষয়ের বহির্ভূত ছিল কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকতর কার্যকারিতা ও জীবনোপযোগিতা সাধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রচলিত 'এন্ট্রান্স পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকামাত্রে পরিণত হওয়ায় আর পাশাপাশি শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে' শিক্ষার বৈচিত্র্যসাধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতম ধাপের দুটি শাখা থাকা চাই। একটি 'এ-কোর্স', প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়ার জন্য আর অন্যটি 'বি-কোর্স', যারা শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে যাবে তাদের উপযোগী কাষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। ছাত্রগণ আট-নয় বৎসর বিদ্যালয়ে পড়ার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষার দুই বৎসর পূর্বে শিক্ষার শাখা বেছে নেবে। বিভাগের পূর্ববর্তিকালের ওই শিক্ষা এমন হবে যাতে ছাত্রদের উভয় শাখার যে কোনটিতে যাবার ক্ষমতা জন্মায়। সেই সময়ে মাদ্রাজে প্রবেশিকোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন আর কলিকাতায় ৯০ জন কলেজে যেত, কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক ছাত্রই কলেজে যাওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার কাষিক শাখাটি বেছে নেবে।

'বি-কোর্সে' পাশ করা ছাত্রদের স্কুল পরিত্যাগের একটি 'সার্টিফিকেট' দেওয়া হবে বলা হয়েছে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে এরা রেল কোম্পানী, ব্যাংক ও অন্যান্য শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে এবং এই সার্টিফিকেট নিম্নতর কেরানির পদে নিয়োগের জন্য যথেষ্ট বলে স্বীকৃত হবে।

উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণের জন্য কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে শিক্ষার মূলসূত্র ও পদ্ধতির জ্ঞানের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে স্থায়ী চাকরি পাওয়ার জন্য ওই পরীক্ষায় পাশকরা আবশ্যক হবে। গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের জন্য নর্মাল স্কুলেই সংক্ষিপ্ততর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার উল্লেখ না থাকায় ধরে' নেওয়া যায় যে কমিশন তৎকালপ্রচলিত ইংরেজির মাধ্যমকে সমর্থন করেছেন।

নিম্ন মাধ্যমিক (middle) স্তরের মাধ্যম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় এই স্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণের উপযোগিতা দেখা গেছে। প্রথমত অনেক ছাত্রই মধ্যশিক্ষার পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয় না, তাদের পক্ষে ইংরেজিবাহন অসম্পূর্ণ শিক্ষার চেয়ে মাতৃভাষায় প্রদত্ত পরিপূর্ণ শিক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও দেখা গেছে যে যারা মাতৃভাষায় মধ্যশিক্ষা শেষ করে' আসে তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজিতে মধ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের চেয়ে ভাল ফললাভ করে। অপরপক্ষে মধ্যপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় ইংরেজিমাধ্যম মধ্যশিক্ষাই অধিকতর উপযোগী বলে' দেখা গেছে। এইজন্য মধ্যস্তরের শিক্ষার বাহন নির্বাচনে প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কলেজী শিক্ষা :—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপ কমিশনের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হওয়ায় এর রিপোর্টে মাত্র সাধারণশিক্ষার কলেজগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করা হয়েছে।

অপসরণ নীতির প্রয়োগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো সরকারি কলেজগুলিকেও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে' অনুরূপ ভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মতোই আদর্শস্থানীয় কয়েকটি কলেজ সরকারকে স্বহস্তে রাখতে বলা হয়েছে।

কলেজগুলিকে সাহায্যদান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অধ্যাপকবৃন্দ, পরিচালনার ব্যয়, প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, স্থানীয় প্রয়োজন প্রভৃতির বিচারদ্বারা সাহায্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে এবং আবশ্যকতানুযায়ী বাড়ী, আসবাব, গ্রন্থাগার প্রভৃতির জন্য বিশেষ সাহায্য করা হবে।

বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের অধিক সংখ্যার কলেজের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'সাহিত্যিক' ও 'জড়বৈজ্ঞানিক' এই উভয় শাখার শিক্ষার ব্যবস্থা করে' শিক্ষার বৈচিত্র্যসাধনের কথা বলা হয়েছে।

সহজ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অবলম্বনে নীতিশিক্ষার পুস্তকরচনা করে' সরকারি ও বেসরকারি কলেজে পড়বার প্রস্তাব করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে কলেজের অধ্যক্ষ বা কোনো অধ্যাপক প্রত্যেক বৎসর মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি করে' বক্তৃতা দেবেন।

ছাত্রদের নিকট বেতন গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে যে শিক্ষার প্রসারের হানি না ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চ হারে বেতন নিতে হাব, কিন্তু বেসরকারি কলেজগুলিকে সরকারি কলেজের চেয়ে কম বেতন নিতে বাধ্য করা হবে না। প্রত্যেক কলেজে কতগুলি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ানো হবে তা কর্তৃপক্ষগণ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে' স্থির করবেন এবং তদধিক ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়তে দেওয়া হবে না। কলেজী শিক্ষার শেষে ইংলণ্ডের উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।

বিশেষ বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমতঃ দেশীয় রাজপুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কতকগুলি উচ্চস্তরের কলেজ খোলা হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান সমাজ শিক্ষায় হিন্দুদের অপেক্ষা অনুন্নত থাকায় তাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হবে। তৃতীয়তঃ স্ত্রী-শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বালিকাবিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদান বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করা হবে এবং 'জেনানা' শিক্ষার জন্য বিশেষ 'গ্রাণ্ট' দেওয়া হবে। প্রাথমিক স্তরের মেয়েদের জন্য সহজতর পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হবে, শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' থাকবে ও বালিকাবিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের জন্য বিশেষ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হবে। চতুর্থতঃ আদিবাসী ও অনুন্নতসম্প্রদায়-সমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমত, বয়স্কদের জন্য নৈশবিদ্যালয় খোলা হবে।

মিশনারিদের শিক্ষাব্যবস্থা :—

সেই সময়ে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রাধান্য ছিল বলে' অনেকে আশংকা করেছিলেন যে সরকারি অপসরণের ফলে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁদের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। এই ভয়ে কেউ কেউ অপসরণ নীতিরই বিরোধিতা করেছিলেন। এই সন্দেহের নিরসনের জন্য কমিশন মন্তব্য করেন যে অপসরণকালে সরকার কোনো স্কুলকলেজ মিশনারিদের কাছে হস্তান্তরিত করবেন না। সরকারি ও জাতীয় প্রচেষ্টার মাঝামাঝি বলে' মিশনারি প্রচেষ্টাকে অভিহিত করা হয়েছে। স্থানীয় সাধারণের প্রচেষ্টার সঙ্গে এদের মিল এই যে এরাও বেসরকারি এবং অমিল এই যে এরা স্থানীয় প্রচেষ্টা নয়। স্থানীয় প্রচেষ্টা নয় বলে' এদের দ্বারা অপসরণনীতির পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারবে না, অর্থাৎ এতে সরকারের অর্থসৌকর্য হবে বটে, কিন্তু দেশেরর লোকের স্বাবলম্বিতা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণবৃদ্ধির সহায়তা করা হবে না। এই সব কারণে মিশনারি

প্রচেষ্টাকে অপসরণনীতির প্রয়োগক্ষেত্রে গণ্য না করা হলেও মিশনারি বিদ্যালয়ের উৎকর্ষের জন্য সেগুলিকে অনুকরণীয় আদর্শস্থলরূপে আদৃত করতে হবে আর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত করা হবে দেশের লোকের স্বচেষ্টার ওপর।

ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা :—

কমিশনের প্রস্তাবে কোনো ধর্মের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করা হয়েছে। অনেক স্থানে স্থানীয় একটি মাত্র বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় বলে অভিভাবকগণ ছেলেদের তার অধীনস্থ করার চেয়ে মূর্খ রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এরূপ অবস্থায় শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয় বলে কমিশনের মতে ধর্মশিক্ষাবর্জিত লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এইজন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষায় ছাত্রদের যোগ দেওয়া বা না দেওয়া অভিভাবকদের বিচারাধীন থাকবে, এভিন্ন ধর্মশিক্ষা-বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বিগণ নিজেদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলে সরকার প্রয়োজনমত তাদের সহায়তা করবেন এবং ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সংগে জড়িত না থাকলেও ওই ব্যবস্থা সরকারি পরিদর্শনের বহির্ভূত থাকবে।

সাহায্যদাননীতির প্রয়োগও, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পত্রের নির্দেশানুযায়ী ধর্মশিক্ষা নিরপেক্ষভাবে করা হবে।

সমালোচনা :—

কমিশনের রিপোর্ট খুব সাবধানতার সংগে রচিত হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রস্তাবগুলি ব্যর্থ হয়েছিল বলে' সমগ্র রিপোর্টটিরই বহু বিপরীত সমালোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা কমিশনের আলোচনার বিষয়বহির্ভূত হওয়ায় অনেকে এর উদ্দেশ্যকে সংকীর্ণতাদুষ্ট বলেছেন আর যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে অধিক আগ্রহশীল তাঁরা সমালোচনা করেছেন যে মাধ্যমিক ও কলেজীশিক্ষার আলোচনায় কমিশনের উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি যতখানি সযত্নে রচিত হতে পারতো তা হয়নি।

উপরি-উক্ত দুই মতের বিশ্লেষণে বলা যায় যে এই সময়ে যে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কমিশনের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন যে এই প্রস্তাবগুলির দ্বারা সাধিত হয়নি একথা যেমন সত্য, এও তেমনিই সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনাও অসম্পূর্ণ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যকলাপের আলোচনা বাদ পড়ায় খুব ক্ষতি হয়নি, বিশেষত পরশতাব্দির প্রথম থেকে পর পর দুটি

'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের' অনুষ্ঠানের ফলে সে অভাবের যথেষ্ট পূরণ হয়েছিল। আলোচ্য কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবগুলির অসম্পূর্ণতার কারণ হ'ল বৃত্তিশিক্ষাবিষয়ক আলোচনার অভাব। কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখিন করার নির্দেশ দিয়ে তারপর বৃত্তিশিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকায় বৃত্তিমুখিনতাসম্পর্কীয় প্রস্তাবগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল।

তারপর কমিশনের 'অপসরণনীতির' মূল কথাগুলি ভাল হলেও দেশের তৎকালীন অবস্থার উপযোগী ছিল না। দেশে তখনও মাধ্যমিক শিক্ষার মান ভালভাবে গড়ে' ওঠেনি বলে' এই নীতির প্রয়োগে শিক্ষার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেলেও মানের অপকর্ষ সাধিত হয়েছিল। অন্যদিকে তখনকার জেতৃবিজিতের রাজনৈতিক পটভূমিতে কমিশনের পরিকল্পিত সরকার ও সাধারণের সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারেনি এবং অনেক সময়েই শিক্ষাক্ষেত্র রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অপসরণনীতি আরো ব্যর্থ হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবাজেটের যে অচল-অবস্থার সৃষ্টি হয়, স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী করে' সেই অবস্থার কিছু উন্নতির আশা করা হয়েছিল। ইংলণ্ডে অনুরূপ ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের সদ্যঃপ্রসূত স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার পক্ষে এই দায়িত্ব অতিরিক্ত গুরুভার ছিল। তাছাড়া এই অসাফল্যের পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আরো কতকগুলি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ সরকারি ও আঞ্চলিক সাহায্যের একটা পরিমাণ নির্ণিত ছিল। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠান যতটা দিতে পারবেন সরকার তার অনুপাতে সাহায্য করবেন। তখন সরকারি শিক্ষাবাজেটের টাকা অত্যন্ত কম ছিল বটে কিন্তু আঞ্চলিক ভাণ্ডারের টাকা আরো এত কম ছিল যে তার দ্বারা সরকারি সাহায্যের অনুপাত রক্ষা সম্ভব হ'তনা বলে' ওই অত্যল্প সাহায্য পর্যন্ত অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়ে যেত।

দ্বিতীয়তঃ তখন দেশের গ্রামাঞ্চলের চতুর্দিগ্ব্যাপী নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে শিক্ষা একটা সামান্য অংশমাত্র ছিল বলে' এঁরা কোন দিকই সামলে উঠতে পারেননি।

তৃতীয়তঃ তৎকালীন জেতৃবিজিত মনোভাবস্পৃষ্ট রাজনীতির দ্বারা এই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক সহযোগিতা ও গঠনমূলক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়েছিল।

চতুর্থতঃ অনভ্যস্ত, নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিণতি

না হওয়ায় জিলা মিউনিসিপ্যাল ও লোকাল বোর্ডগুলি অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়তো।

স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলি যখন শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ অংশগ্রহণ করতে পারছিল না তখন স্কুলবোর্ডগুলিও যে কার্যকর হবেনা সে-কথা বলাই বাহুল্য। নানা দ্বন্দ্বকলহের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রতিষ্ঠাই হয়নি আর আরো অনেক ক্ষেত্রে বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েও কার্যকলাপের দিক দিয়ে অসফল হয়েছিল। 'স্কুল-অঞ্চলের' নির্দেশেও অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। এর পূর্ববর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকসমাজের সংগে জড়িত হলে তবে সরকারি ব্যবস্থা দেশের লোকের কাছে আদৃত হবে। এই কারণে কমিশন অনুরূপ প্রস্তাবই করেছিলেন। এতে শিক্ষার মান কোনো কোনো অংশে নিচু হলেও তার ব্যাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা বেশি ছিল। অন্যদিকে ওই ব্যাপ্তির প্রায় সমুদয় মূল্যই নষ্ট হ'তে বসেছিল পরীক্ষাগুলিকে বাধ্যতামূলক না করায়। সরকার সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং দেশের লোকও শিক্ষার মূল্য বুঝতো না এইজন্য সামান্য দুই এক বৎসর স্কুলে পড়ে' পড়া ছেড়ে দেওয়া ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ফলত অসম্পূর্ণ শিক্ষিত বহু লোকের নিরক্ষরতায় প্রত্যাবর্তনের ফলে শিক্ষার নিদারুণ অপচয় ঘটেছিলো এবং দেশের লোকে যে তিমির সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছিল।

কমিশনপ্রণীত সাহায্যদাননীতির প্রধান দোষ ছিল সাহায্যের অপ্রাচুর্য। প্রতেকে বাজেটে শিক্ষাখাতে অর্থবৃদ্ধির অস্পষ্ট প্রস্তাব করা ভিন্ন সাহায্যবৃদ্ধির কোনো কার্যকর পথনির্দেশ হয়নি। অপরদিকে, সাহায্যের নীতি সুস্পষ্ট ছিল বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগশৈথিল্যের ফলে ওই স্পষ্টতা সাধারণ কোনো সুফল প্রসব করতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বোর্ডগুলির অসাফল্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে 'স্কুল-ফণ্ডের' নিয়মকানুন এত জটিল ছিল যে ওই অপটু বোর্ডগুলির দ্বারা তার সুপরিচালনা সম্ভবপর হয়নি।

কমিশনের একটি নূতন কথা হ'ল—বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব। ওই প্রস্তাব প্রয়োজনীয় হলেও সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রই তখন সুপরিচালনার অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল বলে ওই নূতন প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে অনেক দিন কাজ আরম্ভ করা যায়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশনের নূতন কথা হ'ল শিক্ষাবিস্তারকে দ্বিধাবিভক্ত

করার প্রস্তাব। এই প্রস্তাব প্রয়োজনীয় হ'লেও তখনকার পরিস্থিতে সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারেনি। প্রথমত, ডিগ্রির মোহ তখন অধিকাংশ ছাত্রকেই কলেজীশিক্ষার দিকে ধাবিত করতো। বৃত্তিমূলক কোনো 'ডিগ্রি' তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে সেদিকের প্রতি একটা সাধারণ অবজ্ঞা দেখা যেত।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব ছিল। বৃত্তি-শিক্ষার আলোচনা কমিশনের বিষয়বহির্ভূত হওয়ায় কমিশন সে বিষয়ে কোনো প্রস্তাবও করতে পারেননি। উপরন্তু যারা 'বি-কোর্স' পড়তো তাদের পক্ষে পরবর্তিকালে উচ্চতর শিক্ষালাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এইজন্য কেবল যারা নিতান্ত 'এ-কোর্সের' পরীক্ষা পাশ করতে পারতো না তা'রাই 'বি-কোর্সের' পড়া করতো।

তৃতীয়ত, কমিশনের রিপোর্টে যেরূপ আশা প্রকাশ করা হয়েছিল বাস্তবিক ক্ষেত্রে অতগুলি পথ ও সুযোগ তখন দেশবাসীর সামনে উদ্ঘাটিত হয়নি।

তথাপি ওই প্রস্তাবের উপযোগিতা অস্বীকার্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'সার্জেণ্ট রিপোর্টের' পরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষার দুই শাখা আর স্বাধীনতার পরেকার 'বহুশাখা' শিক্ষা স্থিতিশীল মনোবৃত্তিতে আঘাত দিলেও দ্রুত শিল্পপরিণতি-শীল বর্তমান ভারতে এ-ভিন্ন অন্য পন্থা পাওয়া কঠিন।

কমিশনপরিকল্পিত উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় কথা ছিল সরকার ও সাধারণ্যের সহযোগিতা। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ্যের প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বর্ধিত হ'লেও বিদেশী সরকারের সংগে সহযোগিতার ভাব জেগে ওঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষার মতো এখানেও একটা আড়াআড়ির ভাব দেখা যায় এবং অনেক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে মধ্যশিক্ষার স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে দিলেও সম্পূর্ণ মাতৃভাষামাধ্যম মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ আদর্শ গৃহীত হওয়ার দিন তখনও সুদূর ছিল।

শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরের ও কলেজের অধ্যাপকের পদে অধিকসংখ্যক ভারতীয়গণের নিয়োগের প্রস্তাব যথেষ্ট না হলেও একে শিক্ষাক্ষেত্রে 'ভারতীয়-করণের' প্রথম আভাস বলা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের স্থাননির্দেশও স্পষ্ট হয়েছিল। কমিশন এদের প্রদত্ত শিক্ষার মানের উচ্চতা স্বীকার করেছিলেন কিন্তু জাতীয়শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে

সম্মত হননি। এতে মিশনারিরা অসন্তুষ্ট হ'লেও দেশের লোকের সন্তোষ হয়েছিল এবং ভারতীয় প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হয়েছিল।

ধর্মশিক্ষাবিষয়েও কমিশনের প্রস্তাব কিয়দংশে সমর্থনীয়। মিশনারিদের তুমুল প্রতিবাদসত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রস্তাবে এঁরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের লোকের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত করেছেন।

চরিত্রগঠনের জন্য নীতি ও নাগরিকতার বিষয়ের উপদেশের প্রস্তাবও ব্যর্থ হয়েছিল। নীতিশিক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল তখনকার যুগ ধর্মবিরহিত নীতির আদর্শ-গ্রহণের জন্য যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি বলে' এবং নাগরিকতার শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল রাষ্ট্র ও সাধারণ্যের বিরোধের ফলে। পরবর্তিকালের সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে ও স্বাধীনতালাভের পর রাধাকৃষ্ণণ ও মুদালিয়র কমিটির রিপোর্টে যে সর্বধর্মসমন্বয়-মূলক নীতিশিক্ষা ও অভ্যাসমূলক নাগরিকতাশিক্ষা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে তার প্রয়োগ ও প্রমাণের সময় এখনও হয়নি।

সর্বশেষ, সংক্ষেপে কমিশনের প্রস্তাবগুলির অসাফল্যের চারটি বড় কারণ নির্দেশ করা যায়—

প্রথমতঃ—অর্থাভাব।

দ্বিতীয়তঃ—দেশের স্বায়ত্তশাসন, শিল্পোন্নতি ও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিণত অবস্থা।

তৃতীয়তঃ—দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতি, এবং,

চতুর্থতঃ—বিলাতের আদর্শে প্রণীত অতি-আধুনিক ব্যবস্থার আমাদের পশ্চাদপদ দেশের পক্ষে অনুপযোগিতা।

পূর্বে প্রদত্ত সমালোচনাগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অসাফল্যের প্রত্যেকটি উদাহরণের পশ্চাতে উপরে উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক কারণ বর্তমান ছিল।

———

১৮৮২-১৯০২

১৮৮২ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ বছরের শিক্ষাক্ষেত্রের পরিণতি-সমূহ রূপ নিয়েছিল অনেকাংশেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবগুলির প্রভাবে।

সরকারি অপসরণ :—

শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবের সরকারি স্বীকৃতিরূপে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিনের এক সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ করার পর সাধারণ্যের হাতে সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে অপসৃত হবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হস্তান্তরনীতি সর্বাগ্রে গৃহীত হয়, কিন্তু পূর্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত ও বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষাংশে বর্ণিত কতকগুলি কারণে ওই কাজ সুফলপ্রসূ হয়নি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অতি কম ক্ষেত্রে সাধারণ্যের হাতে দেওয়া হয়েছিল, মিশনারিদের হাতে তো একেবারেই নয়। সম্ভবত সাধারণ্যের প্রচেষ্টা-বিষয়ে সরকারি সন্দিগ্ধতাই এই অবস্থার মূলে কার্যকর ছিল।

সাধারণ্যের পৃষ্ঠপোষকতা :—

সরকারি বিদ্যালয়গুলি সাধারণ্যের হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক না হ'লেও সাধারণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতাসম্বন্ধীয় অনেকগুলি ব্যবস্থাই সরকারকর্তৃক অবলম্বিত হয়েছিল। উদার সাহায্যনীতি ও বর্ধিত শিক্ষার চাহিদা, উভয়ে মিলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রচুর প্রসার ঘটেছিল।

মিশনারিদের কার্যকলাপ :—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশনে প্রণীত ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার নীতির খুব বেশি কড়াকড়ি করা হয়নি এই যুগে এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'ধর্মীয়' বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও ছিল। অপরপক্ষে সরকারি অপসরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তাতে মিশনারিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্যলাভের আশা সমূলে বিনষ্ট হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্র থেকে আরম্ভ করে' ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশনের রিপোর্ট পর্যন্ত মিশনারিদের সুযোগসুবিধা ক্রমশঃ কমে আসছিল। তাঁদের অসন্তোষ ও আন্দোলনের এবং বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যোগদানের বিষয়ে বিভিন্ন

মত অবলম্বনের কথা আগে বর্ণিত হয়েছে। ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারি সভাসমিতিতে এই মতদ্বৈত চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল। অনেকে বলেছিলেন যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গেলে তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে —তাঁরা সরকারের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তমাত্রে পর্যবসিত হবেন। বিধর্মী ইন্সপেক্টরদের অধীনতাস্বীকার ও সরকার নির্বাচিত অনুপযুক্ত পুস্তকপাঠনের বাধ্য-বাধকতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সরকারি ব্যবস্থার সমালোচনা করে' বলা হয়েছিল যে তাতে পরীক্ষাপ্রস্তুতির প্রাধান্যের ফলে "তোতাপাখীর" মতো মুখস্থবিদ্যামাত্র শিক্ষা দেওয়া যায় ও খৃষ্টধর্মের শিক্ষার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়না। ছাত্রেরাও খৃষ্টধর্ম শিখবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলনা, ইংরেজিশিক্ষার খাতিরে সেটাকে সহ্য করতো মাত্র। ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার করলেই যে লোকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেনা সে-কথা মিশনারিরা বুঝতে পেরেছিলেন। এমন অনেক মিশনারি স্কুলকলেজ ছিল সেখানে হয়তো দশবৎসরের মধ্যে একজনও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। এইজন্য মিশনারিদের মধ্যে এমন এক দলের উদ্ভব হয়েছিল যাঁরা স্পষ্টতই বলেছিলেন যে অখৃষ্টান ছেলেপিলেদের জন্য স্কুলকলেজ চালানো মিশনারি কাজের অন্তর্গত নয়। আবার কেউ কেউ বলছিলেন যে শিক্ষার সংগে সংগে সবাইকে খৃষ্টধর্মের শিক্ষা দেওয়াই আসল কথা, দীক্ষিত করা নয়।

এই সব বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে মিশনারিরা সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মানের উচ্চতা বজায় রাখাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হবে এবং আদিবাসী ও পার্বত্য জাতি সমূহের মধ্যেই প্রচারকার্য বেশি করতে হবে। তাঁদের দিক থেকে এই নীতি যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ·৭১% খৃষ্টান ছিল, কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা বেড়ে ১·১৯% হয়। তাছাড়া মিশনারিরা নোতুন স্কুলকলেজ যে একেবারে খোলেননি তানয়, যেমন, ইন্দোরের 'ইণ্ডিয়ান ক্রশ্চান কলেজ' (১৮৮৪) শিয়ালকোটের 'মারি কলেজ' (১৮৮১), কানপুরের 'ক্রাইষ্ট চার্চ্ কলেজ' (১৮৬২) ও রাওয়ালপিণ্ডির 'গর্ডন কলেজ' (১৮৯৩) এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়।

কলেজী-শিক্ষা ঃ—

এদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে মিশনারি কাজের সংকোচন দুয়ে মিলে ভারতের সাধারণ্যের প্রচেষ্টার সহায়তা করে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সবগুলি মিশনারিদের হাতে ছিল, কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টা প্রধান স্থান অধিকার করে এবং তার পরের বিশ বৎসরে কলেজী শিক্ষাক্ষেত্রের ভারতীয় উদ্যোগ মিশনারিদের কার্যকলাপকে ছাড়িয়ে যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে পাঁচটি মাত্র ভারতীয় পরিচালনাধীন কলেজ ছিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সেখানে হ'ল ৪২টি। এই সময়ে সরকার কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে অপসৃত না হলেও একটিও নূতন সরকারি কলেজ খোলা হয়নি।

ভারতীয়গণের এই উদ্যম ও প্রচেষ্টার মূলে ছিল জাগ্রত সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধ। কলেজী শিক্ষার প্রথম সময়ে ইংরেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক রাখার প্রচলন থাকায় কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ইংরেজি-শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা তখন এত কম ছিল এবং তাঁরা এত সহজে অধিক অর্থকর পদসমূহে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেতেন যে কলেজীশিক্ষার সুযোগ্য ভারতীয় অধ্যাপক পাওয়া কঠিন হ'ত ; কিন্তু, ক্রমশ, জাগ্রত দেশাত্মবোধের ফলে আলিগড়ের "মোহামেডান এংলোওরিয়েন্টাল কলেজ", পুনার "ডেকান এডুকেশন সোসাইটি" প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এর স্যর আর, পি, পরাঞ্জপের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন।

কলেজী শিক্ষার প্রসারের পশ্চাতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার প্রভাবও কারণরূপে নিহিত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু তখন একদিকে উচ্চতর স্তরের বৃত্তিশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ছিলনা এবং অন্যদিকে ডিগ্রি ভিন্ন উচ্চতর সরকারি পদে নিযুক্ত হতে পারা যেতনা বলে' যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতো তাদের অধিকাংশ (কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০%) কলেজের শিক্ষা নেবার জন্য অগ্রসর হ'ত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 'এফিলিয়েটেড' কলেজের সংখ্যা ছিল আটষট্টি—উনপঞ্চাশটি প্রথম ও উনিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির। তারপরের দশকে (১৮৮২-৯১) ত্রিশটি প্রথম ও একত্রিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির এই একষট্টিটি নূতন কলেজ 'এফিলিয়েটেড' হয়েছিল। ১৮৯২ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশটি প্রথম ও চল্লিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির মিলে পঞ্চাশটি নূতন কলেজের 'এফিলিয়েশন' হয়। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগে সংশ্লিষ্ট ১৭৭টি কলেজের বৃটিশ ভারতে ১৩৬টি, ভারতীয় রাজ্যসমূহে ৩২টি, সিংহলে নয়টি ও বর্মায় দুইটি ছিল। বংগদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বর্মা, সিংহল, রাজপুতনা, মধ্যভারত

ও আসাম মিলিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭১টি কলেজ ছিল। তার মধ্যে ছ'টি কলেজ কলিকাতা ও এলাহাবাদ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত ছিল। কলিকাতায় ২০টি আর বংগদেশের বিভিন্ন অংশে ২৬টি কলেজ ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পঞ্চান্নটি, এলাহাবাদের অধীনে বত্রিশটি, পঞ্জাবের অধীনে ষোলটি ও বোম্বাইয়ের অধীনে এগারোটি কলেজ ছিল। বৃটিশ ভারতে অবস্থিত ১৩৬টি কলেজের মধ্যে ১১টি প্রধানত য়ুরোপীয়গণের ও ১২টি মেয়েদের জন্য ছিল: আর ২৩টি সরকারি, ছয়টি আধাসরকারি, ৫টি মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা পরিচালিত, ৩৭টি মিশনারি ও ৪২টি ভারতীয় সাধারণ্যচালিত ছিল।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে আর্টস্ কলেজগুলিতে ৬০৮৭ জন ছাত্র ছিল আর ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ১৭,৬৫১ জন। বি-এ পরীক্ষার জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৮৭ জন, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৫৭৩ জন আর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৮৯৮ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বংগদেশের ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ল-কলেজ থেকে ৭৭ জন ছাত্র বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে "অনারারি" ডিগ্রি দেবার বিশেষ আইন প্রণীত হয়।

কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল, যথা—চিপলংকার তিলক ও আগরকরের সম্মিলিত চেষ্টায় পুনার ফার্গুসন কলেজ (১৮৮০), স্যর স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির চেষ্টায় কলিকাতার রিপন (বর্তমানে স্বরেন্দ্রনাথ) কলেজ (১৮৮২), লাহোরে আর্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দের এংলোবেদিক কলেজ ও বেনারসে মিসেস এনি বেসান্টের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ (১৮৯৮—পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত)। নোতুন মিশনারি কলেজগুলির কথা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিশ বৎসরের মধ্যে দুটি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এর আইন মোটামুটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আইনের অনুরূপ হলেও কতকগুলি পার্থক্য ছিল। এর একটি প্রাচ্যবিদ্যার বিভাগ ছিল, তাতে কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয়ী স্তরে প্রাচ্যশিক্ষা, পরীক্ষা ও উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল, প্রাচ্য আইন এবং চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি ল-কলেজ ও কতকগুলি বিদ্যালয়েরও পরিচালনা করতো।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পুরাতন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রীতিতে স্থাপিত হলেও তদানীন্তন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদর্শে এতে কিছু কিছু অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল।

এই যুগের কলেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুত হলেও নির্দোষ ছিল না। নূতন নূতন কলেজগুলির মধ্যে (বিশেষত দ্বিতীয় শ্রেণির) অধিকাংশই উচ্চবিদ্যালয় থেকে উন্নীত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির পৃথক বাড়িঘর বা অধ্যাপকবৃন্দ কিছুই থাকতো না।

উচ্চশিক্ষার অতি দ্রুত প্রসারের জন্য তার মানের নিম্নতা ঘটা অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুতপ্রসারজনিত মানের নিম্নতাও কলেজের শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর লর্ড ল্যান্সডাউনের এক বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে সেই সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকার-সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল এবং একদিকে দ্রুত প্রসারের ফলে মানের অবনতি ও অন্যদিকে পরীক্ষার অতিরিক্ত প্রাধান্যের ফলে মুখস্থবিদ্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তারপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে পরীক্ষার শিক্ষাধীন হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার পরীক্ষাধীন হওয়াই তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় দোষ ছিল।

কলেজী পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় "বি-এস্‌সি" পরীক্ষার ব্যবস্থা করে কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি এবং ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে কেবল তেরোজন ছেলে ওই পরীক্ষা দিয়েছিল। 'ইংরেজিশিক্ষাই' কলেজীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বৃত্তিশিক্ষার মধ্যে আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই বিষয়গুলিতে উপাধিও দেওয়া হত।

এই সময় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও নানারকম অসুবিধা বোধ হতে থাকে। একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের এলাকা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কলেজের সংখ্যাধিক্য ও দূরত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারগ্রস্ত করতো, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সম্ভবপর হ'তনা। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ পরিচালনার অনেকগুলি অসুবিধাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের দোষের প্রতি নির্দেশ করছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার নীতির সাফল্যে এই বিশ বছরে

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে ৩৯১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২,১৪,০৭৭ জন ছাত্র পড়তো, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৫১২৪টি বিদ্যালয়ে ৫,৯০,১২৯ ছাত্র ছিল। এই হিসেব সর্বৈবভাবে নির্ভরযোগ্য না হলেও বিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার যে দ্বিগুণীকৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালের মতোই এই সময়ের মধ্যেও প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর হয়েছিল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ নিজস্ব সাহায্যনীতির প্রণয়ণ করেছিল। বাংলাদেশে বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন ও ক্ষমতানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সাহায্যদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল।

শিক্ষাকে কার্যকরী ও দ্বিধাবিভক্ত করার সম্পর্কে প্রত্যেক প্রদেশে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে "উচ্চতর" মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী বিশ বৎসরে মাত্র ২১০ জন ছাত্র ঐ ব্যবস্থার সুযোগ নেয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সাধারণ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাশাপাশি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্কুল-ফাইন্যাল' এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞানের ও একটি বাণিজ্যিক বিষয়সমূহের পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের 'এণ্ট্রান্সের' পাশাপাশি "স্কুল-ফাইনাল" পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কতকগুলি সরকারি চাকরির জন্য এই পরীক্ষা স্বীকৃত হওয়ায় এটি কিছু জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। বস্তুত, সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বোম্বাইয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় শাখা কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সরকারকর্তৃক 'এ-কোর্স', 'বি-কোর্স' ও 'সি-কোর্স' এই তিন ধারার পরিকল্পনা করা হয়। 'এ-কোর্স' ছিল সাধারণ জ্ঞানিক পরীক্ষার অর্থাৎ প্রচলিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পড়া। 'বি-কোর্স' যারা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্পশিক্ষার বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন হ'ত এবং 'বি-কোর্স' বিষয়গুলি যারা পড়তো তাদের উক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কম সময়ও লাগতো। 'সি-কোর্স' ছিল বাণিজ্যিক বা কমার্সের শিক্ষা, এতে অংক, 'আধুনিক' ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্যিক ভূগোল, অংকন ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়ানো হ'ত। ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত 'এণ্ট্রান্স পরীক্ষার কাঠামের মধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল।

অপর পক্ষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা

হয় যে মাধ্যমিক স্তরে পৃথক শিল্পশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উপযোগী শিল্পপরিণতি দেশের হয়নি বলে 'ড্রইং' বিজ্ঞানকে ওই স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করে তার কার্যকরতা সম্পাদনই কালের পক্ষে যথেষ্ট।

বস্তুত তখন বৃটিশ বাণিজ্যনীতির ফলে এদেশের পুরাতন শিল্প বিনষ্ট হয়েছিল এবং নূতন শিল্পের পরিণতি হয়নি বলে ওই কার্যিক শিক্ষাধারায় দেশের লোকের প্রয়োজন ছিল না। তখনও বাজারে ইংরেজিশিক্ষিত কেরাণির যথেষ্ট চাহিদা ছিল বলে' সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কেরাণিগিরির বৃত্তিশিক্ষার স্থান নিয়েছিল।

নূতন প্রচলিত কার্যিক শিক্ষাক্রমগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন বাংলা) এণ্ট্রান্স পরীক্ষারই বিশেষ বিষয়রূপে গৃহীত হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নতর পরীক্ষারূপে গণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের জন্য অগ্রাহ্য হওয়াতে লোকে তার মূল্য দিতে চায়নি। ছাত্রেরা 'এণ্ট্রান্স' পরীক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়তো এবং নিতান্ত নিরুপায় না হ'লে (বোম্বাই ভিন্ন) কার্যিক পরীক্ষার ধারপাশে ঘেঁষতো না। এইভাবে 'এণ্ট্রান্স' (পরে ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৎসরের পর বৎসরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারত যেখানে ৭৪২৯ জন ছাত্র 'এণ্ট্রান্স' পরীক্ষা দিয়েছিল, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ২২,৭৬৭ জন দেয় এবং অন্যান্য সামন্তরিক পরীক্ষা মাত্র ২০০০ জন দেয়—তার মধ্যে এক বোম্বাইয়েই ১২০০ জন দিয়েছিল। বাংলাদেশে এণ্ট্রান্স ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২১৪৪, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩০০০, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৬৩০৯ এবং তারপর থেকে এক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন কোনো বৎসরে ৭০০০ এর নিচে হয়নি। ওই সংখ্যাগুলি তখনকার দিনে অত্যন্ত বেশি হ'লেও এ-যুগের সংকীর্ণ বিভক্ত বাংলার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪৫০০০ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭২০০০ আর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের লক্ষাধিকের সংগে তুলনা করলে বর্তমানের সংগে প্রভেদ অনেকাংশে অনুভূত হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকশিক্ষণের ব্যবস্থা কিছুদূর এগিয়েছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দুটির স্থলে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দাপেট, রাজামন্ত্রী, কার্সিয়ং, এলাহাবাদ, লাহোর ও জব্বলপুরে সর্বসমেত ছয়টি "ট্রেনিং কলেজ" হয়েছিল এবং শিক্ষকশিক্ষণের কতকগুলি "স্কুলও" ছিল। এইভাবে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষকদের "সার্টিফিকেট" দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

শিক্ষাকমিশনে মাধ্যমিক স্তরে পুরোপুরি মাতৃভাষামাধ্যম শিক্ষার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলার মাধ্যমরূপে ব্যবহারের

বিকল্প দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মধ্য স্তরে বাংলাভাষামাধ্যম শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চস্তর ইংরেজিমাধ্যম ছিল। তখন কলেজে পড়ার আর ইংরেজিশিক্ষিত কেরাণি হওয়ার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান চাহিদা ছিল বলে ইংরেজি শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রধান উদ্দেশ্যরূপে দাঁড়িয়ে যায়। এই সব কারণে সাধারণভাবে মাতৃভাষার অবহেলা ঘটতে থাকে এবং অনেক সময়ে মাতৃভাষা ভালো করে শেখাবার আগে ইংরেজি ভাষা শুধু শেখানো হ'ত না ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাও দেওয়া হ'ত।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগে প্রদেশে প্রদেশে কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় ঐক্য ছিল। সব স্থানেই শিশু বা 'প্রস্তুতি' হিসেবে একটি বা দুটি শ্রেণি থাকতো, তারপর চার বা পাঁচ শ্রেণি প্রাথমিক, দুই তিন শ্রেণি মধ্য আর তিন চার শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক। বাংলাদেশে দুটি শিশু শ্রেণি, চারটি প্রাথমিক শ্রেণি, দুই মধ্য শ্রেণি ও চারটি উচ্চ শ্রেণি থাকতো। শিশু শ্রেণি দুইটিকে পৃথক গণনা করা হ'ত। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিগুলিকে নিম্নতম শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে গণনা করা হ'ত আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চতম থেকে, অর্থাৎ প্রাথামিক বিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন শ্রেণি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণি "প্রথম" শ্রেণি হ'ত। মধ্য শ্রেণি দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট হ'লে পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট হ'লে ষষ্ঠ ও পঞ্চমরূপে গণ্য হ'ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শ্রেণিগুলিরও সংখ্যাগণনা উল্টো যেত।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের উদ্যোগিতার ব্যাপক প্রসার এই সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসের একটি প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয়। এতে শিক্ষার প্রসার প্রচুরভাবে বৃদ্ধি পেলেও নূতন উদ্যোগিগণের অনভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই অনভিজ্ঞতার জন্যই অনেক সময়ে ভারতীয় পরিচালিত স্কুলগুলি যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হ ত না।

ওই "প্রাইভেট" স্কুলগুলির মধ্যে কতকগুলি সরকারি সাহায্য পেত আর কতকগুলি সাহায্যের পরোয়া না রেখে "ফিয়ের" টাকার ওপর নির্ভর করতো। এগুলির ওপর সরকারি আইনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতো না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের "এফিলিয়েশনের" নিয়ম শিথিল হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলি অনেক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত শিক্ষার আদর্শকে নিচু করে দিচ্ছিল। শিক্ষার বিস্তার বনাম মানের তর্ক এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়।

মাতৃভাষার সাধারণ অবহেলা ও অস্বীকৃতি যে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্য একটি দোষ ছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

সংকীর্ণতা ও অকার্যকারিতা এর অপর দোষ ছিল। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং সামন্তরিক ব্যবস্থার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিফল হয়। দেশের লোকের ডিগ্রির মোহ, কর্মক্ষেত্রে কেরাণিগিরির স্থযোগ, শিল্পকর্মে নিয়োগের পথের অভাব এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার তুলনায় নূতন শাখার নিম্নতর মর্যাদা প্রভৃতি মিলিয়ে কি করে' এই অসাফল্যের কারণস্বরূপ হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবিত ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা কোনো স্কুলকলেজেই করা হয়নি। তাতে সম্ভবত ভালই হয়েছিল, কেননা নীতি ও নাগরিকতার পুস্তকপাঠে মানুষ কতদূর চরিত্রবান স্থনাগরিকরূপে পড়ে উঠতে পারে তাতে সন্দেহ আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা :—

ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হস্তান্তরকরণের নির্দেশটি সর্বাগ্রে গৃহীত হয়।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড রিপন ইংলণ্ডে "কাউন্টি কাউন্সিল" ও "রুর‍্যাল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের" আদর্শে এদেশে "মিউনিসিপ্যাল" ও "লোকাল" স্বায়ত্তশাসনের আইনের প্রণয়ন করেন। তাঁর মত ছিল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের যন্ত্রমাত্র না হয়ে জনশিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হবে এবং যথেষ্ট স্থযোগস্থবিধা ও অর্থ পেলে ও সরকার কর্তৃক সযত্নে প্রতিপ্রালিত হ'লে ওগুলির সাফল্য স্থনিশ্চিত। কিন্তু বিদেশী শাসনের আওতায় লর্ড রিপনের কল্পিত ওই জিনিষগুলির অভাবই কালক্রমে স্বায়ত্তশাসন ও তৎসম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়েছিল।

আইনগুলির প্রণয়নের সংগে ভারতের নানা স্থানে লোকাল বোর্ড বা কাউন্সিল ও ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ড বা কমিটি গঠিত হ'তে লাগলো। হাণ্টার কমিশনের নির্দেশানুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এদের ইচ্ছাধীন ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য বলে অবধারিত হল। নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার আগে বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিগুলি উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে হাত দেবে না বলে' স্থির হ'ল এবং এদের পরিচালনা,

আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সরকারি সাহায্য প্রভৃতির নীতি প্রণীত হ'ল। অর্থাৎ, কমিশন প্রস্তাবিত অধিকাংশ কাজই কাগজে কলমে করা হ'ল।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যদান করতেন। বোম্বাইসরকার আঞ্চলিক শাসনপ্রতিষ্ঠানের স্কুলভাণ্ডারে তাদের প্রদত্ত অর্থের অর্ধানুপাতে দান করতেন। মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে প্রাদেশিক কোষের ৫% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রযুক্ত হ'ত। বাংলা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব পুরোপুরি নিয়েছিলেন। পঞ্জাবসরকার শিক্ষকশিক্ষণ ও বিদ্যালয়পরিদর্শনের ব্যয় বহন করতেন। আসাম সরকারের নিয়ম হয়েছিল যে সমগ্র শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থের বৃদ্ধির সমান অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থ বৃদ্ধি পাবে।

এই হস্তান্তরকরণ সমস্ত প্রদেশে কার্যক্ষেত্রে সমানভাবে করা হয়নি এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকশিক্ষণের প্রায় সবগুলি স্কুল সরকারের পরিচালনাধীন থেকে গেছিল। যে-সব স্থানে স্থানীয় প্রচেষ্টা বা স্বায়ত্তশাসন পরিণতি পেতে পারেনি, বিশেষভাবে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সরকার নূতন নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বিশেষ আইনে নির্দিষ্ট কার্যকর পাঠক্রম ও ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা ও সাহায্যনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান একেবারে বন্ধ না হলেও ছয়মাস ভাল করে কাজ করার পূর্বে কোনো স্কুলকে পুরস্কারের যোগ্য বলে গণ্য করা হবে না এই ঠিক হ'ল এবং নিয়মিত 'রেজিষ্টার' রাখা আবশ্যিক হ'ল।

এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটেনি, যথা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ জিলাবোর্ডের পরিচালিত ১৩,৩১৮ স্কুলে ৫,৬৪,৮০২ ছাত্র আর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পরিচালিত ৮১৩ স্কুলে ৭৯,৭৬৩ ছাত্র পড়তো। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জিলাবোর্ডের পরিচালিত ১৪,৫৩১ স্কুলে ৬,৩২৪,৪৩ ছাত্র ও মিউনিসিপাল বোর্ডের পরিচালিত ১০৪১ স্কুলে ১০১,২৯১ ছাত্র পড়তো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি (৫৩.%) ছাত্র তখন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়তো।

১৯০১—০২ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল বাংলাদেশে আর তারপর মাদ্রাজে। অন্যান্য প্রদেশে 'প্রাইভেট' প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব কমই ছিল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কতকগুলি ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এদেশে ছিল, কিন্তু ওই সময়ের পর থেকে সেগুলি উঠে যেতে থাকে এবং উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে ভিন্ন ইংরেজিমাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

ভারতীয় শিক্ষকমিশনের রিপোর্টে দেশের পাঠশালাগুলির সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাব ছিল। কমিশনের নির্দেশানুসারে এগুলিতে পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে সাহায্য-দানের নীতি চলতে থাকে এবং পূর্বোল্লিখিত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী এগুলির কিছু উন্নতিও সাধিত হয়। এই উন্নতি সর্বক্ষেত্রে সমান হয়নি, কোনো কোনো স্থলে নিয়মের আধিক্য পাঠশালাপ্রদত্ত শিক্ষার প্রসারের পথে বাধ্যস্বরূপ হয়েছিল।

বাংলাদেশে পাঠশালাগুলি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বোর্ডস্কুলের প্রাধান্য ঘটছিল। বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে দেশী পাঠশালার সমস্যাটি মোটামুটি শেষ হয়ে গেছিল বলা যায়। যেগুলি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অংগীভূত হয়েছিল সেগুলি তাদের দেশী প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছিল। যেগুলি ব্যবস্থার বাইরে ছিল সেগুলি বহুদিনের অবহেলার মধ্যে আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। বৃটিশ রাজত্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের ধ্বংস, মধ্যবিত্তদের শহরাভিমুখিতা, গ্রাম্যশিল্পাদির বিনষ্টি প্রভৃতির কারণে গ্রাম্য জীবন যেমন বিপর্যস্ত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছিল সেই অবস্থায় এদের অন্য কোনো পরিণতির সম্ভাবনা ছিল না।

কমিশনের প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে যে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ ছিল তা পালিত হয়নি,—এই বিশ বছরে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর ঘটেছিল। ১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল ২০,০০,০০০, ১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেড়েছিল ৬,৬০,০০০ আর ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাড়ার পরিবর্তে কমেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬.৭৭ টাকা থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ১৬.৯২ লক্ষ টাকা মাত্র হয়েছিল, অর্থাৎ বছরে হাজার টাকা হিসাবেও ব্যয়বৃদ্ধি হয়নি। আঞ্চলিক সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত টাকা ১৮৮১-৮২ র ২৪.৯ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৪৬.১ লক্ষ টাকা হয়েছিল। এই বৃদ্ধি প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর ছিল। এইজন্য বলা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসারের পথের বাধার মধ্যে প্রধান ছিল অর্থাভাব। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আইনের কড়াকড়ির ফলেও কিছু কিছু নিকৃষ্ট স্কুল বন্ধ হয়ে গেছিল।

তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের ওপর নির্ভরতার সরকারি নীতিতে শিক্ষাপ্রসারের একটা সীমা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় বলে কোনো দেশেই এর চাহিদা সার্বজনীন হতে পারে না। এ-দেশে জনসাধারণের শিক্ষাসচেতন অংশের চাহিদা এই সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু অচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে নোতুন চাহিদা জাগিয়ে তোলা যায়নি বলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার আর বাড়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাবনা অনেক বেশি ব্যাপক হ'লেও এ-ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মাধ্যমিক শিক্ষার সংগে অনুপাত রেখে অগ্রসর হতে পারেনি।

স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের অসাফল্য ও অনুৎসাহ যে-অংশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে ব্যর্থতা এনেছিল তার উল্লেখ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। বাংলাদেশপ্রমুখ কোনো কোনো অঞ্চলে শিক্ষাকরগ্রহণের অসামর্থ্যও শিক্ষাপ্রসারের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হ'লে সার্বজনীন হতে পারে না এই সত্য এই সময়ে প্রগতিশীল দেশসমূহে স্বীকৃত হয়েছিল। অথচ কমিশনের প্রস্তাবে বিদ্যালয়ে কিছু কিছু অবৈতনিক ছাত্র নেওয়ার নির্দেশ থাকলেও উপরিউক্ত বিষয়ের কোনো প্রস্তাব ছিল না।

শিক্ষক শিক্ষণ :—

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নর্মাল স্কুল ট্রেনিং কলেজে পরিণত হয়। বাংলাদেশে কার্সিয়ংএর ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি ট্রেনিং কলেজ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে মাত্র তিন বৎসর কাজের পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উঠে যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষণের লাইসেন্স পরীক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে।

শিক্ষা বিভাগ :—

এই সময়ের মধ্যে "এডুকেশন সার্ভিস" গঠিত হয়েছিল! শিক্ষাবিভাগের চাকুরেদের মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :—

১। সর্বভারতীয়, বা Indian Education Service. অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ইন্সপেক্টর প্রভৃতি অফিসারেরা এই শ্রেণিতে স্থাপিত হতেন। এঁরা পাঁচশত টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করতেন এবং প্রধানত ইংলণ্ড থেকে নিযুক্ত হতেন।

২। প্রাদেশিক, বা Provincial Education Service. এই শ্রেণিতে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী ইন্সপেক্টর, কোনো কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রভৃতি স্থাপিত হ'তেন। বিভাগীয় অধিকর্তার উপদেশানুযায়ী প্রাদেশিক সরকার-দ্বারা এঁদের নিয়োগ হ'ত।

৩। নিম্নপদীয় বা Sub-ordinate Service. নিম্নতর পদের কর্মচারীরা এই পদে স্থাপিত হ'তেন।

প্রথম দুই শ্রেণির চাকরির কথা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন স্থাপিত হ'লে তার দ্বারা প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার কর্তৃক সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম দুই শাখা সমমূল্যরূপে কল্পিত হ'লেও কর্মক্ষেত্রে আই-ই-এস শ্রেণির চাকরির শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওই শ্রেণিতে সর্বদা য়ুরোপীয় অফিসারদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা হয়।

লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংস্কার

(১৮৯৯—১৯০৫)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তাঁর সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও কর্তৃত্বপ্রিয় মেজাজ ও ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য ভারতবাসীরা তাঁকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছিল এবং বংগব্যবচ্ছেদের দ্বারা তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ঝড় তুলেছিলেন তাতে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের তরী বান্‌চাল হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ জাতীয় চেতনার জাগরণের কাল ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রেও জাতীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর্যসমাজের স্থাপিত লাহোরের 'দয়ানন্দ এংলোবেদিক কলেজ', স্বামী শ্রদ্ধানন্দের স্থাপিত হরিদ্বারের 'গুরুকুল', মিসেস এনি বেসান্টের স্থাপিত বেনারসের 'সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ' ও আরো কয়েক বৎসর পরেকার রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম,—সব ওই নোতুন ভাবেরই পরিচায়ক। এগুলি জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষা দিত এবং এগুলিতে মাতৃভাষা সম্মান পেত। এই নোতুন ভাবধারার গৌরব লর্ড কার্জন রক্ষা করতে পারেন নি।

ইনি ভারতে এসেই শিক্ষাসম্বন্ধীয় তদন্তের উদ্যোগ করেন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিমলায় শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সরকারি অফিসর ভিন্ন মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু কোনো ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌কে ডাকা হয়নি বলে ভারতবাসীরা প্রথম থেকেই একে সাম্রাজ্যবাদী মত্‌লবের আলোচনাসভা বলে' ধরে নিয়েছিল। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিভাগীয় কর্তাদের সম্মতি লাভ করলে পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চের সরকারি পত্রে নিবদ্ধ হয়ে সরকারি নির্দেশরূপে প্রচারিত হয়। এ-ছাড়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কমিশনের নিয়োগ করেছিলেন ও তার রিপোর্ট অনুসারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নূতন আইনের প্রণয়ন হয়েছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্র ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইনকে সাময়িক শিক্ষাক্ষেত্রের দুটি প্রধান দলিলরূপে গণ্য করা হয় বলে' প্রথমে সে দুটির আলোচনার পর অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করা হবে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পত্র :—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সরকারি নীতির মূল কথা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিত স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এই পত্রে অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে।

পত্রের প্রথমে বৃটিশ শাসনকালে শিক্ষাপরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা ও সমালোচনা করা হয়েছে। তখন দেশের প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই বিদ্যালয়ের অভাব ছিল এবং চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিই অজ্ঞানান্ধকারে বর্ধিত হচ্ছিল। পত্ররচনার অব্যবহিতপূর্বের বিশবৎসরকালের মধ্যে কিছু উন্নতি হ'লেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা দোষপূর্ণ ছিল। শিক্ষা দেশবাসীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি, পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সাহিত্যিক ছিল এবং পরীক্ষার ওপর অত্যধিক ঝোঁক থাকায় বুদ্ধির পরিবর্তে স্মৃতিশক্তির উন্মেষ হচ্ছিল। লোকে সরকারি চাকরির লোভে উচ্চশিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হচ্ছিল এবং দোষপূর্ণ, অকাযিক শিক্ষলাভের ফলে যারা সরকারি চাকরিতে বঞ্চিত হচ্ছিল তারা অন্যত্র জীবিকার্জনের জন্যও অনুপযোগী বলে' প্রমাণিত হচ্ছিল। পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ ছিলনা এবং ইংরেজিশিক্ষার মোহে ভারতীয় ভাষাসমূহের অবহেলা ঘটছিল।

তারপর শিক্ষাসংস্কারের কতকগুলি মূলনীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—প্রথমতঃ সরকারি অপসরণনীতির কার্যকারিতা সত্ত্বেও শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ও ও শাখায় আদর্শস্থাপনের জন্য কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পরিদর্শনব্যবস্থার দ্বারা সাধারণপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হবে। পরিদর্শনের কড়াকড়ি শুধু বৃদ্ধি পাবেনা,—পরিদর্শকেরা শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও পরামর্শ দেবেন।

তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বস্তরের শিক্ষায় বহিঃপরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

শেষে শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত জনসাধারণের উপযোগী শিক্ষারূপে বর্ণনা করে' বলা হয়েছে যে এর বিস্তার করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। দেশের অর্থনৈতিক পরিণতির ফলে কৃষক সমাজকে আধুনিক জীবনযাত্রার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাব-

রচনার কালে বৃটিশভারতের জনসংখ্যা চল্লিশ কোটি ছিল, ধরা হয়েছে যে শতকরা পনেরো জন হিসেবে আশীলক্ষ ছেলে বিদ্যালয়যাত্রার বয়সী, কিন্তু ওই সময়ে ওই সংখ্যার মাত্র একষষ্ঠাংশের কিছু বেশি ছেলে প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগ পাচ্ছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে পার্থক্য ছিল, যথা, বিদ্যালয়বয়সী ছেলেদের মধ্যে পঞ্জাবে ৮%, যুক্তপ্রদেশে ৯%, বোম্বাইয়ে ২২% ও বাংলায় ২৩% ছেলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করছিল। মেয়েদের মধ্যে হাজারে মাত্র সাতজন প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মাধ্যমিক শিক্ষার অনুপাতে কম ছিল এবং তারজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হচ্ছিল না। ১৮৮৬-৮৭ থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে অর্থবৃদ্ধির নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হয়েছিল :—

সাল	প্রাদেশিক ভাণ্ডার থেকে দত্ত।	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ভাণ্ডার থেকে দত্ত	মোট।
১৮৮৬-৮৭	১৬,০০২৩৯ +	২৬,০৭,৬২৪,	= ৪২,০৭,৮৬৩
১৮৯১-৯২	১৩,৪৩,৩৪৩ +	৩৫.৮৬,২০৮	= ৪৯,২৯,৫৫১
১৯০১-০২	১৬,৯২,৫১৪ +	৪৬,১০,৩৮৭	= ৬৩,০২,৯০১

আরো অর্থ ও প্রচেষ্টার প্রয়োগে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :—

প্রথমতঃ—অর্থসম্বন্ধীয় নীতির প্রণয়ণ, যথা—প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাখাতে প্রদত্ত প্রাদেশিক ভাণ্ডারের অধিকাংশ অর্থ পাবে এবং স্বায়ত্তশাসনভাণ্ডারের প্রদত্ত অর্থ প্রাথমিক ভিন্ন অন্য কোনোপ্রকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবেনা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার বাজেট তৈরী করে' আঞ্চলিক পরিদর্শকের মারফতে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার দ্বারা অনুমোদিত করিয়ে নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ—পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের নীতি বর্জিত হবে।

তৃতীয়তঃ—সহজতর ও অধিক কার্যিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগে গ্রাম্যপ্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত পাঠ্যক্রমের ব্যবহারে শিক্ষার উপযোগিতা সাধিত হবে।

চতুর্থতঃ—শিক্ষণশিক্ষা ও বেতনবৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষকদের মানোন্নয়ন করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় বিস্তারের উল্লেখ করে' বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী বিশ বছরে ওই শিক্ষা সহসা বহুগুণিত হওয়ার ফলে অনুপযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেইজন্য "প্রাইভেট" স্কুলগুলিকে "স্বীকৃত" করে' নেওয়ার নিয়মের কড়াকড়ি আবশ্যক।

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের আত্যন্তিক সংকীর্ণতার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে "স্কুল-ফাইনাল" পরীক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা এর বৈচিত্র্য সাধনের দরকার।

শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়ে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির স্থান থাকবে না এবং মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি শেখানো হবেনা। ১৩ বছর বয়স হয়ে গেলে পর, অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরের প্রথম থেকে, ছাত্রেরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে কিন্তু তখনও যাতে মাতৃভাষার অবহেলা ও অবনতি না ঘটে সেইজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যার আলোচনার ভার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের ওপর দেওয়া হ'লেও এই পত্রে সে বিষয়ে দুয়েকটি মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রথমত,—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ কাজ করছিল বলে' সেগুলির নিন্দা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত,—বলা হয়েছে যে 'সেনেট' গুলির আয়তন বড় হওয়ায় তাদের কার্যকারিতার হানি ঘটেছে।

তৃতীয়ত,—'সিণ্ডিকেটে'র ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে' দেওয়ার প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থত,—'এফিলিয়েটেড' কলেজগুলির পরিদর্শনব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষার অন্যান্য শাখার মধ্যে স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে সরল ও কায়িক শিল্পশিক্ষা, ভারতীয় প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চমানের বাণিজ্যিক শিক্ষা, কৃষি ও বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং ভারতীয় কলাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় শিল্পকলার উন্নয়নের প্রস্তাব এই পত্রে করা হয়েছে। অধিকসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সুশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার যথোচিত উন্নতি হয়নি বলে' মেয়েদের জন্য অধিকসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও শিক্ষয়িত্রীশিক্ষণপ্রতিষ্ঠানের স্থাপন এবং বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকার সংখ্যাবৃদ্ধির কথা লেখা হয়েছে।

লর্ড কার্জনের প্রণীত এই পত্রের মধ্যে অনেকগুলি প্রশংসনীয় বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনাটিকে সুযোগ্য এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আশ্চর্যজনক বলে' মনে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে নূতন কথাগুলি বলা হয়েছিল তার অনেকাংশ বাঞ্ছনীয় হ'লেও বর্তমান যুগ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থার নির্দেশ,

পরিদর্শনের কড়াকড়ির ও শিক্ষকসমাজের উন্নতির দ্বারা শিক্ষার মানোন্নয়নের ও বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তাবগুলিকে মূল্যবান বলে' গণ্য করা যায়।

পত্রটির মন্দ দিকের মধ্যে প্রধান হ'ল মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির স্বীকার এবং এবং প্রাচ্যবিদ্যালোচনার অনুল্লেখ।

ভারতীয় বিদ্যালয় কমিশন ঃ—

লর্ড কার্জনের আরেকটি কাজ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের ব্যবস্থা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কমিশনের নিয়োগ করেন। এই কমিশনে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামী এই দুইজন মাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ী স্তরের শিক্ষা এই কমিশনের আলোচ্য,—মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো সুপারিশ করার অধিকার একে দেওয়া হয়নি। এইদিক থেকে এর প্রস্তাবসমূহ অপূর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল।

কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান, শাসনব্যবস্থা ও কার্যকলাপের উন্নতির উপায়ের আলোচনা এবং মানোন্নয়নের প্রস্তাব সপার্ষদ বড়লাটের নিকট পেশ করা।

এর সামনে দুটি প্রধান প্রশ্ন ছিল,—কি ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের পক্ষে উপযোগী তার নির্ণয় এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে' সেইরূপে পরিণত করা যায় তার উপায়নির্দেশ।

ওই বছরের জুন মাসে কমিশন তার রিপোর্ট দেয়, রিপোর্টের সংগে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক বিরোধী মন্তব্য ছিল।

কমিশনের প্রস্তাবগুলি প্রধানত শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারসম্বন্ধীয় ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হয়, তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে' কমিশনের মন্তব্যগুলি করা হয়েছিল।

সেই সময়ে ব্যাংগালোর, তিরুচিনাপল্লী, নাগপুর, ত্রিবান্দ্রম, রেংগুন, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল। কমিশন অভিমত দেন যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী সময় হয়নি। বিশুদ্ধভাবে শিক্ষণরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা কমিশনের রিপোর্টে করা হয়েছে।

কমিশনের প্রস্তাবগুলিকে প্রধানত দুই অংশে ভাগ করা যায় ঃ— ১। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতার বৃদ্ধি ও ২। তৎপ্রদত্ত শিক্ষার মানোন্নয়ন।

শাসনব্যবস্থার পূনর্গঠনের দিক দিয়ে প্রধান প্রস্তাব ছিল সেনেটের আয়তন

হ্রাস, সভ্যদের সভ্যপদধারণের কাল সীমাবদ্ধ করা, প্রতি বৎসর "ফেলো"দের মধ্যে একপঞ্চমাংশের পদত্যাগের ব্যবস্থা করা, অধ্যাপক ও বড় বড় পণ্ডিতদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নয় থেকে পোনেরোজন সভ্যসম্বলিত সিণ্ডিকেটকে আইনগত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকা সুনির্দিষ্ট করে' দেওয়ার প্রস্তাব।

তাছাড়া এফিলিয়েশনের নিয়মের কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেওয়া ও কলেজগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। নোতুন কলেজের এফিলিয়েশনের পূর্বে এমনভাবে পরিদর্শন করতে হবে যাতে নিম্নমান কলেজের আবেদন অগ্রাহ্য হ'তে পারে। প্রত্যেক কলেজের যাতে উপযুক্ত গৃহ, আসবাব, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার প্রভৃতি থাকে তা পরিদর্শকদের দেখে নিতে হবে। আঞ্চলিক অবস্থার বিচার দ্বারা প্রত্যেক কলেজের ছাত্রদের দেয় বেতনের নিম্নতর মান সিণ্ডিকেটকর্তৃক নির্দিষ্ট করে' দেওয়া হবে। দ্বিতীয় শ্রেণির (আই-এ) কলেজগুলিকে হয় প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হ'তে হবে নয়তো বিদ্যালয়ে পুনঃপরিণত হতে হবে।

শিক্ষণের উন্নতির সম্বন্ধে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে সেগুলিকে তিন অংশে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ,—ছাত্রেরা যে অবস্থায় বাস ও লেখাপড়া করে সেদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে, যথা,—প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজির পাঠ্যপুস্তক থাকবে না, এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজির সংগে মাতৃভাষা বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোনো একটি প্রাচীন ভাষা পড়তে হবে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান উঁচু করে' "ইণ্টারমিডিয়েট" পরীক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, বি-এ পরীক্ষা তিন বছরে দিতে হবে, "প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট"দের পরীক্ষার অনুমতির নিয়ম কঠিনতর হবে, পরীক্ষা ও ডিগ্রির নাম ও মানের সর্বভারতীয় ঐক্য থাকবে।

তৃতীয়তঃ—সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক অধ্যাপনার ভারগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিগ্রি-পরীক্ষার পূর্ববর্তী স্তরের শিক্ষা কলেজগুলির হাতে থাকবে আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেবে স্নাতকোত্তর স্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক লাইব্রেরি, লেবরেটরি ও উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

সমালোচনা :—

উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলির আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেগুলি অত্যন্ত

সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দেশের লোক যেখানে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও গবেষণার নোতুন নোতুন সুযোগ কামনা করছিল সেখানে কেবল শাসন ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারের ওই প্রস্তাবগুলি তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি তখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধীয় আদর্শের যে পরিবর্তন হচ্ছিল তার কোনো আভাষ ওই প্রস্তাবগুলির মধ্যে দেখা দেয়নি, বরংচ পুরোনো ব্যবস্থাকেই অধিকতর শক্তিশালী করবার চেষ্টা হয়েছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিমলায় অনুষ্ঠিত সরকারি সভার পর থেকে ভারতবাসীদের মন লর্ড কার্জনের ওপর সন্দিগ্ধ হয়েছিল, তারপর কমিশনের সভ্যহিসেবে দুইজনমাত্র ভারতবাসীকে এবং তাও অত্যন্ত শেষ মুহূর্তে নেওয়ায় দেশের লোকের বিরক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপরন্তু কমিশন তার তদন্তের কাজ সেরেছিল আত্যন্তিক তাড়াহুড়োর মধ্যে এবং গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ প্রকাশ না করে' প্রস্তাবগুলি মাত্র মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব কারণে এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী মন্তব্যের ফলে ভারতীয় জনমত কমিশনের প্রস্তাবের বিরোধী হয়ে পড়েছিল।

অপরপক্ষে, কমিশন যে তার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোনো ভাল কথা বলেনি তা নয়। ছাত্রগণের আবাসস্থান ও পারিপার্শ্বিকের উন্নতির কথা, মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণতাসাধন ও তিন বৎসরের ডিগ্রির কথা, আজ পর্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে' স্বীকৃত হয়ে এলেও কাজে পরিণত করা যায়নি। তাছাড়া শাসনব্যবস্থা তখন এত শিথিল ছিল যে কিছুটা কড়াকড়ি নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ঃ—

দেশের লোকের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ কলিকাতা "ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্লেচারে" ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কমিশনের রিপোর্টের অনেকগুলি প্রস্তাবই এই আইনের অংগীভূত হয়েছিল।

এই আইনের প্রথম কাজ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তব্যের পরিসর বাড়িয়ে দেওয়া। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইনে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, তজ্জন্য অধ্যাপকনিয়োগ, শিক্ষাবিষয়ক দানগ্রহণ ও তার ব্যবস্থাপন, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, মিউজিয়ম প্রভৃতির স্থাপন ও পরিচালন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রগণের ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিধিবিধানের প্রণয়ন প্রভৃতির ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হ'ল।

আইনের দ্বিতীয় কাজ হ'ল সেনেটের সংস্কার। সেনেটের আয়তন নির্দিষ্ট না থাকায় ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছিল এবং সেই কারণেও অনুপযুক্ত লোকের সভ্যপদে মনোনয়নে কার্যক্ষমতার হানি ঘটছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ১৮১ জন, বোম্বাইয়ের ২৯৬ জন, মাদ্রাজের ১৯৮ জন, পাঞ্জাবের ১৩৬ জন ও এলাহাবাদের ১১২ জন সভ্য ছিলেন। এই অবস্থায় দূরীকরণের জন্য এই আইনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেওয়া হ'ল :—

১। সেনেটের সভ্য সংখ্যা একশোর বেশি ও পঞ্চাশের কম হবে না বলে' নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

২। বিশুদ্ধ মনোনয়নব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু নির্বাচনের প্রবর্তন করা হ'ল। বস্তুত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে দুই তিন জন করে সভ্যের নির্বাচন করা হয়ে আসছিল এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ২১, বোম্বাইয়ে ১৭ ও মাদ্রাজে ১৬ জন নির্বাচিত ফেলো ছিলেন। নূতন আইন ঐ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিতি দিল। ফেলোরূপে নির্বাচিত হবার ও ফেলোর নির্বাচন করবার অধিকার এম-এ বা সমপদীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি বা দশ বিশ বছরের পুরোনো গ্রাজুয়েটদের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হ'ল। নির্বাচিত ফেলোর সংখ্যা তিনটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ ও দু'টি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন করে' নির্দিষ্ট হ'ল। ২০ জনের মধ্যে দশজনের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা আর দশজনের ফ্যাকাল্টিগুলির দ্বারা নির্বাচনের এবং ১৫ জনের মধ্যে যথাক্রমে পাঁচজন ও দশজনের গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টিদ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'ল।

আইনের তৃতীয় কাজ হ'ল সিণ্ডিকেটের আইনগত প্রতিষ্ঠা এবং তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থান পাওয়ার সুযোগদান। ভাইস্‌চান্সেলরের সভাপতিত্বে ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্সট্রাকশন ও সাত থেকে ১৫ জনের মধ্যে পদানুসারী বা সাধারণ ফেলোকে নিয়ে সিণ্ডিকেট গঠিত হবে। তারমধ্যে পূর্ণ সভ্যসংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে একের অপেক্ষা বেশি নয় এমন সংখ্যক অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক স্থান পাবেন।

আইনের চতুর্থ কাজ হ'ল কলেজগুলির পরিদর্শন ও এফিলিয়েশনের কঠিনতর ব্যবস্থা করা। এর একটি ক্রমের নির্দেশ করা হয়েছে, যথা,—

১। কলেজের অধ্যাপিত বিষয়গুলির সুযোগ্য শিক্ষক, উপযোগী গৃহ ও যে সব ছাত্র অভিভাবকদের সংগে বাস করবে না তাদের বাসের এবং সকল ছাত্রের শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা, লাইব্রেরি, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান পড়ানো

হ'লে গবেষণাগার ও মিউজিয়ম, কলেজের বা ছাত্রাবাসের নিকট অধ্যক্ষ ও কিছুসংখ্যক অধ্যাপকের বাসস্থান ও কলেজের স্থায়িত্বের উপযোগী আর্থিক নিশ্চিতি থাকলে এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাদ্বারা আঞ্চলিক শিক্ষাব্যবস্থার বা ছাত্র-শৃংখলার হানি ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে ও কলেজের নির্ধারিত 'ফি' অন্যান্য কলেজের সংগে অবাঞ্ছনীয়রূপে প্রতিযোগিতামূলক না হ'লে তবে নূতন কলেজকে এফিলিয়েশনের উপযোগী বলে' গ্রহণ করা হবে।

২। কলেজের কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের সম্পূর্ণ বিবৃতি দিয়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করবেন।

৩। যথোচিত পরিদর্শনের পর আবেদনপত্র সেনেট ও সিণ্ডিকেটের নিকট স্থাপিত হবে।

৪। এফিলিয়েশন পাওয়া গেল কিনা এবং কোন বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য পাওয়া গেল সে কথা কলেজকে পত্রদ্বারা জানানো হবে এবং এফিলিয়েশন না পাওয়া গেলে তার কারণ জানাতে হবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে তাদের কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিবৃতি নিয়মিতভাবে সিণ্ডিকেটের কাছে পেশ করতে হবে এবং যে-কোনো পরিবর্তন তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে।

৬। কলেজগুলিকে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে হ'লে নিয়মিত পরিদর্শনের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। পরিদর্শকের দোষদর্শনে সেনেট সংশোধনের আদেশ দেবে ও কালনির্দেশ করবে। নির্দিষ্টকালের মধ্যে সংশোধন না হ'লে এফিলিয়েশন খারিজ করা যেতে পারবে। অপরপক্ষে পরিদর্শকের মন্তব্যের বিষয়ে সিণ্ডিকেটের কাছে জবাবদিহি করবার অধিকার কলেজের কর্তৃপক্ষের থাকবে।

৭। যে-সব বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় সেগুলির জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করার এবং তার ফলে সরকার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বৈতশাসনে যাতে সংঘর্ষের উদ্ভব না হয় তার জন্য নিয়মকানুন করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

আইনের পঞ্চম কাজ হ'ল সেনেটের দ্বারা বিধানপ্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে কিছু অধিক ক্ষমতা দেওয়া। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটকে নিজস্ব নিয়মাবলি রচনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে সরকারকে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা এবং নির্দিষ্টকালের মধ্যে সেনেটের

নিয়মাবলী প্রস্তুত না হ'লে সরকারকে সেগুলি তৈরি করে দেবার ক্ষমতাও দেওয়া হ ল।

আইনের ষষ্ঠ কাজ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকার নির্দেশসম্বন্ধীয়। এই আইন এলাকাগুলি নির্দেশ করে দেওয়ার পরিবর্তে ওই কাজের ভার সপার্ষদ বড়লাটের ওপর ন্যস্ত করলো।

সমালোচনা :—

ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের সম্বন্ধে তীব্র বিরোধিতার কথা আগে বলা হয়েছে। ওই বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে রাজসিক শক্তিতে প্রণীত আইন যে জনপ্রিয় হয়নি তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত এই আইনের পরিসর কমিশনের প্রস্তাবের চেয়ে আরো সংকীর্ণ ছিল। শাসন ও কার্যিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদনের প্রস্তাবগুলি আইনে নিবদ্ধ হয়েছিল, সংস্কারমূলক প্রস্তাব আদৌ সামান্য থাকলেও তার অনেকাংশই বাদ পাড়ছিল।

তখনকার শিক্ষাজগতের নেতৃস্থানীয় মহামতি গোখলে ওই আইনের যে সমালোচনা করেছিলেন তার মূলকথাগুলি নিম্নলিখিত প্রকার :—

প্রথমতঃ —আইনে উক্ত অধ্যাপনব্যবস্থায় তাঁর আস্থা ছিলনা, তার একটি কারণ যে তার জন্য যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করা হয়নি আর অপর কারণ এই যে তিনি ভেবেছিলেন যে দেশের বদান্য ধনিগণ এর জন্য যথেষ্ট টাকা দান করবেন না। তাছাড়া একথাও বলা হয়েছিল যে স্নাতকোত্তরস্তরের ওই ব্যবস্থার তখন কোনো চাহিদা ছিলনা।

(অবশ্য পরবর্তিকালের স্নাতকোত্তর শিক্ষার চাহিদা, সাফল্য ও শ্রেষ্ঠ ধনিগণের এ ক্ষেত্রে দান গোখলের এ উক্তির বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়েছে।)

দ্বিতীয়তঃ—নির্বাচনের নীতিটি বাঞ্ছনীয় হ'লেও তার ব্যবস্থাটি দেশের লোকের মনঃপূত হয়। মনোনীত সদস্যদের স্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য ছিল। তাছাড়া রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটরা স্বাধীনভাবে 'ফেলো'র নির্বাচন করলেও তৎকালীন অবস্থায় ফ্যাকাল্টিগুলির পক্ষ থেকে য়ুরোপীয়গণের নির্বাচন একপ্রকার অবধারিত ছিল। একে য়ুরোপীয়গণকে কৃত্রিমভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণতি করার ষড়যন্ত্র বলে' মনে করা হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ—প্রত্যক্ষভাবে, অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপকগণের নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকাও অসন্তোষের একটা কারণ হয়েছিল।

চতুর্থতঃ—এফিলিয়েশনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা ভারতীয়গণের প্রচেষ্টাকে খর্ব করার যন্ত্রস্বরূপে সবচেয়ে তীব্র বিরোধিতার কারণ হয়েছিল। এই সংঘর্ষ 'প্রসার-বনাম-মানের' দ্বন্দ্বের একাংশরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

(এই কড়াকড়ি যে সর্বৈবভাবে মন্দ ছিল তা নয়। নিকৃষ্টস্তরের ব্যবসায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্লাবনে তখন শিক্ষার মান বাস্তবিকই বিপন্ন হয়েছিল। তাছাড়া ছাত্রদের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখার ও অধ্যাপকবর্গের ছাত্রসমাজের নিকটে বাস করার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির অধিকতর সংহতিস্থাপনের প্রয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতার বৃদ্ধির নির্দেশ প্রভৃতির ধরণের সংস্কারকে একান্ত মন্দ বলে' অভিহিত করা যায় না।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এই দুইটি ব্যবস্থাপনের ফলে শিক্ষার বিভিন্ন শাখা এইসময়ে কিভাবে পরিণতি লাভ করেছিল তার একটা খসড়া নিচে দেওয়া হ'ল।

কলেজী শিক্ষা :—

আগেই বলা হয়েছে যে বিরোধিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি একান্তভাবে দোষণীয় ছিল না। শাসনব্যবস্থার সংস্কার ও দৃঢ়তা সম্পাদন করতে গিয়ে আইনটি কিয়দংশে সরকারি ক্ষমতার বৃদ্ধি করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি সুফল দান করেছিল।

১। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের শাসনের দুর্বলতার অনেকাংশে নিরসন হওয়াতে বিশ্বলিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২। ইন্সপেক্শনের ব্যবস্থায় ও এফিলিয়েশনের নিয়মের কড়াকড়িতে কলেজী শিক্ষার কিছু উন্নতি হয়েছিল। প্রাইভেট কলেজের অসুবিধা হয়েছিল অবশ্য আর কতকগুলি প্রাইভেট কলেজ উঠেও গেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যেখানে এফিলিয়েটেড কলেজের সংখ্যা ১৭৭ সেখানে অনেকগুলি নূতন কলেজের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সেই সংখ্যা কমে ১৭৪ এ দাঁড়ায়। এর মধ্যেও প্রসার-বনাম-মানের সমস্যাই দেখা যায়।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও অধ্যাপনার ব্যবস্থাও সুফলপ্রসূ হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—

বিশ্ববিদ্যালয় আইন যেমন কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আনবার চেষ্টা করেছিল তেমনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারি প্রস্তাবের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে

যদৃচ্ছাপরিণতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের নীতির প্রবর্তন হয়। পত্রে যে সরকারদ্বারা বর্ধিত তত্ত্বাবধানের কথা ছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং তদনুসারে ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়।

যে বিদ্যালয়গুলি সরকারি সাহায্য পেতনা পূর্বে তার ওপর সরকার হস্তক্ষেপ করতেন না, কিন্তু সরকারের নোতুন নীতি হ'ল যে সাহায্যপ্রাপ্ত হোক আর নাই হোক সমস্ত বিদ্যালয়েই যাতে উপযুক্ত মানের শিক্ষা দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা। এইজন্য সরকারি স্বীকৃতির (recognit on) নিয়ম প্রচলিত হ'ল এবং স্কুলগুলিতে স্বীকৃত হ'তে হলে' সাধারণ শিক্ষার মান, স্থায়িত্বের উপযোগী অর্থের নিশ্চিতি, নির্ভরযোগ্য পরিচালকসমিতি, ছাত্রদের আমোদ প্রমোদ ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, আঞ্চলিক প্রয়োজনসাধনের পক্ষে বিদ্যালয়টির উপযোগিতা এবং স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংগে হানিকর প্রতিযোগিতার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিভাগীয় পরিদর্শকের সন্তোষবিধান করতে হ'ত। অপরপক্ষে বিভাগদ্বারা স্বীকৃত স্কুলগুলির লাভের মধ্যে তারা সরকারি সাহায্য চাইলে পেতে পারতো, সর্বপ্রকার সাধারণ ও সরকারি পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাতে পারতো এবং সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভর্তি করতে পারতো।

যে-সব নিকৃষ্টমানের বিদ্যালয় এই ব্যবস্থায় সরকারি স্বীকৃতি লাভ না করে' ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তারা আত্মরক্ষার একটি উপায় আবিষ্কার করলো। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তখনকার ছাত্রদের সবাই উন্মুখ ছিল, ওই পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে বিদ্যাললে ছাত্র ভর্তি হ'তো না এইজন্য এই বিদ্যালয়গুলি অষ্টম বা নবম মান পর্যন্ত ছাত্রদের পড়িয়ে তারপর কোনো স্বীকৃত বিদ্যালয়ে তাদের পাঠিয়ে দিত এবং সেই বিদ্যালয় থেকে তারা প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষা দিত। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্কুল থেকে স্কুলে অব্যাহতভাবে যাওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অস্বীকৃত বিদ্যালয়ের "ট্রান্সফার সার্টিফিকেট"কেও অস্বীকার করা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ওই নিয়ম শিক্ষাবিভাগের সাধারণ নিয়মাবলির অন্তর্গত হয়।

এর পরে অস্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করবার কোনো উপায় রইলো না এবং সেগুলি ছাত্রের অভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসার-বনাম-মানের সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করলো।

প্রাথমিক শিক্ষা :—

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক

বলে' গৃহীত হ'লেও তার মধ্যেও শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই প্রসার-বনাম-মানের সংঘর্ষ নিহিত ছিল।

লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ার এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু জনসাধারণ যখন ব্যয়বর্ধন চাইছিল শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের জন্য তখন লর্ড কার্জন ইংলণ্ডের ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের অনুকরণে শিক্ষকশিক্ষণ, শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, শিক্ষার উপযোগী উপকরণের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা মানোন্নয়নের অভিলাষী হয়েছিলেন। উপরন্তু সরকারপ্রদত্ত বর্ধিত অর্থও অতসব উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও দেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না।

এইসব অসুবিধার মধ্যেও যে লর্ড কার্জনের সংস্কারদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হয়েছিল তা নিম্নলিখিত হিসাব থেবে বোঝা যায়ঃ—

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	প্রাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২০,৬৮,৫৪৮
১৯০১-০২	৯৩,৬০৪	৩০,৭৬,৬৭৮
১৯১১-১২	১,১৬,২৬২	৪৮,০৬,৭৩৬

এই সময়ে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি নিয়মকানুন ও পাঠ্যতালিকার অনুসরণ করতো বলে' সরকারি হিসেবেই গণ্য হ'ত, যদিও তার মধ্যে অনেকগুলি ডিষ্ট্রিক্ট বা মিউনিসিপাল বোর্ডের সাহায্য নিত না এবং কোনো কোনোটিতে "কলামূলোর" মানে বেতন নেওয়ার নীতি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কতকগুলি স্কুল তখন সরকারি ব্যবস্থার বাইরে ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সেরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বসমেত ৫৫০,০০০ ছাত্র পড়তো।

সাহায্যদাননীতির সংস্কার লর্ড কার্জনের আরেকটি বড় কাজ। ১৯০৪ থেকে আরম্ভ করে' ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওই সংস্কারগুলি সাধিত হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের নীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়। নূতন নীতির প্রয়োগে প্রদেশে প্রদেশে পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি ঐক্য ছিল। শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা ছাত্রশিক্ষকের সংখ্যা, ছাত্রের সংখ্যা, হাজরির নিয়মিততা, শিক্ষণীর বিষয়সমূহ, পরীক্ষা ও পরিদর্শনে প্রমাণিত শিক্ষার মান, উচ্চশ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যার অনুপাত, বিদ্যালয়গৃহ ও শিক্ষোপকরণ, স্কুলের

সাধারণ মান ও প্রয়োজন, সাধারণের নিকট লব্ধ সাহায্য ও এককালীন দান প্রভৃতি বিষয়ের বিচারে সাহায্যের নির্ণয় হ'ত। সাধারণত বাৎসরিক সাহায্যদানের নিয়ম হ'ল, কিন্তু কোনো কেনো ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের জন্যও সাহায্য দেওয়া হ'ত। সাহায্য বা 'গ্রাণ্টের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য "কোড" বা বিধি ছিল।

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত সাহায্যের দুটি অংশ থাকতো। প্রথমত হেড টিচার ও এসিষ্টেন্ট টিচারকে প্রয়োজনবোধে যথাক্রমে পাঁচটাকা ও তিনটাকার অনধিক ভাতা দেওয়া হ'ত। দ্বিতীয়ত পূর্ববর্ণিত বিষয়সমূহের বিচারে বাৎসরিক সাহায্য নির্দিষ্ট করা হ'ত। তাছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে বাড়ি ও আসবাবের জন্য সাহায্য দেওয়া হ'ত। সাহায্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদ্বারা নির্ধারিত হ'ত এবং শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার (D. P. I.) অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত হয়েছে যে তখন কিঞ্চিদধিক এককোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫.৩ কোটি টাকা সাহায্য পেত এবং ছাত্রপ্রতি সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১.৫ টাকা। বিদ্যালয় ও ছাত্রপ্রতি মোট বাৎসরিক ব্যয় কিভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা নিচের হিসেবে দেখানো হয়েছে—

সাল	একেকটি বিদ্যালয়ের ব্যয় (গড়পড়তা)	একেকটি ছাত্রের ব্যয় (গড়পড়তা)
১৮৮৭	৮৫৲	৩৲
১৯০২		৩.৭৲
১৯০৭	১৩৩৲	৩.৯৲

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি ১০.৯ বর্গমাইলের মধ্যে একটি করে' প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

অন্যান্য শিক্ষা :—

লর্ড কার্জন শিক্ষার অন্যান্য শাখারও সংস্কার ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কৃষি ও যন্ত্রশিল্পশিক্ষার আলোচনার জন্য কয়েকটি সভা আহ্বান করেছিলেন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও বনবিভাগীয়, পশুচিকিৎসা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন, শিল্প ও বাণিজ্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিলেন "ষ্টেট স্কলারশিপের" ব্যবস্থা করেছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের অবশেষগুলি সংরক্ষণের আইনদ্বারা

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে ভারতসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় যে বৈচিত্র্যের প্রয়োজনের দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি লর্ড কার্জন সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁরদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন যে-সব চেষ্টা করেছিলেন, তার পশ্চাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল, যথা, সেই সময়ে দেশে রাজনৈতিক অশান্তির ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকারসমস্যার স্থত্রপাত হয়েছিল বলেই হয়ত তিনি শিক্ষা-সংস্কারদ্বারা প্রথমটির নিয়ন্ত্রণ ও দ্বিতীয়টির সমাধান করতে চেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ শিক্ষানৈতিক দিক থেকে যে তিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন তা পূর্বে বিভিন্নপ্রসংগে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর পরাজয় তাঁর হঠকারিতার মতোই সর্বৈব হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক ভ্রান্তি হয়েছিল জাতীয় চেতনাকে সম্মানিত করার পরিবর্তে লাঞ্ছিত করার চেষ্টায়। অপমানিত দেশবাসী তাই তাঁর ভালোমন্দ সকল প্রচেষ্টাকেই সমভাবে নিন্দনীয় বলে' ঘোষণা করেছিল।

শিক্ষায় জাতীয় ভাব :—

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে বলা হয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকেই জাতীয় ভাবধারা ও আন্দোলন শিক্ষাকে স্পর্শ করেছিল। লর্ড কার্জনের সময়ে বাংলার ছাত্রসমাজ বংগভংগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় তিনি আইন করে' কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দিয়ে তাদের বারণ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বর্জনোদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাসংসদ (National Council of Education) স্থাপিত করেন। তারজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম অধ্যক্ষরূপে নিয়ে কলিকাতায় একটি ন্যাশনাল কলেজ, যাদবপুরে একটি শিল্পশিক্ষালয় আর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠব্যক্তিরা এই সংসদের গৃহীত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করতেন।

এই আন্দোলন স্থায়ী হয়নি। রাজনৈতিক উন্মাদনাস্পৃষ্ট অন্যান্য সাময়িক আলোড়নের মতো কিছুকাল পরে এর বিলোপ ঘটেছিল। কেবল যাদবপুরের শিল্পশিক্ষালয়টি ক্রমোন্নতি লাভ করতে করতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

উপসংহারে লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংস্কারের কালকে একাধারে তীব্র মতভেদের, ক্ষণস্থায়ী প্রারম্ভের ও বিশিষ্ট পরিণতির কাল বলে' অভিহিত করা যায়। দেশের লোকে যখন বিপ্লব চাইছিল তখন তিনি দিয়েছিলেন নিয়মের বন্ধন আর তার থেকে উদ্ভব হয়েছিল সংঘর্ষের। এই সংঘর্ষের মধ্যে উভয়পক্ষে যে কার্যকলাপের সঞ্চার হয়েছিল সে দুই দিকের প্রচেষ্টাই আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল—যেমন জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তেমনি তাঁর সংস্কার। আবার সকল মতভেদ ও রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যেও তিনি কয়েকটি কাজ যে করে' যেতে পেরেছিলেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

১৯০৫-১৯২১

ভূমিকা।

ভারতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের তুফান তুলে লর্ড কার্জন যখন দেশে ফিরে গেলেন সেই সময়ে ইংলণ্ডে সংস্কারবাদী উদারপন্থী এক সরকার গঠিত হয়। এদিকে তখন সমস্ত প্রাচ্যদেশসমূহে এক জাগরণ দেখা দিয়েছিল, রুশজাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের হাতে রুশের পরাজয় এশিয়াবাসীর মনে নোতুন আশার সঞ্চার করেছিল। তাছাড়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কীতে প্রতিনিধিমূলক সরকারের গঠন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনের ন্যাশন্যাল এসেম্বলির স্থাপন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের স্পৃহা জাগিয়েছিল।

সেই সময়ে ভারতের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট হ'লেন লর্ড মর্লি আর লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। লর্ড মিণ্টো বংগভংগের স্থিরনিশ্চিতির অদলবদল করতে রাজি হ'ননি বলে' তখনও বাংলাদেশে আন্দোলন চলতে থাকলো। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্যন্ত সেই আন্দোলনে যোগ দিল। তাদের দমন করার জন্য বাংলা ও আসামের প্রথম ছোটলাট স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করেন যে যে বিদ্যালয়ের ছেলেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবে সেই বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি হারাবে। তদনুসারে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাটনা শহরের দু'টি বিদ্যালয়ের শাসন করতে নির্দেশ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধবাদ করতে সাহসী হয়নি এবং সেই ব্যাপারে স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করেছিলেন।

এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লিমিণ্টো শাসন-সংস্কারের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু তার সংকীর্ণ অধিকারসমূহ দেশের লোকের মনে সন্তোষ দিতে পারেনি, উপরন্তু তার মধ্যে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করা হয় যা কিনা পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্র ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করেন ও লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই ইংলণ্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে করোনেশনের পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতভ্রমণে আসেন। এই সময় কথিত তাঁর কতকগুলি ভাষণের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী উক্তি ছিল।

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট সংস্কারের হাওয়া এসেছিল। তার ছায়া ভারতের শিক্ষার ওপরও পড়ে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-রঞ্জিত উদারপন্থা পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। বিস্তার বনাম উৎকর্ষের কলহ তখনও চলেছিল। উৎকর্ষসাধনের সংগে বৃটিশসরকার তার শাসনরজ্জুকে দৃঢ়তর করতে চেয়েছিল আর ভারতীয় শিক্ষাবিদদের মত ছিল যে বিস্তারের হানি ঘটিয়ে উৎকর্ষসাধনের মতো যথেষ্ট শিক্ষার প্রসার এদেশে এখনও হয়নি। সরকার ও দেশের নেতৃবর্গের এই মতদ্বৈধ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সরকারি অপসরণনীতি পরিত্যক্ত না হলেও সাধারণের উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা হয়েছিল।

১৯০৬ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক, দেশজ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, শিক্ষকশিক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা বয়স্কাউট আন্দোলন, পাঠ্য ও শিক্ষামূলক পুস্তক ইত্যাদির বিষয়ে সরকারি নীতি প্রকাশিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তাদের নিয়ে কতকগুলি সভার অনুষ্ঠান করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "আই-ই-এস" বিভাগের পদগুলি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি স্বীকৃত হয়।

আর্থিক দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদ সরকারি রাজস্বের সুসময় ছিল এবং ওই বর্ধিত অর্থাগমের কিছু অংশ শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রবাহিত হয়েছিল। শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থ ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দের ৪০১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ৯০২ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময়েও ১৯১৩-১৭ পঞ্চবার্ষিকীতে কেন্দ্রীর সরকারকর্তৃক ৩২৯ লক্ষ টাকা এককালীন ১২৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৭-২২ পঞ্চবার্ষিকীতে কোনো অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যয়ের পরিমাণ সমান রাখা হয়েছিল।

তখনকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যানুপাতিক হার নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল—

	প্রতিষ্ঠান	ছাত্র
সরকারি—	৩০০২	২,৬৫,৯৪৯
বোর্ড—	৫৩,২৫২	৩০,৭৭,৯৫৮
সাহায্য প্রাপ্ত—	১,০০,৬৬৮	৩৮,৩২,৯৩৪
সাহায্য বিহীন—	১৬,৩৫৭	৫,৬৫,৩৮৪
অস্বীকৃত—	১৬,৩২২	৪,২২;১৬৫

এরমধ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলি সংখ্যায় কম হ'লেও আনুপাতিক ব্যয় তাদেরই বেশি ছিল।

দেশের স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি তখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাচ্ছিল অথচ ওই প্রতিষ্ঠানগুলি পাচ্ছিল সরকারের শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থের ২০% মাত্র। অবশ্য এই হিসেবের সংগে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সরকারকর্তৃক তখন কতকগুলি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিল সেগুলিতে স্বভাবতই ছাত্রের মাথাপিছু ব্যয় খুব বেশি হ'ত। তাছাড়া সরকারি শিক্ষালয়ের ব্যয়ের সমগ্র ভার সরকারের ছিল আর অন্যান্য শিক্ষালয়ের প্রতি ছিল সাহায্যের দায়িত্ব।

শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের আধিপত্য যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ক্রমান্বয়ে কমে আসছিল সে-কথা আগে বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে তারা উচ্চশিক্ষার চেয়ে জনশিক্ষার ওপর জোর দিতে আরম্ভ করেছিল। বিংশ শতাব্দিতে মিশনারিদের কার্য-কলাপের ধারা সেই ভাবেই চলেছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্বসমেত ১০,৪৬১টি মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছিল। তারমধ্যে ৪২টি সাধারণ কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৫টি শিক্ষকশিক্ষণালয় ৯২৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৪২টি বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিদ্যালয় ছিল। এগুলিতে বৎসরে ১,৩৮,০০,৪৫৭ টাকা ব্যয় করে' তারা ৫,৩৩,৯৫৪ জন ছাত্রকে পড়াচ্ছিল।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ১২% ও ছাত্রসংখ্যার ১৭% মিশনারিদের হাতে ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রের কাজে তাদের একটি বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। তারা অখৃষ্টান শিক্ষকদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না বলে' তাদের নিযুক্ত করতে

চাইতো না, কিন্তু ক্ষুদ্র খৃষ্টান সমাজ থেকে অতগুলি মিশনারি বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়েছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহলের কান্দি শহরের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেঃ এ, জি, ফ্রেজারকে সভাপতিরূপে নিয়ে ভারতের গ্রামবাসীদের শিক্ষা ও তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রচারের বিষয়ে আলোচনার জন্য মিশনারিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গ্রাম্যজীবনের সমাজকেন্দ্ররূপে বিদ্যালয়সমূহের পরিণতি, মধ্যমানের (Middle) বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষার জন্য ওই স্তরের আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবহার, শিক্ষকশিক্ষণের ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রধান ছিল।

এই সময়ে শিক্ষাসম্বন্ধে দুটি প্রধান দলিল রচিত হয় তার মধ্যে একটি হ'ল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্র আর অন্যটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট। প্রথমে এ দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তারপর এ-যুগের বিশেষ পরিণতিসমূহের বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্র।

এই পরিচ্ছেদের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই যুগ তীব্র সংঘর্ষ ও গভীর পরিণতিসমূহে পূর্ণ ছিল এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুতবেগে বেশ কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজা ও বড় লাটের পরিবর্তন ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নূতন সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন প্রভৃতি মিলে শিক্ষানীতিবিষয়ে নূতন আলোকপাতের প্রয়োজনের সৃষ্টি করেছিল। প্রধানত সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি বিবৃতিরূপে এক পত্র প্রকাশিত হয়।

এই পত্রে সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনাদ্বারা কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষদর্শন করে' তার প্রধান কারণস্বরূপ অর্থাভাবজনিত সরকারি সাহায্যের অল্পতার আর অসাবধানতাজনিত অনুপযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও উপযোগী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সমালোচনার পর তিনটি মূলসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—

১। সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে মানোন্নয়নের অধিক প্রয়োজনীয়তা।

২। সাধারণ ছাত্রদের জন্য কার্যকরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

৩। উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

ওই মূলনীতি অবলম্বনে প্রথমে প্রাথমিক তারপর মাধ্যমিক ও শেষে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে নির্দেশসমূহ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করেও আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নানা কারণ দেখিয়ে ওই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়নি। বলা হয়েছে যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কাল তখনও উপস্থিত হয়নি। স্বেচ্ছার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ যতদূর সম্ভব প্রসারিত করার নীতি ঘোষিত হয়েছে।

১। লেখাপড়া, অংক, অংকন, পরিবেশপরিচয় ও ব্যায়ামশিক্ষা সমন্বিত নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুল প্রসারদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা হবে।

২। সুনির্বাচিত কেন্দ্রসমূহে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হবে এবং প্রয়োজনানুসারে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে।

৩। প্রধানত "বোর্ড" স্কুলের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা হবে, সম্ভব না হ'লে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে এবং মক্তব ও পাঠশালার সহায়তা করা যেতে পারবে, কিন্তু হঠাৎ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ওপর ভরসা রাখা হবে না।

৪। গ্রাম্য ও নাগরিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা সম্ভবপর না হ'লেও নাগরিক স্কুলে ইতিহাস ও ভূগোলের স্থলে গ্রাম্য স্কুলে প্রকৃতিপরিচয় পড়ানো যেতে পারে।

৫। বিদ্যালয়ে যে শ্রেণির বালকেরা পড়বে শিক্ষকদেরও সেই শ্রেণির হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের শিক্ষার মান নির্দেশ করে' শিক্ষকশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠার ও অবসরকালীন বিশেষ শিক্ষণব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

৬। উপযুক্ত শিক্ষাণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন ১২৲ টাকার নিচে হবেনা এবং প্রভিডেণ্ড ফণ্ড বা পেন্সনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। একেক শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা ৩০।৪০ এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং পঞ্চাশোর্ধ কখনই হবেনা।

৮। প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তর হিসেবে মধ্যশিক্ষার প্রসার করতে হবে এবং নিম্ন ও উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করা হবে।

৯। বিদ্যালয়গৃহ স্বাস্থ্যকর, প্রশস্ত অথচ অল্পব্যয়ে নির্মিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিষয়ে বলা হয়েছে যে এখানে প্রায় প্রত্যেক তিন বর্গমাইলের মধ্যে কোনো-না-কোনো প্রকারের একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ-ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে ছাত্রদের হাজিরা ও শিক্ষকদের মানোন্নয়নের অধিক প্রয়োজন। তথাপি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে মানোন্নয়নের সংগে প্রসারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে,—শিক্ষকদের বেতনের হারের বৃদ্ধির সংগে সংগে তৎকালপ্রতিষ্ঠিত ১০০,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর আরো ৯১,০০০টি নোতুন বিদ্যালয় স্থাপিত করা হবে এবং যে বারকেটি আড়াইলক্ষ ছাত্র তখন প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা দ্বিগুণিত করা হবে।

স্ত্রীশিক্ষার কোনো ভালো ব্যবস্থা হয়নি বলে' বলা হয়েছে যে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার অনুকরণমাত্র হবেনা, তাদের জন্য পরীক্ষার উৎপীড়ন থাকবেনা এবং উপযুক্ত কার্যিক পাঠ্যক্রম দেওয়া হবে। স্ত্রীশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষয়িত্রী ও পরিদর্শিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনাপ্রসংগে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিস্প্যাচ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের অনুসারে সাধারণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার নীতির পুনরুক্তি করে সংগে সংগে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের অনুসরণে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপসরণনীতি প্রযোজ্য হ'লেও সহায়িত সাধারণপ্রচেষ্টাকে পরিদর্শন, স্বীকৃতি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং মাননির্দেশের জন্য স্থানে স্থানে সরকারি বিদ্যালয়ও খোলা হবে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :—

১। কেবলমাত্র গ্রাজুয়েট বা শিক্ষণশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকপদে স্থায়ী করা হবে।

২। ইংরেজিশিক্ষকের বেতনের মান অন্যূন ৪০৲ ও অনূর্ধ্ব ৪০০৲ থাকবে।

৩। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সমন্বিত আধুনিক পাঠ্যক্রম নির্ধারিত করে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে দেওয়া হবে।

৪। কায়িক শ্রমের কাজ শেখানো ও বিজ্ঞানের উন্নতি করা হবে।

৫। ছাত্রদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি যাতে উন্নতি করে' সরকারি স্কুলের সংগে সামঞ্জস্য

রক্ষা করতে পারে তারজন্য বর্ধিত সরকারি সাহায্যের কথা বলা হয়েছে এবং প্রসারের জন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতার ও প্রয়োজনবোধে সরকারি বিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণের জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষকশিক্ষণালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

কলেজী শিক্ষাসম্বন্ধে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে তাতে ইংলণ্ডের ঘটনাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ পুরনো "ফেডেরাল" বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারদ্বারা ঐকিক, শিক্ষাদায়ক, আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে ভারতবর্ষে অনুরূপ প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা হয়ঃ—

১। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ী আইনে সুফল দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা যথেষ্টভাবে সন্তোষজনক হয়নি। বিশেষ করে' ছাত্রদের বাসস্থান, সংযমন, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে' বর্ণনা করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করে' বলা হয়েছে যে "এফিলিয়েটিং" বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজগুলির মধ্যে মানসাম্য স্থাপিত হয়নি। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত ছিল,— সমগ্র বৃটিশভারতে মাত্র পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫টি কলেজের দায়িত্ব বহন করছিল। ওই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও নূতন আদর্শের পরীক্ষণের জন্য ওই পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি কতকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা হবে, পরীক্ষণ ও শিক্ষণব্যবস্থার পৃথকীকরণেরও চেষ্টা হবে।

৩। তদনুসারে ঢাকা, আলিগড়, বেনারস এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য স্থানেও ঐকিক, আবাসিক, শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আভাস দেখতে পাওয়া যায়।

৪। রেংগুন, পাটনা ও নাগপুরে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মভার কমাবার কথা বলা হয়েছে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের চাপ কমাবার জন্য আরো বলা হয়েছে যে স্কুলগুলিকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য স্বীকৃত করার ভার প্রাদেশিক শিক্ষা-

বিভাগকে (ও করদরাজ্যের দরবারকে) দেওয়া হবে। সরকারি বিভাগের পরিদর্শনবিভাগ থাকায় এই কাজের জন্য সেগুলিই বেশি উপযোগী।

৬। পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য সেগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে এবং ছাত্রদের নৈতিক অবস্থার তত্ত্বাবধান, গ্রন্থাগারস্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বর্ধিত অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের প্রস্তাবগুলিকে কতখানি কাজে পরিণত করা যায় তার বিচারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিয়োগ হয়। প্রথমে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এর সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের ফলে তখনই ওই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। পরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর মিঃ (পরে স্যর) মাইকেল স্যাডলরকে সভাপতিরূপে নিয়ে "স্যাডলর-কমিশন" ব'লে খ্যাত ওই কমিশন স্থাপিত হয়। এর অন্যান্য সভ্যরা ছিলেন ডাঃ গ্রেগরি, মিঃ (পরে স্যর) ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজে মুর, বংগীয় প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা; স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (পরে স্যর) জিয়াউদ্দীন আহ্‌মদ। এর রিপোর্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক সরকারি প্রস্তাবে ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে এর সুপারিশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ তদন্ত করা এর মূল উদ্দেশ্য হলেও ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় যাতে উপকৃত হ'তে পারে সেইজন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপও একে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছিল। ফলত এই কমিশনের রিপোর্টকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাবশালী এক দলিল বলে' গণ্য করা হয়ে থাকে।

এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা উভয় সম্বন্ধেই প্রস্তাব করতে বলা হয়েছিল বলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশন ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ে এর অধিকার ব্যাপকতর ছিল এবং প্রস্তাবগুলি ব্যাপকতর ও অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষার উন্নয়নসম্পর্কে এর প্রথম কথাই ছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ-সংস্কার ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বহু লোকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ

স্বীকার করে ওই শিক্ষা গ্রহণ করছিল এবং আরো বহু লোকে ইচ্ছা স্বত্ত্বেও অর্থাভাববশত তা নিতে পারছিল না, কিন্তু ওই শিক্ষা তখন অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বস্তুত মাধ্যমিক শিক্ষার অনুপযোগিতাকেই এ-দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতম অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ—সুশিক্ষকের অভাব। অর্থাভাবের দরুণ শিক্ষাবিভাগে বেতনের মান নিচু বলে' দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষা এক্ষেত্রে আসে না এইজন্য এদের বেতনের হার বৃদ্ধি করবার জন্য বার্ষিক ১৫০ লক্ষ টাকার বিশেষ সাহায্যের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে ঃ—

প্রথমতঃ—মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার প্রকৃত সীমারেখা হবে "ইন্টারমিডিয়েট" স্তরের পর, "প্রবেশিকার" পর নয়। "ইন্টারমিডিয়েটের" পড়াকে বিদ্যালয়ের পড়া বলে' গণ্য করে' ওই স্তরের ছাত্রদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে পরিচালিত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ—সরকারকর্তৃক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে কলা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হবে। সেগুলি পৃথক কলেজরূপে পরিচালিত অথবা প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে সংযোজিত হবে।

তৃতীয়তঃ—সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়ে "বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন" গঠিত হবে। ওই বোর্ডে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের (তুঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা) এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পসংস্থাসমূহের প্রতিনিধি থাকবে। বোর্ড শিক্ষাবিভাগের অংশমাত্র হবে না; স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসনশীল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হবে। অধিকাংশ সভ্য বেসরকারি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ্যের প্রতিনিধি যথেষ্টসংখ্যক থাকবে।

শিক্ষার বাহনসম্বন্ধে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ও গণিত ভিন্ন সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা এবং কলেজী শিক্ষার বাহন ইংরেজি হওয়া উচিত।

কলেজী শিক্ষার উন্নয়নপ্রসংগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে ঃ—

প্রথমতঃ—"ইন্টারমিডিয়েট" স্তরের পর ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশ করলে অধিক বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল ছাত্রদের দ্বারা পড়াশোনা ভাল হবে।

দ্বিতীয়তঃ—ডিগ্রির পড়ার কাল তিন বৎসর হবে। অব্যাহতভাবে তিন

বৎসরকাল অধ্যয়নের সুযোগ পেলে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন হবে এবং শিক্ষকছাত্রের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে।

তৃতীয়তঃ—মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার সমুদয় ভার "বোর্ডের" হাতে ন্যস্ত হ'লে সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার লাঘব হবে এবং তারা উচ্চশিক্ষার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে পারবে।

চতুর্থতঃ—যান্ত্রিক পরীক্ষা ও বক্তৃতাভিত্তি অধ্যয়নঅধ্যাপনের পরিবর্তে "টিউটোরিয়াল"-"সেমিনার" প্রভৃতির সন্নিবেশে ছাত্র-অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হবে। "বি-এ" পরীক্ষার জন্য সাধারণ ভিন্ন "সম্মানসহ" পাঠ্যক্রমের ও স্নাতকোত্তর স্তরে গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চমতঃ—এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবস্থাপনার যন্ত্রমাত্র ছিল এখন সেগুলিকে পণ্ডিতসমাজে পরিণত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনসংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে:—

১। ঢাকায় একটি ঐকিক ও শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

২। কলিকাতা শহরের কলেজী শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগসমূহ একত্রিত করে' একটি বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাকেন্দ্র রচিত হবে।

৩। মফঃস্বলের কলেজগুলিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে' নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধিসম্বন্ধে প্রস্তাব করা হয়েছে:—

১। কার্যকলাপের নিয়মের কড়াকড়ি কমাতে হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গের জন্য সরকারি চাকরির পরিবর্তে বিশেষ চাকরির সৃষ্টি হবে এবং বহিরাগত বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সভ্যসমন্বিত "নির্বাচক সমিতির" দ্বারা তাঁদের নিযুক্তি স্থির করা হবে।

৩। পশ্চাদ্‌পদ সমাজরূপে মুসলমানদের শিক্ষার বিশেষ যত্ন করা হবে।

৪। ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক সুপরিণতির জন্য অধ্যাপকশ্রেণীর একজন "ডিরেক্টর অব্ ফিজিক্যাল ট্রেণিং"—নিযুক্ত করা হবে এবং ডাক্তার ও অন্যান্য সভ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি "বোর্ড অব্ ষ্টুডেণ্টস ওয়েলফেয়ার" স্থাপিত হবে।

নূতন আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনের একটা খসড়া দেওয়া হয়েছে—

১। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের বদলে একটি ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিমূলক "কোর্ট" ও ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতির (Executive Council) দ্বারা এগুলি পরিচালিত হবে।

২। অধ্যাপন, পরীক্ষণ, ডিগ্রির বিতরণ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের বিচারের জন্য "একাডেমিক কাউন্সিল" থাকবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের "ফ্যাকাল্টি", "বোর্ড অব্ ষ্টাডিজ" প্রভৃতি সহকারি সমিতিসমূহ স্থাপিত হবে।

৩। ছাত্রদের বাসস্থান ও সমাজকেন্দ্ররূপে "হল" স্থাপিত হবে।

৪। পূর্ণনিযুক্ত বেতনভুক ভাইসচান্সেলর থাকবেন।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে সরকারি বিভাগমাত্রে পরিণত না হয় এরূপ স্বাধীনতা তাদের থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত ব্যাপারে অধ্যাপকদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং নিয়মকানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে কলেজগুলির সম্পর্কের সম্পর্কের তিনটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—কলেজগুলি সংশ্লিষ্ট (affiliated), সংযোজিত (incorporated) বা অংগীভূত (constituent) হতে পারে। প্রথম প্রকারের যোগটি ভারতে প্রচলিত থাকলেও সর্বাপেক্ষা শিথিল এবং এই প্রকারের সম্পর্ককে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে' দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে নিয়ে যেতে হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে হয় "ইন্টারমিডিয়েট" কলেজে পরিণত করা হবে নয়তো "য়ুনিভার্সিটি কলেজ" নামাংকিত করে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রধান আদর্শের আলোচনা করা হয়েছে, যথা—ঐকিক, আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক এবং পরীক্ষক ও সংশ্লেষক। প্রথম প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর বাঞ্ছনীয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

শেষে কতকগুলি বিবিধ বিষয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা—

১। স্ত্রীশিক্ষা,—যে সব হিন্দু মুসলিম পরিবারে মেয়েদের ১৫।১৬ বৎসর বয়স অবধি শিক্ষাদানের রীতি নেই তাদের জন্য "পর্দাস্কুল" স্থাপিত করে' মেয়েদের উপযোগী বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হবে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বোর্ড স্থাপিত হবে।

২। শিক্ষকশিক্ষণের জন্য ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হবে এবং আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য 'শিক্ষা' একটি বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

৩। যন্ত্রশিল্পের বিধিবদ্ধ ও কার্য্যকরী শিক্ষা ও ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৪। বাংলাদেশের লোকের আইন ও চিকিৎসা ভিন্ন অন্য কোনো বৃত্তিশিক্ষার

অনিচ্ছা দেখে বলা হয়েছে যে বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়ার প্রয়োজন এবং নিম্নতর পদের উপযোগী বৃত্তি ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের বিষয়ীভূত হওয়া চাই।

৫। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী যোগসূত্রস্থাপনের জন্য 'ইণ্টার য়ুনিভার্সিটি বোর্ডের স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সমালোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই কমিশন যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ এনেছিল তাতে সন্দেহ নেই। মাতৃভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে এই রিপোর্ট পূর্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেবল মাত্র কার্যকারিতার বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের মাধ্যমিকশিক্ষা-সংক্রান্ত কাজ কমিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার শীর্ষস্থানীয়ে পরিণত করতে চেয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার যে সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল সে-সব কথার সত্যতা বর্তমানে স্বাধীনভারত উপলব্ধি করতে পারছে। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষারূপে মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'ইণ্টারমিডিয়েট' স্তরে উন্নীত এবং কার্যকর ও বহু শাখায়িত করার প্রস্তাব সেদিন লোকের মনঃপূত না হ'লেও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের দ্বারা সে দিকে প্রথম পদক্ষেপের ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঐকিক শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনা এই রিপোর্টে দেওয়া হয়েছিল সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের মতো বিরাট অথচ দরিদ্র দেশে তার প্রয়োগের সময় তখনও আসেনি। তখনকার হিসেবেই একেকটি নোতুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ক'রে টাকা লাগতো, ওই বিরাট অর্থ ব্যয়ে ছোটো ছোটো ঘনিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন অনেকের কাছে উৎকর্ষবিলাস বলে প্রতিভাত হয়েছিল। শুধু তখন নয়, আজ পর্যন্ত এই বিরাট দেশের সমস্ত শিক্ষা নোতুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে দিতে গেলে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে সেগুলির স্থাপনের সম্ভাবনা নিকট বা অল্পদূর ভবিষ্যতের মধ্যে দেখা যায় না। কাজেই "এফিলিয়েটিং" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আমাদের দেশে তখন ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকদিন থাকবে।

তাছাড়া আরেকটি কারণে বিশেষত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই রিপোর্টের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে চাননি, মনে করেছিলেন যে জাতীয় চেতনাবিদ্বেষী বিদেশী রাজপক্ষে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাহ্রাসের ষড়যন্ত্রমাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট চিত্তদাহের সৃষ্টি করেছিল এবং কলিকাতাতেই তার প্রস্তাবসমূহ সর্বাধিকভাবে পরাজিত হয়েছিল বটে কিন্তু তার সুফলও হয়েছিল— সেকথা কলেজী শিক্ষার পরিণতির ইতিহাসের সংগে যথাক্রমে আলোচিত হবে।

কলেজীশিক্ষা

কলেজী শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) যে আপত্তির সৃষ্টি করেছিল সে আলোচনা পূর্ব পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। কালক্রমে এই আপত্তির দু'টি প্রধান বিষয় অপ্রমাণিত হয়েছিল, যথা উচ্চশিক্ষার প্রসার প্রথমে সহসা হ্রাস পেলেও পরে পূর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল, পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বদান্য ব্যক্তিদের দান সেদিকে প্রচুরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দ থেকে বৃটিশ ভারতের সাধারণ "আর্ট" ও "সায়েন্স" কলেজের ও ছাত্রদের সংখ্যা নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল :—

সন	কলেজ	ছাত্র
১৯০১-০২	১৪৫	১৭,৬৫১
১৯০৬-০৭	১৩৬	১৮,৯১৮
১৯১১-১২	১৪০	২৯,৬৪৮
১৯১৬-১৭	১৩৪	৪৭,১৩৫
১৯২১-২২	১৬৭	৪৫,৯২৯

অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আইনের ফলে প্রথমে কলেজের সংখ্যা কিছু কমলেও ছাত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কলেজের সংখ্যা উত্থানপতন সত্ত্বেও বৃদ্ধিই পেয়েছে। শেষ বৎসরের ছাত্র সংখ্যার কমতি হয়তো কিছু কিছু ছাত্র বিভিন্নদিকে চলে যাওয়ার ফলে ঘটেছে।

এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষাদান-

ব্যবস্থার যে সামান্য নির্দেশ দিয়েছিল তদনুসারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার বিভাগ খোলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ভিন্ন স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এখানে অর্থনীতিশিক্ষার জন্য "মিণ্টো" অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে সরকার কর্তৃক মিণ্টো অধ্যাপককে বার্ষিক ১০,০০০৲ দেওয়া হ'ত,—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ঐ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৩,০০০৲ করা হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের প্রস্তাবানুযায়ী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগে কলা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য দু'টি "কাউন্সিল" স্থাপিত হয়, স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত ছত্রিশ লক্ষ টাকায় কলিকাতার সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ওই কলেজে একটি মনোবিজ্ঞানের বিভাগও স্থাপিত হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের বাসস্থান স্থির করার ও অন্যান্য বিষয় সহায়তার জন্য লণ্ডনের ক্রমওয়েল ষ্ট্রীটে একটি আপিস খোলা হয়েছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রের আরেকটি নির্দেশে ইণ্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষার বোর্ডের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু ওই নির্দেশ সর্বত্র পালিত হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদুপরি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও ওই ব্যবস্থা করা হয়নি, তবে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের পাঠ্যের উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যসাধন হয়েছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে কলেজী শিক্ষার মানের কিছু কিছু উন্নতি হয়েছিল। কলেজগুলির বাড়িঘর শিক্ষোপকরণ, অধ্যাপক প্রভৃতি সব দিকেই অগ্রগতি ঘটেছিল কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব তখন থেকেই কিছু কিছু অনুভূত হচ্ছিল।

কলেজী শিক্ষার আরেকটি প্রধান দুর্বলতা ছিল বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব। সরকারি চাকরির লোভে দলে দলে যুবক সাধারণ কলা ও বিজ্ঞানের "গ্রাজুয়েট" হয়ে বেরোচ্ছিল। সরকারি চাকরির সম্ভাবনা এদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে অপ্রচুর থাকায় এই সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজের বেকার সমস্যা অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

এই সময়ে বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল তা প্রধানত নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারের দ্বারাই করা হয়েছিল। গংগার খাল খননের তত্ত্বাবধানের জন্য যেমন রুড়কির টমাসন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তেমনি রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি শিল্পপীঠ এবং পশুচিকিৎসার কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শিক্ষার এই সংকীর্ণতার উল্লেখ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে করা হয়ে থাকলেও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা শীঘ্র হয়নি।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যেখানে কলা ও বিজ্ঞানের কলেজ ১৬৭টী ছিল সেখানে বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ৫২টি, যেখানে সাধারণ কলেজে ৪৫,৯২৯ জন ছেলে পড়তো, সেখানে বৃত্তিশিক্ষার কলেজে পড়তো ১৩৬৬২ জন। বৃত্তিশিক্ষা যারা নিত তাদের মধ্যেও অধিকাংশ চিকিৎসা, আইন ও শিক্ষণ পড়তো আর শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি পড়তো কম সংখ্যক। ৫২টি বৃত্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০টি শিক্ষকশিক্ষালয় ১৪টি আইন কলেজ আটটি মেডিকেল কলেজ, ছয়টি কৃষিবিদ্যালয়, পাঁচটি বাণিজ্য-বিদ্যালয়, তিনটি পশুচিকিৎসার ও তিনটি বনবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। চিকিৎসা আইন ও শিক্ষণশিক্ষা লাভ ক'রছিল ১০,৫৪৬ জন আর অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষা পাচ্ছিল ৩১১৬ জন।

সরকারি সাহায্য এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছিল (এই কাল রাজস্বের দিক দিয়ে সুসময় ছিল)। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নতির জন্য বৎসরে যে পাঁচ লক্ষ টাকা সরকার ব্যয় করেন তার মধ্যে প্রথম পাঁচ বৎসরে সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা কলেজগুলির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। পরের পঞ্চবার্ষিকী থেকে ওই সাহায্য স্থায়ী হয়ে গেলে পর তার থেকে বার্ষিক ৩,৬৫০০০ টাকা কলেজগুলির জন্য চিহ্নিত ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের ভাগে তারমধ্যে ১,১০,০০০ টাকা পড়েছিল।

১৯০৭ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিকী হিসেবে কলেজগুলির উন্নতির জন্য বার্ষিক ২·৪৫ লক্ষ টাকার একটি অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। তাছাড়া, তাদের ছাত্রাবাস নির্মাণ করানোর জন্য অনেকগুলি এককালীন দান করা হয়েছিল। তারপরের পঞ্চবার্ষিকী হিসেবে (১৯১২-১৭) বার্ষিক ২·৮৪ লক্ষ টাকার আরেকটি দান বরাদ্দ হয়।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে সাধারণশিক্ষার কলেজগুলির জন্য সর্বসমেত ৪৯·২৬ লক্ষ টাকা সরকারি ব্যয় ছিল, তারমধ্যে ১৫·২৪ লক্ষ টাকা প্রাইভেট কলেজগুলিকে সাহায্যরূপে দেওয়া হ'ত, অর্থাৎ, সরকারি ব্যয়ের অধিকাংশ সরকারি কলেজের জন্য হ'ত।

এই সময়কার কলেজী শিক্ষার বিশ্লেষণে দুটি দিক বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি দিক হ'ল ভালর দিক, এই শিক্ষা জাতীয় জীবনকে কিভাবে শক্তিশালী করে সেই দিক। ইংরেজিমাধ্যম কলেজী শিক্ষা ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্য ভাষা, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সংগে পরিচিত করিয়ে দেশের মধ্যে যে নবজাগরণ এনেছিলো এই যুগে সেই নবভাবের ধারা জাতীয় চেতনার

দিকে ধাবিত হয় এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জাগিয়ে মেকলের উক্তিকে আংশিক ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে।

অপরপক্ষে এই শিক্ষা উচ্চমানের হলেও অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অকার্যিক ছিল, বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির কোনো সহায়তা এর দ্বারা হয়নি।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর একটিও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হওয়ায় কলেজী শিক্ষার বহুল প্রসারের ফলে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর অত্যন্ত চাপ পড়ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আদর্শ প্রচারিত হওয়ার পর কতকগুলি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লেখা হলেও জনমতের বিরোধিতায় ওই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওপর তার প্রস্তাবগুলির প্রয়োগ সম্ভব হয়নি কিন্তু সেই আদর্শে অন্যান্য স্থানে আরো কতকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যেখানে সমস্ত ভারতবর্ষে পাঁচটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তেরোটি দাঁড়ায়। তাদের নাম ও পরিচয় নিচে দেওয়া হল :—

১। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পুনাতে শেঠ নাথুভাই দামোদর থ্যাকার্সি (সংক্ষেপে S. N. D. T.) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি ভারতে মহিলাদের জন্য প্রথম ও একমাত্র পৃথক বিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি আইনে স্বীকৃত নয় বলে এর উপাধি অন্যত্র উচ্চতর পাঠের জন্য গৃহীত হয় না।

২। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মভারের অনেকটা লাঘব করে। এটি 'এফিলিয়েটিং' শ্রেণির এবং ভারতীয় করদরাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নূতন স্থাপিত (১৯১২) বিহার-উড়িষ্যা-প্রদেশের প্রাদেশিক শিক্ষাশীর্ষরূপে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর মূল কাঠাম পুরাতন রীতির হলেও কতকগুলি নূতনত্বও ছিল।

৪। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যে 'ওসমানিয়া' বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। করদরাজ্যসমূহের মধ্যে এটি দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংরেজির পরিবর্তে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এর বিশেষত্ব ছিল।

৫। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কীর্তিস্বরূপ বেনারসের

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—এটি ভারতের প্রথম কেন্দ্রশাসিত, ঐকিক, আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক এবং ধর্মসম্পৃক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য প্রথম ধর্মসম্পৃক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 'আলিগড় মুসলিম য়ুনিভার্সিটি' স্থাপিত হয়। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত নূতন গঠনরীতির বিশ্ববিদ্যালয়—স্যর সৈয়দ আহমদের 'মোহামেডান এংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের' থেকে এর উৎপত্তি হয়।

৭। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার ঐকিক, আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে পূর্ববংগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানসমাজের চাহিদা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়েছিল।

৮। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গঠনপদ্ধতি নিয়ে লক্ষ্মৌয়ের আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ভিন্ন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে ঐকিক হ'তে পারেনি কেননা এর সংশ্লিষ্ট কতকগুলি স্বাধীন কলেজ ছিল কিন্তু সেগুলির সংগে সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতর করে' তাদের সংশ্লিষ্ট (affiliated) না বলে' সংযোজিত (associated) বলে' অভিহিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থিত কলেজগুলির ভার লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়।

এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে "ওরিয়েন্টাল" ও "ল" কলেজের জন্য বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া ভিন্ন সরকার অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করতেন না। তখনকার দিনে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির বিশেষ প্রয়োজনও ছিলনা, পরীক্ষা পরিচলেনার জন্য একটি ছোট আফিস ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের ছিলনা। "ফেলোরা" নিজেদের খরচায় যাতায়াত করতেন বলে' "সেনেট সিণ্ডিকেটের" বৈঠকের জন্যও অর্থ ব্যয় হ'ত না। পরীক্ষার "ফি" থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ মিটে বরংচ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকতো।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইন প্রণয়নের পর সিণ্ডিকেটের বৈঠক বেশি ঘনঘন হতে থাকে বলে ফেলোদের যাতায়াতের খরচ দিতে হয় এবং কলেজগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থার জন্য নোতুন নোতুন কর্মচারীর নিয়োগ আবশ্যক হয়। ফলত সরকার প্রত্যেক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষার জন্য যে পাঁচ

লক্ষ টাকা দিতে আরম্ভ করেন তার প্রথম পাঁচ বৎসরের পঁচিশ লক্ষ টাকার মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যবস্থাপন, পরিদর্শন, জমি খরিদ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ও ১৩½ লক্ষ টাকা কলেজের উন্নতির জন্য প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে ওই বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে ১,৩৫,০০০৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ষোলো হাজার টাকা এককালীন দান ও ২,৫৫,০০০৲ টাকার বার্ষিক সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বরাদ্দ হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ ৩,৯০,০০০৲ টাকায় দাঁড়ায় ও তারমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পায় বাইশ লক্ষ টাকা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপভাবে বর্ধিত সাহায্য দেওয়া হতে থাকে।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত সমগ্র বার্ষিক সরকার সাহায্য ছিল ২০,৫৪,৪৭৪৲ টাকা তারমধ্যে বাংলাদেশে ৮,৬৫,১৩২৲। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদয়িক ব্যয় ছিল সমগ্র ভারতে ৭৪,১৩,১২৪ আর বাংলাদেশে ২৫,১৭,৮৯৲ টাকা।

সরকারের বর্ধিত সাহায্যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের স্থাপন, বর্ধন প্রভৃতি এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। ১৯১২ সালে ১৩টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছয়টি বিশুদ্ধভাবে শিক্ষণরত ছিল এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয় প্রকারের মিশ্রণ হয়েছিল। বাদবাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য ছিল "এফিলিয়েশন" এবং তার সংগে শিক্ষাকার্যেরও কিছু কিছু সন্নিবেশ হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের কলা ও বিজ্ঞানশিক্ষার "কাউন্সিলের" অধীনে ওই স্তরের অধ্যাপনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং কেবল মফঃস্বলের দুয়েকটি কলেজ ভিন্ন এর এলাকায় অন্য কোথাও এই স্তরের শিক্ষা দেওয়া হ'তনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং এই পাঁচটি অংগ বা "ফ্যাকাল্টি" ছিল আর ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি অংগ ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি বাড়ানো হলেও সরকারি প্রচেষ্টা ও সাধারণ্যের উদ্যোগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের ইচ্ছা দেখা যায়। শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থের অপ্রাচুর্যের জন্যই সরকারকে

অনেকাংশে ওই সামঞ্জস্যের চেষ্টা করতে হত। অপরপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষারূপে সম্পূর্ণতর করা ইচ্ছাও আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতাসাধন, মানোন্নয়ন ও সুনিয়ন্ত্রণের জন্য তাকে "ইন্টারমিডিয়েট স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করবার এবং তার জন্য বিশেষ বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্র ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের রিপোর্টে করা হয়েছিল। তদনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে বোর্ডের স্থাপন হয় কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তীব্র বিরোধিতার ফলে তার এলাকার মধ্যে ওই প্রস্তাবকে বলবৎ করা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি মানোন্নয়নের দিকে থাকলেও এই সময়ে শিক্ষার অন্যান্য বিভাগের মতো মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বহুল বিস্তারও ঘটেছিল। ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন কোষ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রদত্ত সমগ্র অর্থের পরিমাণ ছিল ১,২২,৫০,০০০৲ আর ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ৪,৮৭,২৭০০০ টাকা অর্থাৎ কুড়ি বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় সাড়ে তিন কোটি টাকার চেয়েও বেশি বেড়েছিল।

১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫২,৫২৪ জন ছাত্র পড়তো আর সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পড়তো ২,৯৯,১১২। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রপ্রতি ব্যয় ছিল ১২৲ টাকা আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৪৲। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একেক বিদ্যালয়ে গড়পড়তা ১৩৬ জন ছাত্র পড়তো আর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৮২ জন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছেলেদের সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ছিল ২৩৭টি আর মেয়েদের ২০টি। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ৫৪২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ১,১৩,০৭২ আর ৪৭১১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে—৬,৩৮,৮১১ জন ছিল। ছাত্রপ্রতি গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যয় ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫৪৲ আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১৩৲। তাছাড়া যারা মোটেই সাহায্য পেতনা এমন বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১,৮১,৩৯৩ জন ছাত্র পড়তো।

উচ্চশিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষাতেও সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অধিক ব্যয়ে কমসংখ্যক ছাত্র পড়তো। এইজন্য ওই দুই প্রকারের বিদ্যালয়ের মধ্যে রেষারেষির ভাব ছিল। সাধারণ্যের ধারণা হয়েছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই তাদের উদ্যোগ যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাচ্ছিল না এবং একটা দাবীও উত্থিত হয়েছিল যে সরকারের হাতে কেবল বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থাকবে আর সাধারণ শিক্ষার উচ্চবিদ্যালয়গুলি থাকবে জনসাধারণের হাতে।

বাস্তবিকই মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও প্রসার দুই দিকেই উন্নতি হলেও শিক্ষা তেমনই সংকীর্ণ ও সাহিত্যিক থেকে যাচ্ছিল, পরীক্ষা ও মুখস্থবিদ্যার আধিপত্য অব্যাহত ছিল। বৃত্তিশিক্ষাপ্রসংগের প্রথম আভাস ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের "প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী" শিক্ষার উল্লেখে পাওয়া যায়। তারপর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার দুই শাখা স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে ওই প্রস্তাব কার্যক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেনি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত একটি "ছাড়পত্রের" প্রস্তাব করে এরূপ পাঠ্যক্রম চাওয়া হয়েছিল যা প্রবেশিকা পরীক্ষার মতো সংকীর্ণভাবে সাহিত্যিক হবে না। তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশে "স্কুলত্যাগ" পরীক্ষার সাফল্যের উল্লেখ করে' ওই ব্যবস্থার বিস্তারের প্রস্তাব করা হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় শাখার ওই সাফল্য কেবল বাহ্যিক ছিল।

বাংলাদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্তবর্তী "এ", "বি" ও "সি-কোর্সের" উল্লেখ আগে করা হয়েছে, কিন্তু তারদ্বারা শিক্ষার সাহিত্যিকতা কিছুটা হ্রাস পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়মুখিনতা কমিয়ে শিক্ষাবৈচিত্র্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি।

মাদ্রাজে যে দ্বিতীয় শাখার ব্যবস্থা হয় তাতে বহিরাগত পরীক্ষার বদলে স্কুল-ত্যাগের জন্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ছাড়পত্র গৃহীত হ'ত। পাঠ্যবিষয়গুলিকে "এ", "বি" ও "সি" এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল। "এ" বিভাগে ইংরেজি, মাতৃভাষা ও অংক, "বি" বিভাগে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অংকন, ব্যায়াম, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সেলাই প্রভৃতি এবং "সি" বিভাগে বিচিত্র বৃত্তি ও জ্ঞানমূলক বিষয় ছিল। কোনো বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হ'তনা, পঠনকালের মান পূর্ণ হ'লে ছাড়পত্র দেওয়া হ'ত। সাধারণ বিদ্যালয়গুলি "সি" বিভাগের বৃত্তিমুখী বিষয়গুলির পড়াবার ব্যবস্থা না করে' "বি" বিভাগের সাহিত্য ও জ্ঞানমুখী বিষয়গুলির সহায়তায় ছাড়পত্র দিত—তাতে মাধ্যমিকশিক্ষার দ্বিধাবিভক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল "ম্যাট্রিক" পরীক্ষা এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হবার সহজ পন্থারূপে এই ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

যুক্তপ্রদেশে চারটি বাধ্যতামূলক ও সাতটি বৈকল্পিক বিষয় নিয়ে যে স্কুলত্যাগ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তাও ওই একই দোষে দুষ্ট হয়েছিল।

বোম্বাইয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা কেবল সরকারি চাকরির জন্য স্বীকৃত ছিল আর তাতে বিষয়বিকল্প কম ছিল বলে' ওই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে এই ব্যবস্থা আংশিক পরিবর্তনমাত্র করে' অনুমোদিত হওয়ায় তার পরের কয় বৎসরে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি, —কেবল বিজ্ঞানশিক্ষার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। তাছাড়া একালের রাজনৈতিক অশান্তি, মহাযুদ্ধের সংকট ও তারপরের রাষ্ট্রীয় সংস্কার ব্যবস্থার ওলটপালট প্রভৃতির মিলিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্যের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই স্তরের শিক্ষার অতি দ্রুত বিস্তারের ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই ইংরেজির মানের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে এই অবনতির দিকে লক্ষ্য করে' ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভকাল একটু বড় বয়স পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা এবং ইংরেজির শিক্ষণে ইংরেজ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রবর্তন হয় এবং নিচের শ্রেণিতে ইংরেজি শিক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হ'তে থাকে। পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হবে কিনা, পরীক্ষাপাশের মান আরো উঁচু করে' দেওয়া উচিত কিনা প্রভৃতি নানা আলোচনা এই সময়ে চলতে থাকে। তথাপি ১৯০২-২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরীক্ষাফলে ইংরেজিশিক্ষার উন্নতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বস্তুত তখনকার শিক্ষাকর্তারা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজের অনেকদূর পর্যন্ত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিদেশি-ভাষার মাধ্যমে তাকে সফল করার সম্ভাবনা তো ছিলোই না, বরংচ সেই অপচেষ্টায় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার হানি হচ্ছিল ও মুখস্থবিদ্যার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

অন্যদিকে ইংরেজিশিক্ষার অতিরিক্ত প্রধান্যের তলায় মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রশ্ন চাপা পড়ে' গেছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে মধ্যশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার উপযোগিতার উল্লেখ করা হলেও সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষাবাহন ও উচ্চশিক্ষাকে ইংরেজিবাহন করার সুপারিশ থাকলেও কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা মাতৃভাষাকে গৌরবস্থলে স্থাপিত করতে চাইলেও জনসাধারণের অধিকাংশ ইংরেজির মোহে অন্ধ ছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ দিল্লীর ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে মিঃ এস রায়নিংগার মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করে' ইংরেজিকে আবশ্যিক জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণের উদ্দেশ্যসম্বলিত একটি প্রস্তাব আনেন। এতে ইংরেজি-

ভাষার মানের অবনতি ঘটবে, মাতৃভাষার পরিভাষা ও সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব, অতগুলি দেশজ ভাষার ব্যবহারে শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি ও জাতীয় ঐক্যের হানি ঘটবে প্রভৃতি নানা যুক্তিদ্বারা এই প্রস্তাবের বিরোধী সমালোচনা হয়। স্যর হারকোর্ট বাট্‌লার মাতৃভাষাবাহনে শিক্ষিত ছেলেদের বুদ্ধিবিকাশ সহজতর হয় বলে স্বীকার করলেও এবিষয়ে কোনো সাহায্য করেননি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমসফোর্ড মাতৃভাষাবাহনের প্রযোজ্যতা বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ (পরে স্যর) শংকরণ নায়রের সভাপতিত্বে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এই বৈঠকে কোনো সমাধান হয়নি বলে' ব্যাপারটি যেমন ছিল তেমনই চলতে থাকে।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবংগের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা মাতৃভাষা-মাধ্যমে ছিল—সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজিশিক্ষা আরম্ভ হ'ত আর উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি থেকে ইংরেজিভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হ'ত। পূর্ববংগেও এই ব্যবস্থাই ছিল, কেবল শ্রেণিগুলির সংখ্যাও আজকালকার মতো ছিল, অর্থাৎ, চতুর্থ শ্রেণি থেকে ইংরেজি আরম্ভ হয়ে সপ্তম শ্রেণিতে মাধ্যমরূপে গৃহীত হ'ত।

মাধ্যমিক শিক্ষার একটি প্রধান অসুবিধা ছিল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষাংশ থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছিল এবং ভারতে খানিকটা তার প্রভাবে, খানিকটা নিজ অভিজ্ঞতায় এই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৮৫৪ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিভাবে শিক্ষণ-শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের রচনার সময়ে মাদ্রাজ, কার্সিয়াং এলাহাবাদ, লাহোর ও জব্বলপুরে একটি করে' উচ্চবিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষকের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ওই পত্রে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে' অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ট্রেনিং কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনসম্পর্কে বলা হয় যে সেখানে সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগের কর্মচারিগণ (I.E.S.) পড়াবেন এবং গ্রাজুয়েটদের জন্য এক বৎসরের ও তন্নিম্ন স্তরের শিক্ষিতদের জন্য দুই বৎসরের শিক্ষণশিক্ষার ব্যবস্থা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরীক্ষা নিয়ে ডিগ্রী দেবে। শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষা ও শিক্ষার অভ্যাস অংগাংগিভাবে জড়িত হবে এবং শিক্ষণের অভ্যাসের জন্য শিক্ষকশিক্ষণালয়সংস্পৃক্ত বিদ্যালয় থাকবে। শিক্ষকেরা ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষকশিক্ষণালয়ের প্রভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে সেজন্য শিক্ষণালয় ও বিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকবে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১২টি শিক্ষকশিক্ষণালয় ছিল এবং সেখানে ৫৫২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রে, যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'তে পারে সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষণালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষণালয়ের সংখ্যা ২০টি দাঁড়ায় আর ছাত্র সংখ্যা—১৪৪৩। ওই খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে বলা হয় যে তখন যুক্তপ্রদেশ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও বাংলাদেশ সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ ছিল। বাংলাদেশের এংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলের ১২,৯০৬ শিক্ষকদের মধ্যে ৩৩৯২ জন গ্রাজুয়েট ও ৩৫৭ জন শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। আর ভার্ণাকুলার স্কুলের শিক্ষকদের ৭.৪৮% শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা

লর্ড কার্জনের প্রণীত নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল তার কথা আগে বলা হয়েছে। প্রসার-বনাম-মানোন্নয়নের দ্বন্দ্বের মধ্যে লর্ড কার্জন সামঞ্জস্যসাধন করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যেখানে চল্লিশ লক্ষের কিছু কম প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সেখানে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের মধ্যে ১২.৩% উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা পর্যন্ত পৌঁছত আর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১২.৫%। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হ'ত সেটা নিম্নলিখিত অনুপাতে বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া যেত—

সরকারি ভাণ্ডার	৬৫·৬%
বেতন	২২·৮%
ব্যক্তিগত দান	১১·৬%

ছাত্রপ্রতি গড়পড়তা বেতন ছিল সাড়ে চৌদ্দ আনা। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে জনসংখ্যার মাত্র ৬% সাক্ষর ছিল, বিদ্যালয় বয়সী বালকদের মধ্যে ২৩·৮% আর বালিকাদের মধ্যে ২·৭% প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছিল। গড়পড়তা প্রতি বর্গমাইলে একটি করে' প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং প্রতি বিদ্যালয়ে ৪৩ জন ছাত্র পড়তো।

এই বৃদ্ধি যে যথেষ্ট নয় তা বলা বাহুল্য। এইজন্য এই সময়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদার গায়কোয়াড় তাঁর রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বৃটিশ ভারতে মহামতি

গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই দাবী প্রথম উত্থাপিত করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বলেছিলেন যে যে-জাতি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত সে জাতি জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তিনি দিল্লীর ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আনেন—

—"এই সভা প্রস্তাব করছে যে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং তার উপায়সমূহের প্রণয়নের জন্য সত্বর সরকারি ও বেসরকারি সভ্যসমন্বিত একটি কমিশন গঠিত হোক।"

গোখলে চেয়েছিলেন যে ভারতে ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনের মতো কোনো আইন প্রণীত হোক এবং সে বিষয়ে একটি পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন।

প্রথমত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ শিক্ষাবিভাগের স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তার অধিকর্তা হবেন একজন "সেক্রেটারি" এবং তাঁর কর্তব্য হবে প্রধানত দেশময় স্বাক্ষরতার ব্যবস্থা করা।

তারপর সুপারিশ করেন যে যে-যে অঞ্চলে ছেলেদের মধ্যে ৩৩% জন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে সেই সেই অঞ্চলেই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স হবে ছয় থেকে এগারো বৎসর পর্যন্ত।

আর্থিক ব্যবস্থায় জন্য তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ব্যয়ভার আধা-আধি ভাগ করে নিতে বলেন।

তিনি আরো বলেন যে সরকার রেলওয়ে প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগের মতো শিক্ষার জন্যও একটি সাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে তার পরিপূরণ করবেন এবং প্রত্যেক বছরে বাজেটের সময়ে শিক্ষাপরিণতি সম্বন্ধীয় বিবৃতি দেওয়া হবে।

প্রস্তাবটির আলোচনার আগেই সরকার মিঃ গোখলেকে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি সেটি প্রত্যাহার করেন। তারপর তার কিয়দংশ অতি সত্বর কাজে পরিণত করা হয়, যথা ওই বৎসরই ভারতসরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয় এবং পরবৎসর থেকে প্রতিবৎসরের বাজেটের সংগে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবৃতি দেওয়া হতে থাকে। অপরপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট বর্ধিত সাহায্যের সুপারিশ করে' প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ্য উপায়ের অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার নিরস্ত হন।

এই সামান্য ব্যবস্থায় দেশবাসী সন্তুষ্ট হয়নি এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই

মার্চ মিঃ গোখলে আবার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের জন্য একটি "বিল" আনেন দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমিক প্রবর্তন তার উদ্দেশ্য ছিল এবং ভূমিকায় এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ইংলণ্ড প্রমুখ প্রগতিশীল দেশের উদাহরণ দিয়ে বলা হয় যে আবশ্যিকতা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হ'তে পারে না। অথচ ওই বিলের প্রকৃতি কেবল সম্মতিসূচক ছিল। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলাবোর্ডগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য অনুমতিমাত্র দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল। সামর্থ্যবোধে প্রাথমিক সরকারের অনুমতি নিয়ে এবং শিক্ষার মান ও প্রসার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে নিজের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার অধিকার স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে চাওয়া হয়েছিল। এই বিলে প্রথমে কেবল ছয় থেকে দশ বৎসর বয়সের ছেলেদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চাওয়া হয়েছিল।

কোন্ অঞ্চলে এবং কি প্রকারে প্রাথমিক শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে সেই বিষয়েও পূর্বের বিলেরই অনুরূপ কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যথা—

১। যে অঞ্চলে ৩৩%জন বালক শিক্ষা পাচ্ছে সেই অঞ্চলের ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক প্রত্যেক ছেলের অভিভাবককে কোনো স্বীকৃত বিদ্যালয়ে তার ছেলেকে ভর্তি করতে বাধ্য করা হবে এবং সেই নিয়ম ক্রমশ মেয়েদের ওপরও বিস্তারিত হবে।

২। যে সব অভিভাবকের মাসিক আয় দশটাকা বা তার নিচে তাদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হবে না।

৩। বাধ্যতা থেকে ছাড়া পাওয়ার কতকগুলি সূত্র বিলের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছেলেকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর অনুমতি পাওয়া যেত।

৪। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর আর ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক 'স্কুল-কমিটির' স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

ওপরের সূত্রগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে বিলটির প্রকৃতি অত্যন্ত মৃদু ছিল। প্রথমতঃ এতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকারের উপর দিতে চাওয়ার পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর রাখতে চাওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ তাদের পক্ষেও ওই দায়িত্ব আবশ্যিক করতে চাওয়া হয়নি।

তৃতীয়তঃ প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ের অর্ধাংশমাত্র সরকারকে দিতে চাওয়া হয়েছিল।

চতুর্থতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক করতে চাওয়া হয়নি।

এই বিলটিকে গোখলে ১৫ জন সভ্যসমন্বিত একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরকারি অনুমতি পাননি।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বিলটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্থাপিত হয়। আলোচনার সময়ে গোখলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে মূর্খতার রাজত্ব চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা বলে' এবং নিজের প্রস্তাবকে নূতন গতির দিকে প্রথম পদক্ষেপের প্রারম্ভমাত্র বলে' বর্ণনা করে' বলেছিলেন যে এরপর থেকে ক্রমে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আদর্শের সংগে দেশের লোকের পরিচয় ঘটবে।

স্যর হারকোর্ট বাটলার বলেন যে বিলটির দাবী এত কম যে সেটি আইনে পরিণত হ লেও তারদ্বারা কোনো কাজ হতে পারবে না। তথাপি তিনি সরকারি নীতির মুখপাত্ররূপে বিলটির বিরোধিতা করেন, দেশী রাজ্য বরোদা বা অগ্রগমনশীল পাশ্চাত্ত্য দেশের উদাহরণ অগ্রাহ্য করে' বলেন যে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্যপ্রকার।

বিলটির বিরোধী যুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ছিল :—

প্রথমতঃ স্বেচ্ছাভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তখনও প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এবং তা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনের সহায়তা নেওয়া অনুচিত।

দ্বিতীয়তঃ—দেশের লোকের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা তখনও দেখা যায় নি।

তৃতীয়তঃ—প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য যে বিরাট ব্যবস্থাপন-যন্ত্রের প্রয়োজন তার সৃষ্টি ও পরিচালনা সরকারের পক্ষে সহসা সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ—দেশবাসীর একাংশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী।

সরকারি কর্মচারী ও জমিদার শ্রেণির লোকেরা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ ওই বিলের বিরোধী ছিলেন এবং আইনসভার সদস্যদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাধিক্য থাকায় গোখলের বিল ১৮-৩৮ ভোটে পরাজিত হয়।

গোখলের বিল পরাজিত হ লেও সরকার দেশের লোকের দাবী সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনোপলক্ষ্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত স্বাগত পত্রের উত্তরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর ইচ্ছা যে সমস্ত দেশকে স্কুল-কলেজের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন করা হয় যাতে বিশ্বস্ত, বীর্যবান ও কর্মক্ষম নাগরিক সৃষ্টি হ'তে পারে এবং তারা শিল্পবাণিজ্যকৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করতে পারে। ঘরে ঘরে শিক্ষার ব্যাপ্তি দ্বারা সমাজজীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে দেওয়ার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

তারপর সেই বৎসরের ৩০শে জুলাই বিলেতে হাউস অব কমন্সে ভারতীয় বাজেটের আলোচনাপ্রসংগে শিক্ষার যে হিসাব দেওয়া হয় তাতে জনসংখ্যার ১৫% অংশকে বিদ্যালয়বয়সী বলে' বলা হয়েছিল যে তার মধ্য থেকে ৪% ছেলে ও ০·৭% মেয়ে তখন স্কুলের শিক্ষা পাচ্ছিল। সংগে সংগে স্কুলের সংখ্যার বহুল বৃদ্ধি ও সাহায্যবৃদ্ধিদ্বারা বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল।

তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে যে ব্যাপক নির্দেশ দেওয়া হয় তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

ওই পত্রের প্রকাশের কয়েক বৎসর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার আইনের প্রণয়ন হ'তে থাকে। বাংলাদেশের আইনটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়েছিল। এই আইনে প্রথমে কেবল নাগরিক অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার কথা ছিল। তারপরের বৎসর আইনটির সংশোধন দ্বারা নূতনসৃষ্ট য়ুনিয়ন-বোর্ডগুলির অধীনে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাও তার এলাকাভুক্ত করার চেষ্টা হয়, কিন্তু তখনও বিশুদ্ধভাবে গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রস্তাব হয়নি।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মূল কথাগুলি প্রায় সমান ছিল। এগুলির দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয় (তুঃ—১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের সুপারিশ) এবং যথাক্রমে জিলা, মিউনিসিপ্যালিটি, য়ুনিয়ন প্রভৃতির বোর্ডের জিলা, মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসিপাল য়ুনিয়ন প্রভৃতি "স্কুল-কমিটির" স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ও তার ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর নেওয়ার অধিকার তাদের দেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ছয় থেকে দশবৎসর পর্যন্ত ধার্য হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক করার উদ্দেশ্যে বর্ধিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা হয়। প্রথমে কেবল ছেলেদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ

দেওয়া হয় কিন্তু তার মধ্যেও অনেক ছিদ্র ছিল। উপরন্তু কোনো স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিক্ষাকর নিয়ে জনপ্রিয়তা তথা পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা নষ্ট করতে চাননি বলে' দেশের প্রায় কোনো অঞ্চলেই ওই শিথিল বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়নি।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩,৩৭,৬৭০০০ আর বাংলার ৪,৬৬,৯৬০০০। সারা ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৩,১০,৪৫১ আর বাংলার ১৪,৩৬,০০০। ভারতের জনসংখ্যার ২·৬% আর বাংলার ৩·১% বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছিল। বাংলাদেশের সাক্ষরতার অনুপাত ছিল ৯%—ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৮৯২ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় পুরুষদের সাক্ষরতা ১৩% থেকে ১৪·৪% হয়েছিল, অর্থাৎ মাত্র ১·৪% বেড়েছিল আর মেয়েদের ০·৭% থেকে ২% হয়েছিল, অর্থাৎ মাত্র ১·৩% বেড়েছিল। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়ে ভারতের সাক্ষরতা ছিল ৭%। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জনশিক্ষার এই অংকগুলির সংগে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মিঃ এডামের হিসাবের তুলনা করলে বোঝা যাবে যে অনেক ব্যয়বৃদ্ধি, অনেক বিদ্যালয়ের স্থাপন হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। এরূপ হওয়ার মুখ্য কারণ এই যে একদিকে সরকারি নূতন ব্যবস্থার প্রসারের সংগে সংগে অন্যদিকে দেশজ পুরাতন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হয়ে চলেছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের প্রকাশের পর শিক্ষাপ্রসারের যে চেষ্টা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে বোর্ডস্কুলে পরিণত করা এবং যে স্কুলগুলি সাহায্য পাচ্ছিল না তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত করা। বোর্ডস্কুলগুলি বেশি উচ্চমানের ও নির্ভরযোগ্য ছিল বলে' জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় বোর্ডস্কুল প্রায় স্থাপিত হয়নি বল্লেই হয়। বাংলার সরকার "পঞ্চায়তি য়ুনিয়ন স্কীম" অনুসারে "মডেল স্কুল" স্থাপিত করতে থাকেন। ওই "স্কীম" অনুসারে গড়পড়তা প্রতি ১০·৪ বর্গমাইলে একটি করে তিন শ্রেণি সমন্বিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে তার পরিচালনার ভার জিলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হচ্ছিল; কিন্তু শিক্ষকদের বেতনের অল্পতা, পাঠক্রমের ত্রুটিপূর্ণতা, শৃংখলার অভাব, শিক্ষাক্রমের অপূর্ণতা (মাত্র তিনটি শ্রেণি) প্রভৃতি দোষে এই শিক্ষা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারপ্রান্তে এলেও তাকে গ্রহণ করবার উৎসাহ দেশের লোকের ছিল না।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মোটমাট দেশের প্রতি ৮·৩ বর্গমাইলের মধ্যে একেকটি

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও স্কুলবয়সী ছেলেদের (পূর্ণ জনসংখ্যার ১৫%) মধ্যে শতকরা তিনজনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ নিচ্ছিলনা। ১৯১২-১৭ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবর্ষে পূর্ণ জনসংখ্যার ৪% সাক্ষর ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ত্রিশলক্ষ টাকার বার্ষিক সাহায্য বরাদ্দ করে' দিয়ে স্বকীয় পরিকল্পনা তৈয়ারি করতে বলেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একতৃতীয়াংশের হারে বিভক্ত হবে এমন আভাসও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সময়ে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারের হুজুগে ওই পরিকল্পনাটি মুলতুবি রয়ে যায়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার যে উন্নতি হয় তাতে দেখা যায় যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একেকটি বিদ্যালয়ের ব্যয় ছিল ১৩৩৲, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৲ হয়েছিল। একেকটি ছেলের শিক্ষার খরচ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৩·৯ টাকা আর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পাঁচটাকা ছিল। এই বর্ধিত ব্যয়ের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার বহন করছিলেন কিন্তু শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়ন যে সেই অনুপাতে হয়নি এবং কেন হয়নি তা আগেই বলা হয়েছে।

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মাধ্যমিক শিক্ষার মতো প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রধান দুর্বলতার কারণ ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে বোম্বাই ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অতি সামান্যভাবে ভিন্ন অন্য কোথাও এই ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পত্রে নর্মালস্কুলসম্বন্ধীয় নির্দেশপ্রসংগে বলা হয় যে সেই সময়ে বাংলাদেশে চারটি নর্মালস্কুলে ২৫৮ জন শিক্ষক শিক্ষা পাচ্ছিল এবং উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়েও শিক্ষকশিক্ষণের কিছু কিছু ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বর্মাসমেত বৃটিশ ভারতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য ৯২২টি স্কুলে ২২,৭৭৪ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ১৪৮টি স্কুলে ৪১৫৭ শিক্ষার্থিনী ছিল। এই সময়কার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে ৬৭,৬১৩ জন (৩৮%) শিক্ষণশিক্ষিত ছিল।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নর্মাল ও ট্রেনিং স্কুল সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান খুব নিচু ছিল বলে' শিক্ষণ-শিক্ষার মধ্যে বিষয়শিক্ষার অংশই প্রধান ছিল। গুরুট্রেনিং স্কুলে এক বছরের

মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক বা মধ্যভার্নাকুলার পরীক্ষার পড়া ও সামান্য কিছু শিক্ষা দ্রুত শিখিয়ে দেওয়া হত। ১৯১৭-২২ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তাদের ওই শিক্ষাও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে নিম্নমানের ছিল।

উপসংহার

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের যে অধ্যায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডিসপ্যাচের পর থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল পরিষদের ভারতীয় মন্ত্রিগণের নিকট শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব হস্তান্তরকরণের সংগে।

১৮৫৫ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাপরিণতির একটি সাধারণ ধারণা নিম্নলিখিত অংকগুলি থেকে করা যাবে—

	১৮৫৫ খৃঃ	১৯২১-২২ খৃঃ
বিশ্ববিদ্যালয়	...	১৩
সাধারণ শিক্ষার কলেজ	২১	১৬৭
বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান (নর্মাল স্কুল বাদে)	১৩	৫২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮১	৫৩৬৪
প্রাথমিক "	২৮১০	১৬০০৭২
বিশেষ "	৭	৩৩৪৪

এক শতাব্দির মধ্যে শিক্ষার ব্যয় একলক্ষ (১৮২১) থেকে বেড়ে ৯০২ লক্ষ টাকা হয়েছিল কিন্তু স্বাক্ষরতার অনুপাত সেই অনুসারে বাড়েনি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষার অপচয়, নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কারণে বর্ধিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেকটাই প্রাথমিক স্তরে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এযুগের শেষের দিকে বাধা ঘটিয়েছিল এবং তার ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে নির্দেশিত সংস্কারসমূহের প্রবর্তনেও বাধা ঘটে। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইনদ্বারা যে নবযুগের স্থচনা হয় তারদ্বারাও তার অব্যবহিত পূর্বে গৃহীত পরিকল্পনাগুলির রদবদল হয়েছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নূতন ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। সে ব্যবস্থার অধীনে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় রাজগণের বিশেষ শিক্ষায়তনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রইলো এবং এংলো ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়দের শিক্ষাব্যবস্থা সংরক্ষিত বিষয়রূপে গণ্য হ'ল। তাছাড়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির এলাকানির্ণয় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব এবং বিশেষ অবস্থারূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে শিক্ষার বাকী সমগ্র ভার হস্তান্তরিত বিষয়রূপে মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত হ'ল।

১৯২১-১৯৩৭

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শাসনসংস্কারে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা "ডায়ার্কি" বা দ্বৈতশাসনরূপে খ্যাত। এই ব্যবস্থায় শাসনসংক্রান্ত বিষয়সমূহকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। দুই অংশেরই শীর্ষে ছিলেন প্রাদেশিক লাটসাহেব। তিনি তাঁর পরিষদের সহায়তায় সংরক্ষিত এবং মন্ত্রিগণের সহায়তায় হস্তান্তরিত বিষয়ের ব্যবস্থাপন করতেন। সংরক্ষিত বিষয়ের জন্য সপার্ষদ লাটসাহেব ইংলণ্ডের ভারতরাষ্ট্রসচীবের কাছে দায়ী থাকতেন। মন্ত্রিগণ নির্বাচিত আইনসভার সভ্যদের মধ্য থেকে সরকারকর্তৃক মনোনীত হতেন এবং হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্য তাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকতেন। বিষয় ও দায়িত্বের এই দ্বিধাবিভক্তির জন্য দ্বৈতশাসন নামের উদ্ভব হয়েছিল।

এই অভিনব ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রিগণ হস্তান্তরিত বিষয়রূপে শিক্ষার দায়িত্ব পেয়েছিলেন, কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁদের সম্পূর্ণ ছিল না। য়ুরোপীয়দের শিক্ষা সংরক্ষিত বিষয় ছিল এবং কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলের শিক্ষার (যথা—বাংলাদেশে দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা) দায়িত্ব লাটপরিষদের সভ্যের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। তাছাড়া শিক্ষাবিভাগের বড় বড় অফিসরদের নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ-ক্ষমতা মন্ত্রিগণের হাতে ছিল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের অধিকাংশ প্রধান পদে "আই-ই-এস" শ্রেণির কর্মচারিরা স্থাপিত ছিলেন, তাঁদের স্বার্থ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংরক্ষিত থাকায় মন্ত্রিগণের ও দেশবাসীর আস্থা তাঁদের উপর ছিল না এবং তাঁরাও মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না। ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে 'আই-ই-এস' পদে কর্মচারিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু যাঁরা তখন ওইসব পদে প্রতিষ্ঠিত রইলেন তাঁদের ওপর মন্ত্রিগণের নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা হয় না। নূতন ব্যবস্থার তৃতীয় অসুবিধা ছিল যে 'অর্থ' সংরক্ষিত বিষয়রূপে থাকায় শিক্ষাখাতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যের ব্যবস্থা করা মন্ত্রিগণের পক্ষে সম্ভব হ'তনা।

অপরপক্ষে শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের অধিকারভুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বভারতীয় পরিণতির সম্ভাবনা নষ্ট হ'ল, প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভাবে পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্যমের

অপচয় হ'তে লাগলো—সর্বভারতীয় সমস্যাসমূহের একীকৃত সমাধানের উপায় রইলো না।

যে সময়ে ভারতীয় মন্ত্রিগণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতির মহামারী আন্তর্জাতিক অর্থসংকট এবং দেশব্যাপী রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ মিলিয়ে তাঁদের কাজ কঠিনতর করেছিল ; আবার তারই পাশাপাশি জাতীয় চেতনাসঞ্জাত নবজাগরণেরও সূচনা হয়েছিল। বাংলা-দেশে দ্বৈতশাসনবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে ছায়াপাত করেছিল। বাংলাদেশে শিক্ষার পরিণতি অতি নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও মন্ত্রিত্বের অব্যবস্থিতি মিলিয়ে এই পোনেরো বৎসরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধোগতিও ঘটেছিল।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যয় ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের ১০২ লক্ষ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ১৩৬১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, তারপর হ্রাসবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের শিক্ষার ব্যয় হয় ১২৩৬ লক্ষ টাকা। বাংলা দেশের শিক্ষার ব্যয় এই সময়ে ক্রমান্বয়ে কমে চলেছিল, যথা—

১৯২৭—১,৪৭,৯৪,৬৮৬ টাকা।
১৯৩২—১,৪৪,৪৬,৮৮১ " ।
১৯৩৭—১,৪১,১২,৪১৭ " ।

অন্যান্য স্থান থেকে লব্ধ অর্থের তুলনায় সরকারের প্রদত্ত অর্থের অনুপাতও কমে আসছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সেখানে সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয়ের ৪০·৬% অংশ বহন করতেন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে বহন করতেন ৩১% অংশ। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের অংশ সর্বভারতীয় অনুপাতের থেকেও কম ছিল, উপরন্তু ওই সংকুচিত ব্যয়ের মধ্যে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সময়ে সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের পরিণতির একটা সাংখ্যিক চিত্র দেওয়া হল :—

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১৪	১৬
সাধারণ শিক্ষার কলেজ	১৬৭	১৬৭

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বৃত্তিশিক্ষার কলেজ	৬৪	৭৫
মাধ্যমিক বিঃ (উচ্চ ও মধ্য)	৭,৫৩০	১৩,০৫৬
প্রাথমিক বিঃ	১,৬০,০৭২	১,৯৭,২২৭
প্রাথমিক বিঃ (অস্বীকৃত)	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭
বিশেষ বিঃ	৩,৩৪৪	৫,৬৭৭

এই সময়ে বাংলাদেশের পরিণতি নিম্নলিখিত প্রকারের হয়েছিল :—

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	২	২
সাধারণ কলেজ	৩৬	৫০
বৃত্তিশিক্ষার "	১০	১৮
মাধ্যমিক বিঃ	২,৬৭৮	৩,২৯১
প্রাথমিক "	৫৭,৭৮৩	৬১,৫১৭
বিশেষ "	১,৪২০	২,৬৪০
অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান	১,৮৪০	১,৩০৭

এই অংকগুলি থেকে বোঝা যায় যে সরকারি ব্যয়ের হার কমা সত্ত্বেও শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ওই বৃদ্ধির অধিকাংশ ব্যয় বহন করছিল দেশের লোক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষার ব্যয়ের প্রায় ৬০% অংশ বেতন, স্বায়ত্তশাসনভাণ্ডার ও সাধারণ্যের দান থেকে নির্বাহিত হচ্ছিল।

এই সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষ দুরবস্থার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিক অর্থসংকোচনের একটি কারণস্বরূপ "মেষ্টন এওয়ার্ড" নামক অর্থনৈতিক বাঁটোয়ারায় উল্লেখ করা যায়, যদ্দারা বংগদেশে অর্জিত পাটব্যবসায়ের করজাত অর্থের অর্ধাংশ প্রদেশের বাইরে বন্টিত হয়। উপরন্তু মন্ত্রিসভার অব্যবস্থিতির জন্য এই যুগে বাংলাদেশে কোনো স্পষ্ট শিক্ষানীতি গৃহীত হয়নি। শেষে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তখনকার শিক্ষামন্ত্রী স্যর আজিজুল হক আইনসভায় শিক্ষাবিষয়ক এক প্রস্তাব আনেন। ওই প্রস্তাবে বেন্টিংকের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবের পর থেকে এক শতাব্দির শিক্ষাবিবর্তনের আলোচনা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দোষদর্শন করে' প্রদেশের শিক্ষার হিসাব এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার পুনর্গঠনের একটি খসড়াও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদনুসারে তদন্তের অনুষ্ঠানদ্বারা প্রতি

জিলার বিদ্যালয়গুলি দেখিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করে' স্কুল, মক্তব ও মাদ্রাসাগুলির অসমান বিতরণের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দশদিনব্যাপী এক শিক্ষাপ্রদর্শনী এবং বংগদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বাইরে থেকে আগত ষোলশতের অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। সম্মেলনের পরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি মিলিয়ে কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টৃসভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক স্কুল ও মক্তবের পাঠ্যক্রম সংস্কারের কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়;—সরকার সে বিষয়ে যে প্রস্তাব আইনসভায় আনেন সেটি প্রাথমিক শিক্ষাসম্পর্কে আলোচিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক কমিটি যে প্রস্তাব করেন তার অবলম্বনে "মাধ্যমিক শিক্ষা বিল" প্রণীত হয়ে আলোচ্য যুগের পরবর্তী কালে হিন্দুমুসলমান শিক্ষাবিদদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

এই পোনেরো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচুর অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২৮টি মাত্র মেয়ে পড়ছিল আর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৬৭১ জন। উচ্চবিদ্যালয়সমূহে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১০৪৪, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৩৮৪৫ আর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৭৩৮৫ জন মেয়ে পড়ছিল। মধ্যশিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৭১৬, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৪৯১৬ আর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮৪১৮ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৩৩৩৭০৪ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৫৩৬১১০ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬৯৬৪৯২ জন মেয়ে ছিল।

এই সময়ে একদিকে শিক্ষাসচেতনতার ফলে নূতন নূতন আদর্শের বিবর্তন হওয়ায় এবং অন্যদিকে নানাপ্রকার সমস্যার জন্য তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় কতকগুলি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। ওইসব কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী শিক্ষার পরিণতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে' তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কারের সময়ে স্থির হয়েছিল যে তার সাফল্য-সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একটি "রয়াল কমিশন" বসবে, কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার আরম্ভ থেকে ক্রমাগত আন্দোলন ও অসন্তোষের ফলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্যর জন সাইমনের সভাপতিত্বে "সাইমন কমিশন" বসে। তখন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি

হয়েছিল বলে' শিক্ষাসম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের এই আনুসংগিক কমিটি নিযুক্ত করা হয়, তার সভাপতি স্যর ফিলিপ হার্টগের নামে ওই কমিটি পরিচিত।

ওই কমিটির রিপোর্টের প্রথমে ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার ব্যাপ্তির প্রতি নির্দেশ করে' বলা হয়েছে যে শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের চিরাচরিত শৈথিল্য দূর হয়েছে, স্ত্রীশিক্ষার নূতন উৎসাহ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনুন্নত জাতিসমূহ শিক্ষার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, দেশের নেতৃবর্গ শিক্ষার জটিল সমস্যাগুলি বুঝবার চেষ্টা করছেন. দায়িত্বশীল মন্ত্রিগণ শিক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব অর্থদানের চেষ্টা করেছেন এবং শিক্ষার মানের কিছু উন্নতি হয়েছে।

তারপর শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণ ক'রে' দেখানো হয়েছে শিক্ষা-ব্যবস্থার বহু ত্রুটির কারণে আপাতদৃষ্ট ওই উন্নতি প্রকৃতপক্ষে উন্নতিই নয় এবং ওই উক্তির প্রমাণস্বরূপ দেখানো হয়েছে যে উচ্চশিক্ষায় অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অবহেলা ঘটেছে শিক্ষাক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত অপচয় ঘটছে ও তা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষায়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের অনুপাতে সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায়নি, ছাত্রদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করে এবং যারা চতুর্থ শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে তারাও পরবর্তী জীবনে পাঠচর্চার সুযোগের অভাগে নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তন করছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ওই ত্রুটির কারণ নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করা হয়েছে :—

ভারতের জনসংখ্যার ৮৭% অংশ গ্রামবাসী এবং ৭৩% অংশ কৃষিব্যবসায়ী হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানত গ্রামীণ শিক্ষা। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের অন্তরায় হ'ল আর্থিক অসামর্থ্য, জনবসতির বিরলতা ও শিক্ষকের অভাব। পরস্পরবিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে পরিদর্শনের অসুবিধা এবং ছাত্র সংগ্রহ করে' তাদের নিয়মিতভাবে ক্লাস করানো কঠিন। অপরপক্ষে, শহরে ওই অসুবিধাগুলি না থাকলেও স্থানাভাব।

গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বসতিও পথের দুর্গমতার জন্য একে ছাত্রদের পক্ষে বিদ্যালয়ে যাতায়াত কঠিন, তদুপরি দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির জন্য অভিভাবকেরা ছাত্রদের পড়তে পাঠাতে চায় না এবং পাঠালেও সাক্ষরতা

উপার্জনের উপযোগী যথেষ্টকাল পড়ায় না। আবার মাঝে মাঝে মহামারীর প্রকোপে শিক্ষার গতি আরো বাধা পায়। অস্পৃশ্যতাপ্রথার অস্তিত্ব এবং ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য সাধারণ একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন কঠিন বলে' একেক স্থানে একাধিক বিদ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা শিক্ষাখাতে প্রদত্ত সংকীর্ণ কোষের মধ্যে অর্থের অপচয় ঘটে।

প্রাথমিক শিক্ষা পুরো চার বছর না পেলে সাক্ষরতা লাভ করা যায় না কিন্তু এ-দেশে এই শিক্ষা শেষ করছিল অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রথম শ্রেণিতে যত ছাত্র ছিল ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে তারমধ্যে শতকরা মাত্র ১৯ জন চতুর্থ শ্রেণিতে উপস্থিত হয়েছিল। অনেকে শ্রেণি থেকে শ্রেণিতে উঠতে পারেনি এবং অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

শ্রেণি থেকে শ্রেণিতে উঠতে না পেরে নিম্নমানে আবদ্ধ থাকাকে "বদ্ধতা" (stagnation) এবং সাক্ষরতা অর্জনের আগে শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে "অপচয়" (wastage) বলে' অভিহিত করা হয়েছে। উপরন্তু মিঃ হার্টগ অনুমান করেন যে যারা অসম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন চর্চার অভাবে আবার নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছিল, এই অবস্থাকে নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তন (lapsing back into illiteracy) বলে' বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত এবং নৈশবিদ্যালয়, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বয়স্কদের লব্ধশিক্ষা বজায় রাখার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না বলে' এত অধিকসংখ্যক লোক লেখাপড়া শিখেও আবার নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার তৎকালীন ব্যবস্থাও অপ্রচুর ছিল। পাঁচশত অপেক্ষা কম অধিবাসিসমন্বিত অতি ক্ষুদ্র গ্রামের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, (৩,৬৪,০০০) ছিল এবং বড় গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় থাকলেও সুবিতরণের অভাবে কোথাও ছাত্রের সংকুলান হ'ত না এবং কোথাও ছাত্রাভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালন দুষ্কর হ'ত। মিঃ হার্টগ এই কারণে বিদ্যালয়গুলির পুনর্বণ্টনের সুপারিশ করেন। যে যে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল সেখানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে যে অঞ্চলে যথেষ্ট বিদ্যালয় ছিল না সেই সব স্থানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা কম হওয়ার অবস্থাকে ব্যবস্থাগত অপচয় বলে পৃথক বালিকা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের দাবীকে এই শ্রেণির মধ্যে ধরা হয়েছে। যে সব প্রদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল সেই সব প্রদেশেই এই ধরণের অপচয় বেশি হচ্ছিল।

শিক্ষকের অভাবের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ-ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৬০% ও বাংলাদেশে ৭৬% "একশিক্ষক" বিদ্যালয় ছিল। একাধিক শ্রেণি শিক্ষণক্ষম, নিপুণ, শিক্ষণ-শিক্ষিত শিক্ষকের অধীনে এই ব্যবস্থা হয়তো সফল হ'তে পারতো কিন্তু ভারতের নিম্নমান অজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ৪৪% আর বাংলাদেশের মাত্র ২৫% শিক্ষণশিক্ষিত ছিল। এদের মানের নিম্নতা শিক্ষার সাধারণ অসাফল্যের একটি কারণস্বরূপ ছিল।

বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা ও সংগঠনের দুর্বলতার দরুণ শিক্ষকদের বেতনের হার অত্যন্ত কম ছিল এবং এগুলির স্থায়িত্বের ওপরও নির্ভর করা যেতনা। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পেত।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুপযোগী ছিল। গ্রাম্য পরিপ্রেক্ষিত ও জীবনধারার সংগে সম্পর্কবর্জিত পাঠ্যক্রমে বিদ্যালয় ও জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে লোকের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করছিল যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করে' ছেলেদের স্কুলে পড়বার দরকার নেই। এইজন্য হার্টগ কমিটি জীবনের সংগে জড়িত, প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রমের জন্য সুপারিশ করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। একেকটি ইন্সপেক্টরের ওপর গড়ে ১৭৭টি করে' স্কুলের পরিদর্শনের ভার ছিল। ফলত, তাদের বছরে প্রত্যেকটি স্কুলে দুইতিনবার করে' যাওয়ার কথা থাকলেও কোনো-কোনোটিতে একবারও যাওয়া হ'তনা। সময়াভাব ছাড়া যাতায়াতব্যবস্থার অভাব ও পথের দুর্গমতা প্রভৃতির কারণে অনেক বিদ্যালয় এদের কাছে অগম্য থাকতো।

দুয়েকটি অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, কিন্তু আইনে অনেক ফাঁক থাকায় আর অফিসরদের অনভিজ্ঞতার দরুণ বাধ্যতার আইন কাজে সফল হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিশ্চেষ্টতার দিকে লক্ষ্য করে' কমিটি বলেছেন যে এদের ওপর ওই দায়িত্ব ন্যস্ত করে, শিক্ষার অগ্রগতি রুদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের পক্ষে বাধ্যতাবিষয়ের অনুমতিমূলক (permissive) আইন পাশ করা নিরর্থক। জনশিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাজনৈতিক বা অন্য কারণে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছুক হ'তে পারে, অজ্ঞতা বা দারিদ্র্যবশত জনসাধারণ অক্ষম হ'তে পারে,—তাই এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার প্রাদেশিক সরকারের নেওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনার শেষে তার ত্রুটিসমূহের নিরসনের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা :—

১। বিস্তারের পরিবর্তে সংগঠনের নীতি অবলম্বন করে' অনুপযোগী স্কুলগুলিকে বাদ দিতে হবে।

২। প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নতম মান চার বৎসর বলে' ধার্য করতে হবে।

৩। নিচের শ্রেণিগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বদ্ধতা ও অপচয়ের হ্রাস করতে হবে।

৪। বেতন ও চাকরির অবস্থার উন্নতি করে' উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত এবং শিক্ষণ-শিক্ষার কাল দীর্ঘতর করতে হবে। ট্রেনিং স্কুলগুলির উন্নতি এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্তকালের জন্য পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে উদার করতে হবে যাতে তার দ্বারা সাক্ষরতালাভের ওপর গ্রামের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও সম্ভবপর হয় এবং ছাত্রগণের স্বাস্থ্য, শরীরচর্চা, চরিত্রগঠন প্রভৃতির শিক্ষা হয়।

৬। স্কুলকে কেন্দ্র করে' গ্রামোন্নয়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

৭। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কমিয়ে সরকারি অধিকার বর্ধিত করতে হবে।

৮। সরকারি পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৯। প্রাথমিক শিক্ষাকে সহসা বাধ্যতামূলক না করে' তদুপযোগী মনোভাব সৃষ্টির দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। একেক অঞ্চলকে প্রস্তুত করে' ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আবশ্যিকতার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনায় শিক্ষা ও শিক্ষকতার মানের সামান্য উন্নতির উল্লেখ করে' গভীর ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বর্ধিত অসাফল্য অপচয়ের পরিচয় দিচ্ছিল। কমিটির মতে শ্রেণি উন্নয়নের শৈথিল্যের ফলে এবং অতিরিক্তসংখ্যক অনুপযোগী ছাত্রের উচ্চশিক্ষার দিকে ধাবিত হওয়ার দরুণ এইরূপ ঘটছিল। শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত হয়েছিল সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সংগে তার প্রায় কোনো যোগই ছিল না। ওইসব ত্রুটির প্রতিকারকল্পে হার্টগ কমিটি প্রস্তাব করে যে :—

১। মধ্য-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করে' বহুসংখ্যক ছাত্রকে সেদিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

২। মধ্যশিক্ষার পর অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিল্পবাণিজ্যসম্পর্কিত বৃত্তিশিক্ষায় প্রণোদিত করতে হবে।

৩। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বিষয়বিকল্পদ্বারা শাখায়িত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষাবিষয়ে বলা হয়েছে যে কোনো কোনো বিষয়ে উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার আধিপত্য একে বিপর্যস্ত করেছে, উদারনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হচ্ছেনা, অনুপযোগী ছাত্রের ভীড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভরে' যাচ্ছে এবং প্রতি বৎসরে ছাত্রদের মান ক্রমান্বয়ে নিচু হয়ে যাচ্ছে।

এই সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে যে অনুপযুক্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা নিতে দেওয়া হবেনা এবং "অনার্সের" পড়া কেবলমাত্র নির্বাচিত কয়েকটি সুযোগ্য কলেজে পড়ানো হবে।

ঐকিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বাঞ্ছনীয়তার কথা স্বীকার করেও বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের মতো বিরাট ও দরিদ্র দেশের উচ্চশিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন ওই প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সাধিত হতে পারে না।

স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে হার্টগ কমিটির মন্তব্য হ'ল যে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার অপচয় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি এবং বিদ্যালয়বয়সী বালক অপেক্ষা অনেক কম সংখ্যক বালিকা শিক্ষা পাওয়ায় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত পার্থক্য কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও অনুপযোগী এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অপ্রচুর ও শিক্ষয়িত্রীর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে মেয়েদের উপযোগী বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন ও উপযুক্ত বেতনে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী ও পরিদর্শিকা নিয়োগ করতে হবে। জাতির মাতৃরূপে পুরুষ অপেক্ষা নারীর শিক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় বলে' গণ্য করতে হবে।

শিক্ষায় প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের কার্যকলাপের বিষয়ে বলা হয়েছে যে তাঁদের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক অর্থ দিতে চাওয়া স্বাভাবিক হ'লেও তখন অধিকতর প্রয়োজন ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে' তাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করে'

বলা হয়েছে যে প্রাদেশিক সরকারের নিকট শিক্ষার দায়িত্ব অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হস্তান্তরিত করাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে জাতীয় শিক্ষার বিচ্ছেদের ফল বিষম হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের আর কোনো পথ নেই। তাছাড়া শিক্ষাসম্বন্ধীয় দায়িত্বের অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্যস্বরূপ হওয়া উচিত।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রাদেশিক সরকারে দায়িত্ব না কমিয়ে উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদানের সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষিত নাগরিক-সৃষ্টির দায়িত্ব উভয়কে সমভাবে বহন করতে হবে। অর্থ, পরিদর্শন ও আর্থিক ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। এইজন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়েছে :—

১। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত করতে হবে।

২। প্রাথমিক শিক্ষার ভার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না।

৩। শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪। শিক্ষার বিশেষ বিশেষ অংশ "সংরক্ষিত" করে' শিক্ষাকমিশনারের হাতে দেওয়া অনুচিত।

৫। প্রাদেশিক শিক্ষাসম্পাদক ও অধিকর্তাদের নিয়মিত সর্বভারতীয় সম্মেলন হওয়া আবশ্যক।

হার্টগ কমিটির এই রিপোর্ট ভারতীয় শিক্ষানীতির ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর অনেক প্রস্তাব কাজে পরিপালিত না হ'লেও প্রসারের ওপর সংগঠনের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস হ'লেও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মানের কিছু উন্নতি হয়েছিল। অপরপক্ষে সাক্ষরতার বৃদ্ধি বা বৃত্তি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলিকে কাজে পরিণত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। এই রিপোর্টের প্রকাশের পরের কয়েক বৎসর আন্তর্জাতিক অর্থসংকট ও রাজনৈতিক আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল তাকেই এরূপ হওয়ার আংশিক কারণস্বরূপ নির্দেশ করা যায়।

এই রিপোর্টে শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান নিবদ্ধ হয়েছিল এবং কিছু কিছু ভুলও ছিল। এডামের উক্তিবিষয়ে মিঃ হার্টগের মন্তব্য এবং ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণের প্রতিবাদের উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টৃ সভার প্রস্তাব :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দের নূতন শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের অসুবিধা কিঞ্চিৎ নিবারণের জন্য ওই বৎসরেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টৃ সভা (Centra Advisory Board of Education সংক্ষেপে C. A. B.) স্থাপিত হয়। প্রধান প্রধান শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমতপ্রদানের ব্যবস্থা করা এর কাজ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সরকারি ব্যয়সংকোচনের খাতিরে মাত্র দুই বৎসর পরই এই সভাটিকে উঠিয়ে দেওয়া হয় ও ক্রমশ ব্যুরো অব্‌ এডুকেশনকে উঠিয়ে এবং শিক্ষাবিভাগকে রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের সংগে এক করে' দেওয়া হয়। তারপর হার্টগ কমিটির সুপারিশে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে "সি-এ-বি" কে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কারদ্বারা এর শক্তি বর্ধিত হয়।

পুনরুজ্জীবনের পর সি-এ-বির প্রথম বাৎসরিক সভায় আলোচনাসমূহের ফলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

১। দেশে বিদ্যালয়ী শিক্ষার এমন আমূল পরিবর্তন সাধিত করতে হবে যাতে শিক্ষাশেষে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ভিন্ন সরাসরি কর্মক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে পারে।

২। বিদ্যালয়ী শিক্ষা নিম্নলিখিত স্তরসমূহে বিভক্ত হবে :—

ক) প্রাথমিক—নির্ধারিত ন্যূনতম মানের সাধারণ শিক্ষা। এই মান এমনভাবে স্থির করা হবে যাতে ছাত্রেরা স্থায়িভাবে সাক্ষরতা লাভ করতে পারে।

(খ) নিম্নমাধ্যমিক—দ্বিতীয় স্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধারণ শিক্ষা যা একদিকে উচ্চমাধ্যমিক ও অন্যদিকে বৃত্তিশিক্ষার বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগিতা দেবে। গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষা গ্রাম্য প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে প্রবর্তিত হবে।

(গ) উচ্চমাধ্যমিক—বহুমুখী শিক্ষাদ্বারা ছাত্রদের কলেজের শিল্প ও কলা-বিভাগের ও বৃত্তিশিক্ষাকলেজের জন্য প্রস্তুত করবে। তাছাড়া গ্রাম্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে শিক্ষণশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, কেরাণিগিরির শিক্ষা ও বিভিন্ন শিল্পের নিয়োগকর্তাদের প্রদত্ত শিক্ষার (apprenticeship training) জন্য এই শিক্ষা যথেষ্ট হবে।

৩। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রথম সাধারণ পরীক্ষা (public examination) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শেষে হবে।

৪। প্রস্তাবিত পুনর্গঠনগুলি বিশেষজ্ঞদের অভিমতানুযায়ী করা হবে।

সি-এ-বির এই প্রস্তাবগুলি পববর্তী যুগের এবং স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনাগুলির পূর্বগামী এবং আদর্শ সূত্রে এক সংগে যুক্ত বলে এগুলি নিয়ে এইখানে বিশেষ আলোচনা করা হ'ল না।

উড-এবট রিপোর্ট :—

নানা কমিটির রিপোর্টে বৃত্তিশিক্ষার প্রাধান্য ঘোষিত হওয়ায় ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশনের প্রাক্তন প্রধান ইন্সপেক্টর মিঃ এ, এবট্ এবং ডিরেক্টর অব ইণ্টেলিজেন্স মিঃ এস্, এচ্, উডকে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রদানের জন্য ভারতে নিমন্ত্রিত করা হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এসে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এঁরা নিজেদের রিপোর্ট দেন।

এঁদের আলোচ্য বিষয় তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কিনা ও উচিত হলে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ,—উপস্থিত বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি করা সম্ভব, না নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে হবে। নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ হবে. শিক্ষার কোন স্তরে বৃত্তিশিক্ষার সূত্রপাত হবে এবং তার স্তরবিভাগ কিরূপ হবে।

তৃতীয়তঃ,—গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে।

উড-এবট রিপোর্ট হু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধারণ শিক্ষা ও তার ব্যবস্থাপনার এবং দ্বিতীয় অংশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাবিষয়ক প্রশ্নসমূহের অলোচনা করা হয়েছে।

রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে শিক্ষাসংস্কারের দ্বারা বেকারসমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষা উপযুক্ত কর্মী, গড়ে' তুলতে পারে —তাদের নিয়োগের ব্যাপার নির্ভর করে দেশের শিল্পপ্রসারেরও ওপর।

আরো বলা হয়েছে যে বৃত্তিশিক্ষাকে প্রচলিত করতে হ'লে সম্মান দিতে হবে। বৃত্তিশিক্ষা নিকৃষ্টধরণের শিক্ষা নয়,—সাধারণ শিক্ষার মতোই সাংস্কৃতিক মান ও নাগরিকসৃষ্টির সম্ভাবনা এর আছে।

শিক্ষার স্তরভেদ সম্পর্কে এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার মতো চার বছর প্রাথমিক, চার বছর নিম্নমাধ্যমিক, তিন বছর উচ্চমাধ্যমিক ও

তিন বছর ডিগ্রির পড়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে :—

১। বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিগুলির ভার যতদূর সম্ভব শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীদের হাতে দেওয়া উচিত এবং এজন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন।

২। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বইয়ের সংকীর্ণ বিদ্যার পরিবর্তে স্বাভাবিক আগ্রহ ও সর্জনমূলক কাজকর্মের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

৩। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম স্থানীয় পরিবেশকে কেন্দ্র করে গঠিত হওয়া চাই। ইংরেজি শেখানো হ'লেও যেন ভাষাশিক্ষার ভার বেশি না হয়।

৪। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যতদূর সম্ভব মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজি শেখা বাধ্যতামূলক হবে।

৫। সাধারণ ছেলেদের ব্যাবহারিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে। বেশি ইংরেজি শিখবার যোগ্যতা যাদের থাকবে তাদের জন্য সাহিত্যিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষারব্যবস্থা হবে।

৬। শিক্ষণশিক্ষার দিকে জোর দিয়ে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা এক বিদ্যালয়ে হবে না।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যশিক্ষা সমাপ্ত করে' তিনবছরের শিক্ষণশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে—

১। বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যেন দেশের শিল্পপরিণতিকে ছাড়িয়ে না যায়।

২। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষার বিভিন্ন শাখারূপে গণ্য গণ্য না করে' স্তররূপে গণ্য করতে হবে। বৃত্তিশিক্ষাবিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির ভিত্তি সাধারণশিক্ষার বিষয়ের ওপর স্থাপিত হবে।

৩। অষ্টমশ্রেণির মানের সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ায় আগে বৃত্তিশিক্ষা আরম্ভ না করা ভাল। এই ছাত্রদের জন্য "জুনিয়র" আর যারা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সাফল্যের সংগে শেষ করবে তাদের জন্য "সিনিয়র" স্তরের বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে হবে।

৪। অষ্টমশ্রেণির শিক্ষাপ্রাপ্তদের বৃত্তিশিক্ষার বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক আর একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্কুলগুলিকে "উচ্চতর" মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে গণ্য করা হবে। কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অবসর-

কালীন শিক্ষার এবং কৃষি অঞ্চলের জন্য উচ্চমাধ্যমিক কৃষিশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণ শিক্ষার মতো বৃত্তিশিক্ষার একটি সম্পূর্ণ ধারার কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৃত্তিসমূহের উচ্চশিক্ষার জন্য বাণিজ্য ও শিল্পের "টেক্‌নিক্যাল" ও "কমার্শিয়াল" ইনষ্টিটিউট বা কলেজ; উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সিনিয়র কমার্শিয়াল ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল আর নিম্নমাধ্যমিক স্তরে জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল আর ট্রেড স্কুল থাকবে। গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য কৃষিশিক্ষার উচ্চ ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে।

যাতে অল্প বয়সে ভুল বৃত্তিনির্বাচন করে' ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে কষ্ট না পায় তাই বৃত্তিশিক্ষার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত উপদেশব্যবস্থার (guidance) প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করে' সর্বভারতীয় স্তরে তার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় এই যে উড এ্যাট কমিটির রিপোর্টে ভারতের বৃত্তিশিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব থাকলেও এর অল্প অংশই কাজে পরিণত করা হয়েছিল। আলোচ্য যুগের পরে কয়েকটি "পলিটেকনিক" বা উচ্চস্তরের সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষার সম্মিলিত ব্যবস্থাসমন্বিত নূতন প্রকারের কলেজের স্থাপন ভিন্ন এই রিপোর্টের অন্য কোনো ফল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ফলেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ীশিক্ষা ঃ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী প্রতিষ্ঠানের কথা ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এক সভায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরাও অনুরূপ প্রস্তাব করেছিলেন। তাছাড়া ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের বিষয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে অনুষ্ঠিত লিটন কমিটিও বলেন যে কোনো আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের মানের সামঞ্জস্য স্থাপিত করতে পারলে তাদের বিদেশে শিক্ষালাভের পক্ষে সুবিধা হবে। এই অনুসারে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শিমলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক সম্মেলনে "ইণ্টার য়ূনিভার্সিটি-বোর্ডের" স্থাপন হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হয় বাংগালোরে। উপরের কাজগুলি ছাড়া এই বোর্ডের আন্তঃকলেজীয় ও আন্তঃ-

বিশ্ববিদ্যালয়ী ক্রীড়াকলাপ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার দ্বারা এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপনের কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গৃহীত সরকারি নীতির অনুসরণে এই যুগে কতকগুলি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আগের পরিচ্ছেদে করা হয়েছে, আলোচ্য যুগে যেগুলির স্থাপিত হয় সেগুলির নাম নিচে দেওয়া হ'ল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্মার উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐকিক, শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকলেও অর্থাভাবের দরুণ এবং আশপাশের তিনটি স্বাধীন কলেজ (সেণ্ট ষ্টিফেন্স, হিন্দু ও রামযশ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্তায় আত্মবিলোপে রাজি না হওয়ায় তা হয়ে ওঠেনি। তারপর হার্টগ কমিটির বিচারে ওই কলেজগুলির স্বাধীন সত্তার অধিকার ও প্রয়োজন স্বীকৃত হয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধীরে ধীরে "ফেডেরাল" গঠনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার নির্দেশ দেন,—অর্থাৎ সংযুক্ত কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে থাকবে, তার স্থাপিত মানে কাজ করবে এবং নিজেদের স্বাধীনতা কিয়দংশে ত্যাগ করে' যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, কিন্তু এই সংস্কারও বহুদিন পর্যন্ত সাধিত করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের পরীক্ষক ও সংশ্লেষক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একেও নোতুন রীতির গঠন দেওয়ার প্রচেষ্টা সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেনি।

মাদ্রাজপ্রদেশের তেলেগুভাষী অঞ্চলের বিদ্যার্থীদের জন্য ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি অন্ধ্রের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছে। এর গঠনের মধ্যে দুটি রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, অর্থাৎ, প্রাদেশিক কেন্দ্ররূপে বিভিন্ন কলেজের সংশ্লেষণ ও পরীক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান এই দুয়ের ব্যবস্থা এখানে আছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে আগ্রার সংশ্লেষক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন হয়। বেনারস, আলিগড়, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌয়ের ঐকিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকা ভিন্ন যুক্তপ্রদেশ মধ্যভারত ও গোয়ালিয়রের সমস্ত কলেজগুলির ওপর এর কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চিদম্বরমে রাজা স্যর আন্নামালাই চেট্টিয়ারের অর্থানুকুল্যে

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে একেক অধ্যাপকের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তিনচারজন মাত্র ছাত্র নিয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া তামিলভাষার পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য এর একটি বিশেষ তামিলী গবেষণাবিভাগ ছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাংকুর রাজ্যে ত্রিবাংকুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এইভাবে ষোলো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ছয়টি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তাছাড়া পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাটনা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অদলবদল করে' আধুনিকত্ব সম্পাদিত হয়, কিন্তু যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কমিশনের অনুষ্ঠান হয়েছিল তার ওপর তার প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে কম। এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বৃহত্তম সংশ্লেষক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং এখনও আছে। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের বাংলা সরকারের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে বলা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ আয়তন একে স্থানুবৎ জড় করেছে। এর স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞানবিভাগের শিক্ষাব্যবস্থা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগে স্থাপিত হয়, এর কাজ উঁচুদরের হ'লেও পরিকল্পনায় দুটি প্রধান অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, এখানে কলেজগুলি থেকে পৃথকভাবে স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ার দুয়ের মধ্যে অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় ছেদ ঘটেছিল। তাছাড়া আনুপূর্বিক সম্পর্কহীন এই ব্যবস্থা মূলহীন তরুর মতো ছাত্রসমাজের সংগে অসংযুক্ত ছিল—বিভাগগুলি প্রত্যেক বৎসর খোলা থাকায় এবং ছাত্রসংখ্যা সব বৎসরে সমান না হওয়ায় অনেক বৎসরে আর্থিক ক্ষতি ঘটতো। অর্থাভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অংগস্বরূপ হয়েছিল, এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন হিসেব মেলাবার উপায় ছিল না।

অপর পক্ষে, এই ষোলো বছরে বিশেষ দানের ফলে প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বাড়ি হয়েছিল, গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং আন্তঃকলেজী ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান টেরিটেরিয়াল ফোর্সেস" আইনের অনুসারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা (University Trainining Corps) হয়। তার ফলে নিরস্ত্র ভারতবাসীদের পক্ষে কিছুটা সামরিক শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য দুয়েক স্থানে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষার

ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের য়ু-টি-সিতে ৫৮০ জন শিক্ষার্থী ছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যপরীক্ষার স্থত্রপাত হয়, অন্যান্য স্থলেও কোথাও ঐচ্ছিক এবং কোথাও বাধ্যতামূলকভাবে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকটি ছাত্রাবাসের স্থাপন ও নিয়মাদির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু দেশের বিরাট প্রয়োজনের সামনে এইসব নামমাত্র ব্যবস্থা সিন্ধুতে বিন্দুর মতো ছিল।

এ-ছাড়া ছাত্তদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সংবাদদানে সাহায্য করার উপযোগী কয়েকটি সংস্থাও এই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল।

বিবিধ সংকট ও অশান্তি সত্ত্বেও এই যুগে কলেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুত ঘটেছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষণ, স্থাপত্য, চিকিৎসা, আইন, প্রাচ্যবিদ্যা ও বাণিজ্য এই আটটি অঙ্গ বা ফ্যাকালটি ছিল। সাধারণ শিক্ষার পঞ্চাশটি ও বৃত্তিশিক্ষার আঠারোটি, এই আটষট্টিটি সংশ্লিষ্ট কলেজে ৩২,৯৯৫ জন ছাত্র এবং নিজস্ব বিভাগগুলিতে ২৩৬২ জন ছাত্র ছিল: কিন্তু এই অতি দ্রুত বিস্তারের ফলে বাংলাদেশের কলেজী শিক্ষায় কতকগুলি দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল। অনেক অযোগ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সাধারণ্যের অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছিল আর ছাত্রদের প্রধান ঝোঁক সাধারণশিক্ষার (বিশেষত কলাশাখার) দিকে হওয়ায় শিক্ষার পরিণতি সামঞ্জস্যময় হচ্ছিল না। আঠারোটি বৃত্তিশিক্ষার কলেজের মধ্যেও অধিকাংশ ছিল আইন, চিকিৎসা ও শিক্ষণশিক্ষার জন্য। উচ্চ স্তরের শিল্পবাণিজ্যশিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্য ছিল।

এই সময়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের কলেজ ছিল—

কলেজের প্রকার	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
সাধারণ শিক্ষার—	১৬৭	৯৭,৫৫৪
আইন—	১৬	৬৮৮৩
চিকিৎসা—	১০	৫৩৩০
শিক্ষণ—	২৩	১৯০১
স্থাপত্য—	৭	২২৫৩
কৃষি—	৬	১০০৮
বাণিজ্য—	৭	৩২৬৩

কলেজের প্রকার	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
শিল্প—	২	৭৫
বনবিজ্ঞান—	২	৭৪
পশুচিকিৎসা—	৪	৪৯২
দ্বিতীয় শ্রেণির—	১০৫	—

ছাত্রসংখ্যার এই সামঞ্জস্যহীন ও আকস্মিক বৃদ্ধিতে অনুপযুক্ত বহুতরের সাধারণ উচ্চশিক্ষালাভে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিল্পশিক্ষার ইচ্ছা ছিল না এবং শিল্পোন্নতির অভাবে দেশে শিল্পশিক্ষিত লোকের জন্য যথেষ্ট চাহিদাও হয়নি।

অপরপক্ষে ছাত্রসমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষা গবেষণাক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার প্রভৃতির স্থাপন, বৃত্তিদান, পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি নানাভাবে মৌলিক চিন্তা ও কাজ উৎসাহিত হয়েছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবানুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার "ইণ্টারমিডিয়েট" স্তর পর্য্যন্ত উন্নয়ন, নির্বাচিত উৎকৃষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির "ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ" পরিবর্তন, মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট "বোর্ডের" গঠন, তিনবৎসরস্থায়ী ডিগ্রিশিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কারের কাজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থার ভার এক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়। অন্য কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংস্কার তখনই অনুষ্ঠিত হয় এবং কোথাও কোথাও ক্রমশ হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণিগুলি উচ্চবিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত হওয়ায় সেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারেনি।

এলাহাবাদ, যুক্তপ্রদেশ ও আজমীরে (মধ্যভারত ও রাজপুতনার জন্য) মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার বোর্ড স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালনের জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে হাইস্কুল এডুকেশন বোর্ড স্থাপিত হয়।

এরমধ্যে যুক্তপ্রদেশের বোর্ডই সবচেয়ে বেশি সাফল্যলাভ করেছিল। কলিকাতার বোর্ডের গঠন না হওয়ায় ঢাকা শহর বাদে বাংলাদেশের সমস্ত অংশের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালনের ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রয়ে গেছিল

এবং ঢাকা বোর্ডের অসন্তোষজনক কাজের ফলে অনেক ছাত্র তার এলাকা ত্যাগ করে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশোনা করতো।

ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও বোর্ডগুলি জনপ্রিয় হ'তে পারেনি। প্রথম শ্রেণির (বি-এ পর্যন্ত) কলেজগুলি প্রধানত তাদের "আই-এ" ক্লাসের আয়ের ভিত্তিতে "বি-এ" ক্লাসের ব্যয় বহন করত বলে' নূতন ব্যবস্থায় সেগুলির কর্তাদের পক্ষ থেকে তুমুল আপত্তি ওঠে, শিক্ষার কাল ও ব্যয়ের বৃদ্ধির কারণে ছাত্রদের অভিভাবকেরা তিন বৎসরের ডিগ্রিপড়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার "ফিয়ের" আয় থেকে বঞ্চিত হলে' বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা হবে বলে' অনেক স্থানে (বিশেষত কলিকাতায়) এই প্রস্তাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন পায়নি।

এইসব সমস্যার কথা প্রথমে ইণ্টার-য়ুনিভার্সিটি বোর্ডে ও তারপর কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃ সভায় আলোচিত হয়। ওই সভার পক্ষ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পড়াকে বিভক্ত করে একশ্রেণি স্কুলের সংগেও একশ্রেণি কলেজের সংগে যুক্ত করার প্রস্তাব হয়। তার ওই প্রস্তাবগুলি এই পরিচ্ছেদের পূর্বাংশে আলোচিত হয়েছে।

নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার আলোকে ও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শনের সংঘাতে এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এক রেনেসাঁসের মতো ভাব দেখা দেয় এবং কয়েকটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যসাহিত্যের গবেষণার জন্য স্যর আর জি ভাণ্ডারকরের নামে পুনায় "ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়। সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে পুনার "ডেকান কলেজে" সংগৃহীত পুঁথিভাণ্ডার ও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলি এবং দশহাজার টাকার অর্থসাহায্য দান করেছিলেন। গ্রন্থাগারের পরিচালন, প্রাচীন পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ, পত্রিকা প্রকাশ ও গবেষণার তত্ত্বাবধান এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ছিল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর "বসুবিজ্ঞানমন্দির" স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের দিয়ে স্নাতকোত্তরস্তরের উদ্ভিদের গঠন ও জননবিজ্ঞান, শরীর ও কৃষিসম্পর্কিত রসায়ন, পশুবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণা করা এর উদ্দেশ্য ছিল।

যুক্তপ্রদেশের শিল্পোন্নতির সহায়তা ও তত্ত্বাবধায়কপদের উপযোগী শৈল্পিক-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের শিল্পশিক্ষার কেন্দ্ররূপ "স্যর হারকোর্ট বাটলার টেকনিক্যাল কলেজ" স্থাপিত হয়।

মার্কিন বিদ্যোৎসাহী হেনরি ফিপ্‌স ভারতের শিক্ষার উন্নতিকল্পে লর্ড কার্জনের

কাছে তিরিশ হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন। ওই অর্থে পুসা শহরে একটি কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর ওই কেন্দ্র ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটরূপে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। কৃষিবিজ্ঞানের সর্বভারতীয় সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে টাটাপরিবারের বদান্যতায় বাংগালোরে "ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স" স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানালোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে খনিজবিজ্ঞান এবং খনিশিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য ভারতের ৯৫% কয়লার উৎপাদনকেন্দ্র ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স স্থাপিত হয়। এখানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস-সিপাশ ছাত্রেরা তিন বৎসরের জন্য কয়লা ও ধাতুর খনির স্থাপত্য এবং ভূতত্ত্ব শিক্ষা করে।

নাথিবাই দামোদর থ্যাকার্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনা ও বোম্বাইয়ে একটি করে' এর অংগীভূত কলেজ ও বরোদা ও আমেদাবাদে একটি করে' সংশ্লিষ্ট কলেজ ছিল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের কথা আগে লেখা হয়েছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে এখানে "বিশ্বভারতীর" প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন প্রাচ্যসংস্কৃতির মধ্যে যোগস্থাপন, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চা ও মানবিকতার আদর্শে প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্যের মিলনে বিশ্বশান্তির ভিত্তিস্থাপন এর উদ্দেশ্য ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানে কেবল ভারতের সর্বত্র নয়, য়ুরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্র সমাগত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ ছিল—

বিদ্যাভবন—বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্র।

চীনভবন—ইন্দোচীন বিষয়সমূহের অধ্যয়নকেন্দ্র।

শিক্ষাভবন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজ।

কলাভবন—চারুকলা ও শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র।

সংগীত ভবন—সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র।

শিল্পভবন—যন্ত্রশিল্পশিক্ষায়তন।

শ্রীনিকেতন—গ্রাম্য পুনর্গঠনকেন্দ্র

"মণ্টফোর্ড রিফর্ম" সম্বন্ধীয় যে অসন্তোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়িয়ে শিক্ষা-

ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করেছিল তা এইভাবে আন্দোলন ভিন্ন গঠনের দিকেও কার্যকর হয়,—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, ভাণ্ডারকর প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় জাতীয় শিক্ষার আদর্শ জাগ্রত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এই আদর্শ বলবত্তর হয় এবং কলিকাতা, পাটনা, বেনারস, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে "বিদ্যাপীঠ" শ্রেণির জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য এই নূতন ভাববন্যা ক্রমশঃ তার প্রথম প্লাবনের উচ্ছ্বাস হারায়—অনেক বিদ্যাপীঠ কালক্রমে বন্ধ হয়ে যায় এবং কতকগুলি কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে' থাকে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মৌলানা মহম্মদ আলির প্রচেষ্টায় আলিগড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া স্থাপিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সেটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। মুসলমানদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং চরিত্রগঠনের জন্য স্থাপিত ওই প্রতিষ্ঠান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ওই সময়ে তার অধীন একটি কলেজ একটি আধুনিক শিল্পপ্রধান মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ব্যাংক ও সমবায়সমিতি সমন্বিত), বয়স্কশিক্ষার জন্য একটি জনশিক্ষা-কেন্দ্র, জামিয়া গবেষণাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট জামিয়া কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ছিল তাছাড়া এখান থেকে "জামিয়া" নামক সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় পত্রিকা ও "মক্তব" বা "জামিয়া বুক ডিপো" নামক শিক্ষামূলক পুস্তকের প্রকাশকেন্দ্র পরিচালিত হ'ত। প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম, ভুপালের নবাব ও দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে এবং "হামদর্দনে জামিয়া" নামক সাত হাজার সভ্যসমন্বিত এক বিরাট সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিষ্ঠান চলতো এবং ডাঃ জাকির হোসেন এর নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ—

এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার পরিণতিও অত্যন্ত দ্রুত ঘটেছিল। ছাত্র সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বর্ধিত হয়েছিল এবং অর্থসংকটের ফলে শিক্ষাখাতে সরকারি অংশে ব্যয়বৃদ্ধি না হলেও সাধারণের প্রচেষ্টার বৃদ্ধির ফলে এই শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের ৪৪৩ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ৭৯৩ লক্ষ টাকা হয়েছিল।

নূতন শিক্ষাসচেতনতা ও অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ চেষ্টা এই বিস্তারের একটি কারণ ছিল। তাছাড়া এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা শহর ছাড়িয়ে গ্রামে বিস্তৃত হয়েছিল। অভিভাবকেরা ছেলেদের দূর

শহরে পড়তে পাঠাতে চাইতেন না এবং সমাজসেবকের দল গ্রামোন্নয়ন চাইছিলেন বলে অনেক গ্রামে "হাই-স্কুল" খোলা হচ্ছিল।

এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষারও বহুল প্রসার ঘটেছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যেখানে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৭৫, ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছিল ১৩২৫। এই উন্নতি প্রধানত জনসাধারণের উদ্যোগেই ঘটেছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যেখানে ৪৬৮টি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছিল ৭৯৯টি।

মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই "প্রাইভেট" ছিল। অনেকগুলি সাহায্য পেত, অনেকগুলি পেত না: অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় হিসেবে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। কতকগুলি বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট ছিল, আবার কতকগুলির মান অত্যন্ত নিচু ছিল। অনেক বিদ্যালয়ের অত্যন্ত অর্থাভাব ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক প্রদেশে যে "বোর্ড" স্থাপিত হয়েছিল সে কথা আগে লেখা হয়েছে, বাংলাদেশের মধ্যে কলিকাতায় যে বোর্ড স্থাপিত হয়নি ও ঢাকার বোর্ডের কাজ যে সন্তোষজনকভাবে চলছিল না তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার ঝোঁক এই সময়ে অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ইংরেজিভাষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হ'লেও ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশে অন্তত আংশিকভাবেও প্রবেশিকা পরীক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে মাতৃভাষাবাহন মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ অন্তত নীতিরূপেও প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষায় ইরেজির প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজির প্রতি দেশের লোকের আকৃষ্টতা, বহুভাষী দেশে বিভিন্ন ভাষার প্রচলনে ব্যয়বৃদ্ধির আশংকা প্রভৃতি নানা কারণ মিলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার পূর্ণপ্রয়োগের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল।

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এ-যুগেও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য মাত্র পোনেরোটি ট্রেনিং কলেজে ১৪৮৮ জন পুরুষ ও ১৪৭ জন মেয়ে শিক্ষালাভ করছিল। বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত প্রদেশভেদে ৮৯.৭% (পঞ্জাব) থেকে ১৬.৫% (সিন্ধু) পর্যন্ত ছিল, বাংলাদেশে ছিল—২০.৭%।

প্রধানতঃ সাধারণ্যের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিস্তার হওয়ার ফলে প্রথম প্রথম

শিক্ষকদের বেতন অতি কম ছিল এবং পেন্সনাদির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমশঃ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের ও বেতনের মাননির্ণয়ের ব্যবস্থা হ'লেও তাতে শিক্ষকদের দুরবস্থার যথোচিত প্রতিকার হয়নি।

বাংলাদেশে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের উন্নতি করার জন্য তিনলক্ষ টাকার বিশেষ বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া হয় এবং ১৯২২-২৭ পঞ্চবার্ষিকীতে প্রদেশে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের নীতি গৃহীত হয়। তাছাড়া কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবস্থা খারাপ হ'লে সেটি স্বীকৃত হ'ত না, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলবোর্ডের নিয়ম স্কুলগুলিকে মানতে হ'ত এবং শিক্ষকদের "আর্বিট্রেশন বোর্ডের" কাছে আপীল করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অল বেংগল টিচার্স এসোসিয়েশন এই সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে ও পক্ষে জনমত সংগঠনে যথেষ্টভাবে তৎপর হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল প্রসারের সংগে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। এই শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়াতে বহুতর ছাত্রের পক্ষে সংকীর্ণ জ্ঞানিক শিক্ষা অযোগ্য ও অসুবিধাজনক বলে' প্রমাণিত হচ্ছিল, গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের ফলে গ্রামীণ বিষয়ের অভাব অনুভূত হচ্ছিল এবং অনেক মেয়ে এই শিক্ষা নিতে অগ্রসর হওয়ায় মেয়েদের উপযোগী বিশেষ বিষয়সমূহের চাহিদা হয়েছিল।

এই প্রয়োজনগুলির সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে জীবনোপযোগী কার্যিক শিক্ষার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশে কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় ভিন্ন সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্প সম্বন্ধীয় কোনো বিকল্পব্যবস্থা হয়নি এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের সংগে তার মানেরও অবনতি ঘটছিল। ১৯২২-২৭ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংকীর্ণ, নিম্নমান প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য করে' লেখা হয়েছিল যে এই ভ্রান্ত উদ্যোগ ছাত্রসমাজকে দেশের স্বাভাবিক ও সাধারণ কার্যসমূহের অনুপযোগী করে' বিরাট অপচয়ের সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

উপরন্তু এই সময়ে শিক্ষিতের বেকার সমস্যা ঘনীভূত হয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলি শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শিক্ষাক্ষেক্ষেত্রে এতগুলি সংকট একসংগে আত্মপ্রকাশ করার ফলে হার্টগ কমিটি, উড-এবট রিপোর্ট ও সি-এ-বির প্রস্তাব ছাড়া ১৯৩০-৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাসমস্যার ও সংস্কারের উপায়ের আলোচনার জন্য প্রাদেশিক স্তরে

বিভিন্ন কমিটির বৈঠক হয়। যুক্তপ্রদেশে স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে বেকারসমস্যার সমাধানের জন্য গঠিত একটি কমিটি মাধ্যমিকশিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সরকারি প্রস্তাব ও তৎফলজাত শিক্ষকসম্মেলন এবং বিভিন্ন শাখাসম্বন্ধীয় বৈঠকের কথা এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে লেখা হচ্ছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ওই প্রস্তাবে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষ অর্থাভাবের কারণস্বরূপ মেষ্টন এওয়ার্ডের "বিষময় ফলের" দিকে নির্দেশ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

এই যুগে শিক্ষার অন্যান্য শাখার মতো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও সরকারি উদ্যোগিতার চেয়ে জাগ্রত জনচেতনাই বেশি দায়ী ছিল। "মন্ট-ফোর্ড" সংস্কারে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সর্বতোভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান-সমূহের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, কেবল রাষ্ট্রকর্তৃক কতকগুলি আদর্শস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হ'ত—সেগুলি ছিল প্রধানত ট্রেনিং স্কুল সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়। তাছাড়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে প্রাইভেট স্কুলও ছিল।

১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রণীত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা এবং বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আসামে প্রাথমিক শিক্ষার আইন হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার আইনের সংশোধিতাকারে পুনঃপ্রণয়ন হয়।

এই আইনগুলির দ্বারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রভূত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে' তাদের অধীন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ আইনের অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলি মোটামুটিভাবে একই ধরণের ছিল। বাংলাদেশের আইনের ব্যবস্থাগুলি ছিল নিম্নলিখিত প্রকারের :—

এই আইন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বংগীয় স্বায়ত্তশাসন-আইনের অনুসারে, প্রথমে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার জন্য প্রণীত হয় এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনের সংস্কারের পর সংশোধিত করে' য়ুনিয়নগুলির ওপরও প্রযোজ্য করা হয়েছিল।

মিউনিসিপ্যালিটি ও য়ুনিয়নবোর্ডগুলিকে আইন প্রণয়নের এক বৎসরের মধ্যে নিজনিজ এলাকায় তদন্তের দ্বারা ৬—১০ বৎসরের শিশুর সংখ্যা, বিদ্যালয়গুলির অবস্থান, শিক্ষক, হাজিরা কতদূর হয় এবং কতটা হওয়ার প্রয়োজন, বর্তমান ব্যয় এবং কতটা বর্ধনের প্রয়োজন, শিক্ষাকরস্থাপন ও অন্যান্য উপায়ে আয়ের কতটা বৃদ্ধি হ'তে পারে এবং কতটা বাড়তি সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হবে প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারকে জানাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উপরিউক্ত তদন্তে কোনো অঞ্চলে ছয় থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সম্ভাবনা দেখা গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমতি নিয়ে তা করতে পারেন। প্রথমে কেবল ছেলেদের ওপরই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রযুক্ত হবে।

মিউনিসিপ্যালিটি আয় ও সরকারি সাহায্য উভয়ে মিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য যথেষ্ট না হ'লে কর্তারা শিক্ষাকরের প্রবর্তন করতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য মিউনিসিপাল কমিশনাররা "স্কুল কমিটি" করবেন এবং তার গঠন ও পরিচালনসম্বন্ধীয় নিয়মাবলির প্রণয়ন করবেন।

সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে না, কিন্তু যে অঞ্চলে বাধ্যতামূলক হবে সেখানকার দরিদ্র অভিভাবকের বেতনদানে অপারগতাপ্রমাণে তাদের সন্তানেরা অবৈতনিক বা কম বেতনে ছাত্ররূপে গৃহীত হ'তে পারবে।

অন্যান্য প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলিও মোটামুটি একই ছাঁচে ঢালাই করা ছিল কেবল বাধ্যতার বয়স—৬-১০, ৬-১১ বা ৭-১১ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রচলিত অঞ্চলে ছেলেকে বিদ্যালয়ে না পাঠালে অভিভাবকের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এবং মাদ্রাজে ওই বয়সের বালকদের কর্মে নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া হয়। কোনো কোনো শ্রেণি বা সমাজের লোক, কোনো কোনো প্রকারের বিকলতাসম্পন্ন ছেলে এবং কোনো কোনো কারণে অন্যান্যদেরও আইনের বাধ্যতা থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা হয়। সাধারণভাবে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ব্যবস্থা দেওয়া না হ'লেও কোনো বিশেষ অঞ্চলের আইনে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের জন্য যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে "পঞ্চায়তী য়ুনিয়ন স্কিম" এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

তাছাড়া "বিস-স্কিম" ও "ডিষ্ট্রিক্ট্ স্কুল স্কিম" নামে আরো দুটি পরিকল্পনা ছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বংগীয় স্বায়ত্তশাসন-আইনে কতকগুলি গ্রামের ওপর অধিকার-সম্পন্ন "পঞ্চায়ৎ-য়ুনিয়ন" স্থাপিত হয়। পঞ্চায়তী য়ুনিয়ন স্কিমে প্রত্যেকটি পঞ্চায়ৎ য়ুনিয়নের এলাকায় একটি করে সস্তা স্কুলের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। তার বাড়ি তৈরির হাজার খানেক টাকা সরকারের কাছে পাওয়া যেত, আর চালাবার খরচের ভার পঞ্চায়েতের।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ইভান বিস নামক অফিসর বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুপাত বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক কম ছিল (বাংলা ৬·৯%, মাদ্রাজ ২৬·৯%, বোম্বাই ৮০·৭%)। কোনো কোনো পশ্চাদ্পদ অঞ্চলে কোনো বিদ্যালয় ছিল না আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি করে' প্রাইভেট স্কুল পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করছিল। তিনি প্রস্তাব করেন যে শিক্ষাবিষয়ক তদন্তের পর সরকারি, বেসরকারি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে ১½ বর্গমাইলের ব্যাসের ব্যবধানে পুনঃ স্থাপিত করতে হবে। জনসংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে পরস্পরের সংগে সামঞ্জস্য রেখে একাধিক বিদ্যালয় থাকবে। জনবসতির ঘনতা অনুসারে ৫০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ছাত্রের জন্য স্কুল করা হবে। স্কুলগুলিকে জনপ্রিয় করবার জন্য লোকে যা চায় সেইরূপ বিষয়সমূহ (যথা,—মুসলমানদের স্কুলের কোরাণ ও হিন্দুদের স্কুলে রামায়ণ মহাভারত) শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতার মানস্বরূপ সরকারি "প্রাইমারি স্কুল পরীক্ষা" হবে।

ব্যয়নির্বাহসম্বন্ধে মিঃ বিস প্রস্তাব করেন য়ুনিয়ন ও সরকার উভয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অর্ধাংশপরিমাণে বহন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে—স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানকর্তৃক শিক্ষাকর প্রবর্তিত হবে। তখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল,—গড়ে ছাত্রপ্রতি বৎসরে মাত্র ৩·৫ টাকা (বোম্বাইয়ে ৩৫৲) আর ছাত্রপ্রতি বেতনের গড় ছিল ১৷৶০ (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি)। ছাত্রপ্রতি সরকারি ব্যয় ছিল মোটে ·০২৯ টাকা (বোম্বাইয়ে ·২৬৫ টাকা) অর্থাৎ বাংলার মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক-পরিমাণে বহন করছিল।

কলিকাতা বাদে বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ও অনধীন অঞ্চলসমূহে

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ১,৭৩,০৬,২০৫ টাকা প্রাথমিক ও ১,৭৬,৭৯,০৫১ টাকা বাৎসরিক ব্যয় হবে এই হিসেব করে মিঃ বিস বলেছিলেন যে দুইকোটি টাকা পৌনঃপৌনিক ব্যয়ে বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

মিঃ বিসের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছিল। বছরে প্রায় কুড়িলক্ষ ছেলে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে আরম্ভ করেছিল এবং প্রত্যেক দুই বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কয়েক বৎসর ধরে' বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে ৮৪,০০,০০০ টাকা খরচ হচ্ছে লাগলো। তার মধ্যে ২৬,০০,০০০ টাকা সরকার, ১,৮০,০০০ টাকা জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি এবং বাকি ৪০,০০,০০০ টাকা বেতন ও দান থেকে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু অংকের দিক থেকে দেখতে ভাল হ'লেও অপচয় ও জড়তার ফলে এই শিক্ষার প্রসারে দেশ বাস্তবিকভাবে সাক্ষরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল না।

তৃতীয় পরিকল্পনাটি বৃহত্তর ছিল এবং সেটিকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বংগীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত করে' দেওয়া হয়। এই আইনে বাংলার প্রত্যেক জিলায় সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের নিয়ে "স্কুলবোর্ড" স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে বেসরকারি ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির স্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করার ও শিক্ষাকর ও সরকারি অর্থসাহায্যে তার ব্যবস্থা করার এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাকে আবশ্যিক করার ভার ওই বোর্ডের ওপর দেওয়া হবে।

অন্য স্কুলের সাহায্য, স্বীকৃতি, শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ড ফণ্ড বা এনুইটির ব্যবস্থা করা এবং সরকারের অনুমতিক্রমে য়ুনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েতের দ্বারা স্কুল বাড়ির মেরামত করানোও এদের কর্তব্যের অন্তর্গত হবে।

সাধারণ্যের দাবীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থার কথাও এই আইনে ছিল। তাছাড়া জিলাস্কুলবোর্ডসম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারের ও নির্দেশনের জন্য একটি প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষাকমিটির ব্যবস্থা দেওয়া হয়। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা, প্রদেশের পাঁচটি বিভাগের জিলাবোর্ডের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত দু'টি ক'রে' (একজন হিন্দু, একজন মুসলমান) সদস্য এবং বংগ সরকারের মনোনীত পাঁচজন (তারমধ্যে দুইজন তপশীলভুক্ত শ্রেণির) সভ্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে।

সরকারি অর্থাভাবের ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার জন্য এই আইনের সব অংশ কার্যকর হয়নি,--যোলটি মাত্র জিলায় স্কুলবোর্ড স্থাপিত হয়েছিল এবং সেসব অঞ্চলেও ও করগ্রহণের ব্যবস্থা হয়নি।

বাংলাসরকারের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়—

এই শিক্ষার স্থায়িত্বকাল পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে দুই বৎসর করা হবে কিন্তু ছাত্র একবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লে তাকে চার বৎসরকাল সমাপ্ত করতে হবে এবং কেউ এক শ্রেণিতে দুই বৎসর কাটাবেনা।

পাঠ্যবস্তু গ্রামোপযোগী হবে, যথা, লেখাপড়া, অংক, স্বাস্থ্য, স্থানীয় ভূগোল ও গ্রামসংগঠন। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে স্থানোপযোগী শিক্ষাবৈচিত্র্য সাধিত হবে।

যারা বেতন দিতে পারবে তারা দেবে এবং যারা দারিদ্র্যের জন্য দিতে অপারগ তাদের দিতে হবে না।

বর্তমান স্কুলগুলির মান, অবস্থান ও ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় স্কুল স্থাপিত হতে পারে সে বিষয়ে তদন্ত করে' চারপাঁচ বর্গমাইলের মধ্যে বা প্রত্যেক তিন হাজার লোকের মধ্যে একটি হিসেবে যোল হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সরকারি ভাণ্ডারে অর্থস্বাচ্ছল্য ঘটলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

জনসংখ্যানুসারে সমগ্র বাংলাদেশকে যোল হাজার বিদ্যালয় বিভাগে বিভক্ত করে' প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় স্থানে একটি করে' চারশ্রেণিসমন্বিত বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণিতে কুড়ি ও অন্য শ্রেণিগুলিতে ত্রিশজন করে' ছাত্র থাকবে।

যে সব ছোট ছোট শিশুরা দূরপথ অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না তাদের জন্য বিকেন্দ্রিতভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয়বিভাগে দুইটি করে' প্রথম দুইশ্রেণিসমন্বিত বিদ্যালয় হবে। এগুলির প্রথম শ্রেণিতে ত্রিশ ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কুড়িজন করে' ছাত্র পড়বে।

প্রত্যেক অঞ্চলে সবগুলি বিদ্যালয় মিলিয়ে ১ম শ্রেণিতে নব্বই, ২য় শ্রেণিতে ষাট এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে ত্রিশজন করে ছাত্র থাকবে। এইভাবে যোলো হাজার বিদ্যালয়বিভাগে সর্বসমেত ৩৩,৬০,০০০ জন ছাত্র পড়তে পারবে।

স্কুলের চারটি শ্রেণিতে একেকটি হিসেবে প্রত্যেক স্কুলে চারজন শিক্ষক থাকবেন। ষোলো হাজার স্কুলের চৌষট্টি হাজার শিক্ষক দিনে দুইবার শিক্ষা দিয়ে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবেন।

সবগুলি বিদ্যালয় দিনে চার ঘণ্টা করে' বসবে। সময়ের নিয়ন্ত্রণদ্বারা শিক্ষকদের পক্ষে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চার ঘণ্টা এবং বিকেন্দ্রিত বিদ্যালয়ে দুই ঘণ্টা কাজ করার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধান শিক্ষকদের কুড়ি টাকা ও অন্যান্য শিক্ষকদের পোনেরো টাকা মাসিক বেতন হবে। জিলায় জিলায় শিবির স্থাপনদ্বারা এদের সংক্ষিপ্তভাবে পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সময়ে পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলগুলির প্রয়োজনসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠ্যক্রম সাধারণভাবে মক্তব ও পাটশালা উভয়ের উপযোগী করে' রচিত হবে এবং হিন্দুমুসলমান ছাত্রদের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান সেগুলিকে মক্তব বলে' গণ্য করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে মুসলমান ছেলেদের জন্য পৃথক মক্তব স্থাপিত হবে।

ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হ'লে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সহশিক্ষাপ্রচলিত বা বালকদের বিদ্যালয়ে পড়বার জন্য বালিকাদের বাধ্য করা হবে না।

প্রত্যেক পঁচিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি করে' মধ্য-ভার্নাকুলার বিদ্যালয় স্থাপিত হবে এবং ক্রমশঃ সেগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়পিছু একটি মধ্য-ভার্নাকুলার বিদ্যালয় করা হবে। অর্থাৎ প্রথমে ৬৪০টি মধ্য-বিদ্যালয় স্থাপিত করে' ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা ৩২০০তে বর্ধিত হবে।

ওই বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি, গ্রামবিজ্ঞান প্রভৃতি পড়ানো হবে এবং ইংরেজি বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে থাকবে। যারা উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তে চাইবে তাদের জন্য মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হবে। মধ্যশিক্ষার সৌকর্যের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পরীক্ষার ফলের ওপর অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হবে।

প্রতিশত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করে' সাবইন্সপেক্টর থাকবে। তাদের অর্ধাংশ আধাআধিভাবে প্রাথমিক ও মধ্যবিধদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করা হ'বে কিন্তু এরূপভাবে নিযুক্ত সাবইন্সপেক্টরদের

বেতন অন্যান্য সাবইন্সপেক্টরদের চেয়ে কম হবে। গ্রাম্য জনতাকে গ্রামোন্নয়নে শিক্ষিত করা এদের কর্তব্যের অন্তর্গত হবে।

গ্রামে গ্রামে "লাইব্রেরী হল" স্থাপিত করে' উপযুক্ত গ্রন্থসমূহ রাখা হবে।

এই প্রস্তাবদ্বারা স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার অপচয় ও নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের রোধ করতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও একেক শিক্ষকের একাধিক কেন্দ্রে শিক্ষাদানের বিষয়ে সাধারণ্যের প্রবল বিরোধিতার ফলে এটি কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

তারপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার একটি নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল :—

প্রথমতঃ—দেশময় বিদ্যালয়ের সুবিতরণের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের অধিগম্য করা।

দ্বিতীয়তঃ—চারবৎসরের শিক্ষাসমাপ্তি বাধ্যতামূলক করে' অপচয়ের নিবারণ করা।

তৃতীয়তঃ—সুশিক্ষিত, শিক্ষাব্রতী ও অপেক্ষাকৃতভাবে উচ্চতর বেতনভুক একদল প্রাথমিক শিক্ষকের সৃষ্টিদ্বারা এর মানোন্নয়ন। এই সম্পর্কে প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন যথাক্রমে ২৫৷৷০/৩০৲ ও ২০৷৷০/২৫৲ করার প্রস্তাব করে উন্নয়নের দিকে প্রথম পদক্ষেপরূপে প্রধান শিক্ষকের ১৬৲, শিক্ষণপ্রাপ্ত অন্য শিক্ষকের ১২৲ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত নন যাঁরা সেরূপ শিক্ষকের ১০৲ বলে' ধার্য্য করা হয়। অন্যদিকে, ব্যয়লাঘবের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়প্রতি চারের পরিবর্তে তিনটি শিক্ষকনিয়োগের প্রস্তাব করে' বলা হয় যে জনবিরল অঞ্চলে দুই বা একজনও থাকতে পারেন।

চতুর্থতঃ—অবৈতনিক ইন্সপেক্টরের পদের সৃষ্টির কথা বলা হয়।

এছাড়া এই প্রস্তাবে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কৃত অন্যান্য প্রস্তাবগুলি অব্যাহত থাকে।

এইভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অশান্তি, সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার মধ্য দিয়েও প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিণতি হয়েছিল তার একটি পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল :—

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৬০,০২৭	১,৯৭,২২৬
” ” ছাত্রসংখ্যা	৬৩,১০,৫৪১	১০৫,৪১,৭৯০
” ” ব্যয়	৪,৯৪,৬৯,০৮০৲	৮.৪ কোটি টাকা

শিক্ষার বৃদ্ধি কম হ'লেও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপেক্ষা

ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি বেশি হয়েছিল এবং পূর্বে যেখানে বিদ্যালয়পিছু ছাত্রসংখ্যা পঁয়ষট্টির কম ছিল সেখানে শতাধিক হয়েছিল। জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যালয়বয়সী ছয় কোটি শিশুর মধ্যে এক কোটির কিছু বেশি ছেলেপিলে শিক্ষা পাচ্ছিল,—তাদের মধ্যে পনেরো লক্ষ মেয়ে ছিল। প্রথম শ্রেণিতে যত ছাত্র ভর্তি হচ্ছিল, তার মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যথাক্রমে শতকরা ২৩ ও ১৩ জন মাত্র পৌঁছচ্ছিল। শিক্ষাপ্রচেষ্টার শতকরা আশীভাগ প্রায় অপচিত হচ্ছিল।

তখন শিক্ষার সমগ্র ব্যয় ছিল ২৮ কোটি টাকা, তারমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হ'ত ৮·৪ কোটি টাকা। তারমধ্যে মেয়েদের জন্যে খরচ হ'ত ১ ৪ কোটি টাকা। ছেলেদের জন্য ব্যয়িত ৭ কোটি টাকা পাওয়া যেত নিম্নলিখিতভাবে—

সরকারি ভাণ্ডার থেকে	৩·৪৫ কোটি টাকা
স্কুলবোর্ড "	২·৪ " "
প্রাপ্ত বেতন "	·৬৪ " "
অন্যান্য স্থান "	·৬৯ " "
মোট	৭ " "

প্রায় কোনো অঞ্চলেই শিক্ষাকরের প্রবর্তন হয়নি বলে' স্কুলবোর্ডের ফণ্ডের টাকা আঞ্চলিক স্বায়ত্তসাশনপ্রতিষ্ঠানের থেকে পাওয়া যেত। সেই অর্থে বোর্ডের স্কুলগুলির সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ আর অন্যান্য স্বীকৃত স্কুলে অর্থ সাহায্য করা হ'ত।

অর্থাভাবের জন্য শিক্ষকের বেতন কম ছিল [গড়ে মাসিক তিন থেকে ছয় টাকা] বলে' উপযোগী শিক্ষক পাওয়া যেতনা, স্কুলের মধ্যে অধিকাংশই একশিক্ষক-বিদ্যালয় ছিল, শিক্ষোপকরণাদি থাকতো না, বাড়ীগুলির অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অমেরামতি অবস্থা ছিল এবং সর্বোপরি পাঠ্যক্রম বইমুখো ও অকেজো ছিল বলে' দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ্যের কোনো কাজে লাগতো না।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মধ্যে কলিকাতার ছয় থেকে দশ বৎসরের মেয়েদের ও ছয় থেকে বার বৎসরের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর্পোরেশনকে বৎসরে ন্যূনপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশন ওই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের অনুমতি চায়।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার করে' তাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের অনুমতি চায়।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল হ'লেও আশাপ্রদ ছিল না। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের কোনো কোনো অংশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। আবশ্যিকতা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলির অনুমতিমূলকতার সুযোগ নিয়ে স্বায়ত্তশাসনকর্তৃপক্ষ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দায়িত্ব এড়াচ্ছিলেন। নাগরিক অঞ্চলে ওই ব্যবস্থা যেটুকু বা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে তাও হয়নি। সমগ্র বৃটিশ ভারতে মাত্র ১৩,০৭২টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার, আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, তারমধ্যে এক পঞ্জাবেই ১০,৪৫০টি ছিল। এই ব্যবস্থাটুকুও প্রধানত ছেলেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে ভারতে তাকে সার্বজনীন করতে পাঁচশত বৎসর লাগবার কথা।

যেসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছিল সেখানেও আইনের গলদের দরুণ বহুলোকে ছাড়া পেয়ে যেত এবং নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনজনিত অপচয়ের অনুপাতও অত্যন্ত বেশি ছিল।

মানোন্নয়নের জন্য কিছু কিছু সরকারি প্রচেষ্টা হয়েছিল। বিদ্যালয়পিছু ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৭%তে দাঁড়িয়েছিল। অপরপক্ষে পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বলে' স্কুলের অব্যবস্থা সমানভাবে ছিল।

আদর্শগত মতভেদ শিক্ষাক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করেছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে স্বাক্ষরতার পরিমাণ জনসংখ্যার ৩·৫% থেকে ৮% হওয়াটা যথেষ্ট ছিলনা বলে' ভারতীয় শিক্ষাবিদেরা সংস্কার অপেক্ষা প্রসারের প্রয়োজন বেশি বোধ করেছিলেন। তাঁরা সরকারি "চুঁইয়ে-নামার" পরিবর্তে ধারাবর্ষণ চেয়েছিলেন এবং অনেকে হার্টগ সাহেবের শিক্ষার অপচয় সম্বন্ধীয় হিসাবটিকে অনির্ভরযোগ্য ও অতিরঞ্জিত বলেছিলেন। এইভাবে সরকারি বেসরকারি মতের বিচ্ছেদ গভীর হ'তে হ'তে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পটপরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল।

মিশনারিদের কার্যকলাপ

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্বসমেত ১৪,৩৪১টি মিশনারি প্রতিষ্ঠানে ১,১১,৮,২০০ জন ছাত্র এবং সেগুলির পরিচালনের ব্যয় ৩,৮২,০১,২৪১ টাকা ছিল। তাছাড়া তাঁরা ইংগ-ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

মিশনারি শিক্ষার নানাসমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এই যুগে তিনটি কমিটির বৈঠক হয়। যুগের প্রথম দিকে "ফ্রেজার কমিশন" বসে এবং তার সুপারিশের ফলে মিশনারিরা বিভিন্নস্থানে কতকগুলি "সমাজকেন্দ্র" (Community Centres) স্থাপিত করেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সেগুলিকে তাঁরা ভালভাবে চালাতে পারেননি।

এই সময়ে মিশনারিদের কাজ আদিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলে বেশি হচ্ছিল কিন্তু পাছে খৃষ্টান সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটে এই ভয়ে অনেক মিশনারি আদিবাসীদের অধিক সংখ্যায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার বিরোধী ছিলেন। তাই প্রচার সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান এপিসকোপাল চার্চের কার্যাধ্যক্ষ ডাঃ জে, এস, পিকেটকে সভাপতি করে একটি কমিটি বসে এবং সাধারণ্যের মধ্যে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের এবং ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠনের প্রস্তাব করে।

উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজের "মাষ্টার" (Master) ডাঃ এ, ডি, লিণ্ডজের সভানেতৃত্বে ভারতীয় মিশনারিদের একটি সভা হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এর রিপোর্টে খৃষ্টান ছাত্র ও শিক্ষকগণের সংখ্যাল্পতার দরুণ তাদের কলেজগুলিতে খৃষ্টানোচিত আবহাওয়া বজায় থাকে না বলে' দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তখন মিশনারি কলেজগুলিতে খৃষ্টান ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত যথাক্রমে দক্ষিণ ভারতে ২৬% ও ৫৪% এবং উত্তর ভারতে ৬% ও ৪২% ছিল। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে খৃষ্টান সমাজের দারিদ্র্যের ফলে যথার্থ বিদ্যানুরাগিতা গড়ে' উঠছিল না। খৃষ্টানদের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব এই সম্মেলনে করা হ'লেও তা গৃহীত হয়নি।

এই সময়ে মোগা, দোর্ণাকল এলাহাবাদ, মার্তণ্ডম মেদক, অনুকুলেশ্বর প্রভৃতি স্থলে শিক্ষকশিক্ষণ ও গ্রামীণ শিক্ষার জন্য মিশনারিদের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র ছিল।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা

দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রিগণ সর্বপ্রথমে বয়স্কশিক্ষা-ব্যস্থার ভার নেন। জনগণের অংশরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশরূপে কিছু কিছু এবং মিশনারিদের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু এর আয়োজন হ'লেও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই হয়নি।

বৃত্তি শিক্ষা

বিভিন্ন রিপোর্টে বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তাব এবং মাধ্যমিক স্তরে তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ও আলোচনা এই পরিচ্ছেদের পূর্বাংশে করা হয়েছে। এই শতাব্দির

প্রথমেই (১৯০৫) রাষ্ট্রীয় বৃত্তি (State Scholarship) দ্বারা ছাত্রদের শিল্পশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠানোর নীতি প্রবর্তিত হয় এবং বস্ত্র, খনিজ, চীনামাটি, কাঁচ, চামড়া, দেশলাই, চিনি, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাজ শেখার জন্য অনেক ছাত্রকে পাঠানোও হয় কিন্তু এই সংকীর্ণ ব্যবস্থায় দেশের লোক সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য লিটন কমিটির বৈঠক হয় এবং তার রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে বাণিজ্যসংকোচনের ফলে তখন বিলিতি কারখানাওয়ালারা ভারতীয় ছাত্র নিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং বস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পের অনেক গোপনীয় তথ্য ভারতীয়দের শেখাচ্ছিল না।

ভারতীয় শিল্পপতিরাও বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের প্রথম থেকে কিছু কিছু শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে' তুলেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাংগালোরের ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির (ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স) স্যর জামসেদজি টাটার দানে স্থাপিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভাগ স্থাপিত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে "রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার" কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণাগারের জন্য সুপারিশ করায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ" স্থাপিত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অল্ ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু, এইভাবে এই যুগে শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার চেতনা জাগ্রত হ'লেও দেশের যথেষ্ট শিল্পোন্নতির অভাবেই নূতন উদ্যোগগুলির ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ছিল।

১৯৩৮—১৯৪৭

পরিকল্পনা

এই দশকটিকে যুগসন্ধির কাল বলে' অভিহিত করা যায়। পূর্ববর্তী যুগ যদি সংকট ও বিক্ষোভের কাল হয়ে থাকে, এই যুগ তবে সংগ্রাম ও উপপ্লবের সময়। সাইমন কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফল বুঝবার আগেই একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও অন্যদিকে বেয়াল্লিশের আন্দোলন দেশকে সংকটাপন্ন করেছিল, কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যে স্থষ্টির বীজ নিহিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে যে কয়টি শিল্পপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তা যুদ্ধপরবর্তী শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করে আর এই সময়ের পরেই হয় ভারতবর্ষে স্বাধীনতার স্বর্যোদয়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

দেশে যখনই কোনো একটি নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন আসে তখন শিক্ষা-ক্ষেত্রেও তার ছায়াপাত হয়। এই নিয়মে ভারতের রাজনীতির কর্ণধারস্বরূপ হয়ে মহাত্মা গান্ধি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষানীতির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের হরিপুরা অধিবেশনে এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের করাচী অধিবেশনে সর্বসাধারণের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছিল। গান্ধিজি ওই শিক্ষাকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার কথা ভাবলেন এবং তার পাশাপাশি বইমুখী, জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষার বিরোধিতাও তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর শিক্ষাদর্শ হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই খৃষ্টাব্দেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রসিভা স্থাপিত হয়। জনশিক্ষা ও মদ্যপান নিবারণ তাঁদের গৃহীত নীতি ছিল। প্রথমটির জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন ছিল তা তখনকার রাজস্ব থেকে দেওয়া সম্ভব বোধহয় হয়নি আর দ্বিতীয়টির অনুসরণে রাজস্বের হ্রাস অনিবার্য ছিল। এই দুই কারণে স্বপ্রতিষ্ঠ শিক্ষানীতির প্রয়োজন আরো বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তাছাড়া গান্ধিজি বলেন যে শিক্ষা হবে মাতৃভাষামাধ্যম ও শিল্পভিত্তি, তার মূলে অহিংসার আদর্শ থাকবে এবং তা গ্রাম্যজীবনের উপযোগী হবে।

ওই বৎসরই অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধির সভানেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করে' তাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

১। দেশে ব্যাপকভাবে সাত বৎসরবাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন চাই।

২। তার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া চাই।

৩। শিশুর পরিবেশানুযায়ী কোনো উৎপাদনমূলক কায়িক কর্মকে কেন্দ্র করে' তার ভিত্তিতে অন্যান্য শক্তিকে পরিণতি দেওয়া চাই।

৪। কালক্রমে যাতে এই শিক্ষব্যবস্থা থেকে শিক্ষাকদের বেতন উপার্জিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

এই সভায় দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করে' একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে ওই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। ওয়ার্ধার সংগে সংযোগের কারণে পরিকল্পনাটি "ওয়ার্ধা পরিকল্পনা" নামে পরিচিত। তার প্রধান বিশেষত্বগুলি হ'ল ঃ—

১। বুনিয়াদরূপে একটি শিল্পের ব্যবহার দ্বারা (Basic Craft) শিল্পমাধ্যম শিক্ষাদান।

২। শিক্ষাকে শিক্ষকের বেতনের বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ছাত্রদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ করা।

৩। কায়িক শ্রমকে কর্মজীবনের ভিত্তি ও অহিংসাধর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা।

৪। শিক্ষাকে গৃহ, গ্রাম এবং গ্রামীণ শিল্প ও জীবিকার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত করা।

এই শিক্ষাকে সাত থেকে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বৃত্তির মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষার মানে ইংরেজি ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় পড়িয়ে দেওয়া হবে। ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থাপিত করা হয়েছে এবং হিন্দীভাষা যেখানে বলা হয়না সেরূপ অঞ্চলেও বিদ্যালয়কালের পঞ্চম ও ষষ্ঠবর্ষে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাহ্যিক পরীক্ষা বন্ধ করার এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সহশিক্ষার সমর্থন করা হয়েছে।

গান্ধিদর্শন অনুযায়ী পরিকল্পিত এই শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদরূপে গ্রাহ্য, শিশুজীবনের প্রয়োজন ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে' গঠিত এবং

দেশের সমাজজীবনের সংগে অনুবন্ধ বলে' একে "বুনিয়াদী" এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলা হয়েছে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে পর এর অনেক অংশের খুব সমালোচনা হয়।

প্রথমতঃ শিক্ষা থেকে শিক্ষকের বেতন উপার্জন অত্যন্ত কঠিন এবং আদর্শের দিক দিয়ে অগণতান্ত্রিক।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ের সব দিক একটিমাত্র ভিত্তিভুত শিল্পের মাধ্যমে শেখানো সম্ভব নয়, উপরন্তু বিদ্যালয়দিবসে সাড়ে পাঁচঘণ্টার ভেতরে প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টার শিল্পশিক্ষা অত্যন্ত বেশি।

তৃতীয়তঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা থেকে এই শিক্ষা বিযুক্ত, কেবমাত্র গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনসাধন এর উদ্দেশ্য এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্ন এতে পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হয়নি।

এই সমালোচনা অনেকাংশ সত্য হ'লেও এই পরিকল্পনা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন আদর্শের সূচনা করে এবং বইয়ের অত্যাচারমুক্ত, কর্মভিত্তি এই শিক্ষা যে অধিক নৈপুণ্যদায়ক ও জীবনোপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে নিহিত শ্রমের মর্যাদা ও কর্মের সাম্যের আদর্শের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের দেশের পক্ষে গভীর।

এই প্রথম পরিকল্পনার পর বিভিন্ন আলোচনার বৈঠকে এই নীতির কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কারানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসমন্ত্রিত্বের স্থাপন হবার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পুনায় বুনিয়াদি শিক্ষার জাতীয় সম্মেলন হয়। এখানে গৃহীত প্রস্তাবে মাতৃভাষা ভালভাবে আয়ত্ত হওয়ার আগে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করার বিরোধিতা করা হয় এবং বুনিয়াদি শিক্ষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উল্লেখ করে' এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্বগ্রহণের দাবী করা হয়। এই সংগে বুনিয়াদি শিক্ষার কতকগুলি বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যথা, এতে কেবল শিল্পের সংগে নয়, সমগ্র সামাজিক জীবনের সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত হয় ও কেন্দ্রীয় শিল্পনির্বাচনের সময়ে আঞ্চলিক প্রয়োজনের বিচার করা হয়। শিল্পশিক্ষার বিষয়ে বলা হয় যে বুনিয়াদি শিক্ষার শিক্ষকদের পক্ষে শিল্পশিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত এবং সরকারি ও শিক্ষাবিভাগীয় সহায়তায় বিদ্যালয়ে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থার দাবী করা হয়।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সামাজিক জীবনের সংগে অনুবন্ধের কথাটি শিক্ষাতত্ত্বের

দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পূর্বে শিল্পকেই বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবার শিক্ষার তিনটি ভিত্তি নেওয়া হ'ল,—সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিল্প।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর জামিয়ানগরে দ্বিতীয় বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত বারটি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রমাণিত ফলাফল বিষয়ে বলা হয় যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বেশি সক্রিয়, স্বনির্ভর আত্মপ্রকাশের ও সমবেতভাবে কাজের ক্ষমতাশালী এবং সামাজিক কুসংস্কারহীন হয়ে থাকে,—তাদের আচারব্যবহার ও স্বাস্থ্য বেশি উন্নত হয়। আরেকটিতে বলা হয় যে শিল্পের সংগে অনুবন্ধ কৃত্রিমভাবে, জোর করে' করা হবেনা,—শিল্প, সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই তিনটির ওপর সমান জোর দেওয়া হবে পাঠ্যক্রম নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত হয়—

১। মূলশিল্প।

২। মাতৃভাষা।

৩। গণিত।

৪। সমাজবিজ্ঞান—ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান সমন্বিত।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান—প্রকৃতিপাঠ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা (physiology), স্বাস্থ্য, রসায়ন, মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যার সংগে শরীরচর্চা শেখানো হবে।

৬। চারুশিল্প ও কলা।

৭। সংগীত।

৮। হিন্দুস্থানী।

সেবাগ্রামের সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ বৃহত্তরভাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে একে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকারভেদমাত্র থেকে উন্নীত করে' শিক্ষার সর্বস্তরে প্রসারিত ও জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে চাওয়া হয়। সভাপতি শ্রীমশরুওয়ালা তাঁর ভাষণে একে সামাজিক বিপ্লবের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার কথা বলেন। প্রাক্‌বিদ্যালয়ী, প্রাথমিকোত্তর ও বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি শিক্ষানীতির প্রয়োগের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জাতীয় পরিকল্পনাসভার শিক্ষাপরিকল্পনা

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয় এবং তার দুটি উপসভা শিক্ষা-বিষয়ক তদন্তে নিযুক্ত হয়। একটি স্যর রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে শিল্পশিক্ষা ও গবেষণাবিষয়ে আলোচনা করে। মধ্যবর্তী কালে মহাযুদ্ধ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে এগুলির কাজ অগ্রসর হ'তে পারেনি বলে' দশবৎসর পরে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হয়। বৈকল্পিক কিণ্ডারগার্টেন স্তরের উল্লেখ করে সাত থেকে চোদ্দ পোনেরো বৎসর বয়স্কদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিকল্পনা এঁরা রচনা করেন তাতে শিল্পকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে ও বীজগণিত যোগ করে' ওয়ার্ধাপরিকল্পনার পাঠ্যক্রম গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষাকে দুই শাখায় বিভক্ত করে' একদিকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক (যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে না তাদের জন্য) শিল্প বা বৃত্তিশিক্ষা ও অন্যদিকে উচ্চবুদ্ধি ছাত্রদের জন্য তিনচার বৎসর স্থায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। মাতৃভাষা এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম হবে, বিদেশী ভাষা (ইংরেজি বাঞ্ছনীয়) দ্বিতীয় ভাষারূপে আবশ্যিক হবে এবং আবশ্যিক ও বৈকল্পিক মিলিয়ে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে।

বৃত্তিশাখায় যারা শিক্ষা সমাপ্ত করবে তারা কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজিত হবে এবং অবসরকালে বা ছুটি নিয়ে অধিকতর জ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। শিল্পবৃত্তি এবং সাধারণ মাধ্যমিক উভয় শাখার থেকেই আরো অগ্রসর হয়ে শিক্ষণ, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বৃত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ খোলা থাকবে।

সর্বভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনের শিক্ষাপুনর্গঠন পরিকল্পনা

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রী কে, এস, বকিলের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনে নির্বাচিত একটি কমিটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও উড-এবট রিপোর্টের সমন্বয়ে একটি শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করে এবং তা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনে সামান্য পরিবর্তন-দ্বারা অনুমোদিত হয়। এতে শিক্ষাকে প্রাক্‌বিদ্যালয়ী, প্রাথমিক বা বুনিয়াদি, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ী এই চারিটি স্তরে ভাগ করে' নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ করা হয় :—

১। ছয়সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেপিলেদের প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি রীতির কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

২। ছয়সাত থেকে তেরোচোদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। এর প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শনৈঃ এবং পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কালক্রমে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা চাই। এই শিক্ষার শেষে বাইরের পরীক্ষা থাকবেনা, ভেতরের বিচারে ছাড়পত্র দেওয়া হবে এবং ছাত্রগণ শিল্পবৃত্তি অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে একটি ধারা বেছে নিতে পারবে।

৩। তেরোচোদ্দ থেকে সতের আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। তার বিচিত্র শাখা থাকবে এবং বাহ্যিক পরীক্ষার পরিবর্তে আভ্যন্তরিক বিচারে ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার দিকে যাবে তারা তিনবৎসর পাঠ করে' কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সে "ডিগ্রি" পাবে। যন্ত্র, চারু ও কারুশিল্প, বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও বিভিন্ন বৃত্তিবিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া হবে। শ্রেষ্ঠতম মনীষা স্নাতকোত্তর শিক্ষার দিকে ধাবিত হবে।

খের কমিটি

জাকির হোসেন এবং উড-এবট কমিটির রিপোর্ট একত্রে পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার দ্বারা নির্বাচিত দুটি কমিটির অধিবেশন বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি, জি, খেরের সভাপতিত্বে পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম কমিটি বসে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, তার প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল—

১। বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনা প্রথমে গ্রামে গ্রহণ করতে হবে।

২। আবশ্যিকতার বয়স ছয় থেকে চোদ্দ হ'লেও পাঁচ বছরের ছেলেদের বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে।

৩। পঞ্চম শ্রেণির পর বা এগারো বৎসর বয়সে ছাত্রদের বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ দিতে হবে।

৪। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে।

৫। সর্বভারতীয় ভাষারূপে উর্দু ও নাগরীলিপিতে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা গৃহীত হবে।

৬। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিষয়ে ওয়ার্ধাপরিকল্পনা ও উড-এবট

রিপোর্টের মিলের উল্লেখ করে' প্রস্তাব করা হয়েছে যে নিচের শ্রেণিতে কাজ হবে বিচিত্র আর ক্রমশঃ শ্রেণি-উন্নয়নের সংগে তা শিল্পস্তরে উন্নীত হবে। শিল্পসৃষ্টির বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থে প্রযুক্ত হবে।

৭। যে-সব সাংস্কৃতিক বিষয়ের মূলশিল্পের সংগে অনুবন্ধ সম্ভব হবে না। সেগুলি পৃথক শেখানো হবে।

৮। শিক্ষকশিক্ষণের পুনর্গঠন ও শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। কোনো শিক্ষক কুড়িটাকার কম বেতন পাবে না।

৯। মেয়েদের ও উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

১০। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে তবেই বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত করতে হবে।

১১। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে বিকল্প ভাষারূপে ইংরেজি পড়ানো হবে না।

১২। বর্তমানের মতো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু তা রাষ্ট্রের খরচে নয়।

১৩। বুনিয়াদি শিক্ষার শেষে বাইরের পরীক্ষার পরিবর্তে আভ্যন্তরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

১৪। পরীক্ষাফল তত্ত্বাবধায়কের অধীন থাকলেও শ্রেণি-উন্নয়নের বিচার বিদ্যালয় করবে।

দ্বিতীয় খের কমিটির বৈঠক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হয় এবং তার প্রস্তাবসমূহ নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল :—

১। প্রাক্ বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বর্তমানে সার্বজনীনভাবে তার ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়।

২। ছয় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেপিলেদের বুনিয়াদি শিক্ষা নিম্ন (পাঁচবৎসর স্থায়ী) ও উচ্চ (তিনবৎসর স্থায়ী) এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে এবং নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পরে ছাত্রেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

৩। নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পরে ছাত্রগণের অন্তত আরো ছয় বৎসর শিক্ষা পাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে' উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষার পর (অষ্টম শ্রেণির পর) ছাত্রদের আরো শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করতে হবে।

৪। বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনবে এবং আবশ্যিক সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমন্বিত বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দেবে।

৫। রন্ধন, সীবন, বস্ত্রধৌতি, গৃহশিল্প, শিশুপালন, প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশে গৃহবিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা বুনিয়াদি শিক্ষাকে মেয়েদের উপযোগী করা হবে।

৬। বিদ্যালয়ে উৎপাদিত জিনিষের বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত করতে হবে।

এই দুই খের-কমিটির রিপোর্টের অধিকাংশ সুপারিশ পরবর্তী কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার নিযুক্ত সার্জেন্ট কমিটির দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল।

সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষপোদেষ্টৃসভাকর্তৃক স্যর জন সার্জেন্টের সভাপতিত্বে যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় তার ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্ট সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। স্যর জন সার্জেন্ট ভারতসরকারের তৎকালীন শিক্ষোপদেষ্টা ছিলেন, তিনি বড়লাটের অনুরোধে ওই কমিটির সাভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রিপোর্টের সময় পর্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সমাজসেবা, বিদ্যার্থিমংগল, বিদ্যালয়গৃহ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণ ও নিয়োগ, শিক্ষাবিভাগের উর্ধতন কর্মচারী নিয়োগ, বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণাদ্বারা জাকির হোসেন কমিটি, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভা, খের কমিটির প্রভৃতির গৃহীত নীতি ও প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। বস্তুত, সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট একটি নূতন পরিকল্পনা নয়,—বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপকক্ষেত্রে সমন্বয় এবং এইভাবে আংশিককে জাতীয়ে পরিণত করাই এর মস্ত দান।

এই রিপোর্ট এক বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে রচিত। প্রথমতঃ এই বহুব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার আর্থিক সুপারিশগুলিকে জাতীয় প্রয়োজনের ন্যূনতম মান বলে' দাবী করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা তার ওপর নূতন শিক্ষার কাঠাম স্থাপিত করা সম্ভব নয় বলে' আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়েছে। নূতন ভাবধারায় স্থাপিত সার্বজনীন, আবশ্যিক ও

অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার খসড়া দেওয়া হয়েছে। নিম্নবুনিয়াদি বা প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার করা হবে। শিক্ষকের উন্নতি দ্বারা শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে। বিদ্যালয়ের উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা হবে। ধর্মশিক্ষা স্ত্রীপুরুষ ও জাতিধর্ম-বিশেষহীন, শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংশরূপে গৃহীত হবে। শিক্ষা পরীক্ষাশাসনমুক্ত হবে এবং পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হবে।

এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণতার কাল চল্লিশ বছর বলে' নির্ধারিত করা হয়েছে—প্রথম পাঁচ বৎসর সার্জেণ্ট রিপোর্টের প্রদর্শিত পথে পূর্ণতর পরিকল্পনার কাল আর তারপর সাতটি পঞ্চবার্ষিকীতে শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনায় যতদূর সম্ভব শীঘ্র ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবান্তে বলা হয়েছে যে উপযুক্ত শিক্ষক ও গৃহোপকরণাদির অভাবে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পুরো চল্লিশ বছর সময় লাগবে।

খের-কমিটির নির্ধারিত পাঠ্যক্রমকে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রমরূপে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। দুই ভাগে বিভক্ত (নিম্ন ৬-১১, উচ্চ ১১-১৪) বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ ক'রে' কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় শিল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শিল্পনির্বাচনে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

অর্থ নৈতিক দিকে বুনিয়াদি শিক্ষানীতির থেকে পার্থক্য ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার ব্যয় যে শিশুর শিল্পকর্ম থেকে নির্বাহিত হতে পারে সেকথা স্বীকার করা হয়নি,—লব্ধ অর্থ থেকে বাড়তি উপকরণ কেনা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে ছাত্রকে স্বকর্মনিপুণ নাগরিকে পরিণত করা,—ব্যয়ের দিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা নয়। এইজন্য উচ্চবুনিয়াদি স্তরে বিশেষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা-সাপেক্ষ কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং শিক্ষাসমাপ্তির পরও বিভিন্ন জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাড়িয়ে চলতে উৎসাহ দেওয়া হবে।

শিক্ষকের উপযোগিতার ওপর শিক্ষার মান নির্ভর করে বলে' প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থা ও বেতনের হারকে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার মতানুসারে এদের মানোন্নয়ন ও শিক্ষকনিয়োগের সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছোট ছেলেপিলেদের পক্ষে মেয়েদের কাছে শিক্ষা পাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে' শিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যানুপাতবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক (৬-১৪) শিক্ষাপরিকল্পনার পূর্ণ অবস্থার সামুদয়িক ব্যয় বৎসরে দুইশত কোটি টাকা হবে বলে' হিসেব করা হয়েছে। নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঁচকোটি পনেরো লক্ষ ছাত্রের জন্য আঠেরো লক্ষ শিক্ষকশিক্ষিকার প্রয়োজন হবে এবং তাদের সাধারণ বেতন ৩০৲।৫০৲ হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনাপ্রসংগে শিশুকাননশ্রেণির বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষার ঐচ্ছিক অথচ অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাগরিক অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্যবশত পৃথক শিশুবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে,—অন্যত্র নিম্নবুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত শিশুশ্রেণি থাকবে।

শিশুবিদ্যালয়ে ও শিশুশ্রেণিগুলিতে সর্বদা বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিকশিক্ষা অবৈতনিক হবে এবং বাধ্যতামূলক না হ'লেও—বিশেষত যে সব অঞ্চলে বসতবাটির অবস্থা স্বাস্থ্যপ্রদ নয় বা মায়েরা কাজ করতে বাইরে যান সেইসব স্থানে—যাতে অভিভাবকেরা স্বেচ্ছায় সন্তানদের শিশুশ্রেণিতে ভর্তি করেন সেই চেষ্টা করা হবে।

নিয়মিত লেখাপড়ার পরিবর্তে সামাজিকতার অভিজ্ঞতা এই সময়ের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সের দশলক্ষ শিশুর জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'লে তার বাৎসরিক ব্যয় তিনকোটি আঠেরোলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হবে বলে' হিসেব করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনায় তার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। এ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের দ্বার মাত্র নয়। কতিপয় ধীসম্পন্ন ছাত্র এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ যাতে সরাসরি কর্মোপযোগিতা লাভ করে তাই হবে এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আবার অনেকের জন্য মাধ্যমিকোত্তর স্তরে দুইতিন বৎসরের বৃত্তিশিক্ষাবিদ্যালয়ের বা শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ দেওয়া হয়েছে :—

১। উচ্চবিদ্যালয়ী শিক্ষা ছয়বৎসরব্যাপী হবে এবং প্রবেশের বয়স হবে

সাধারণত ১১ + বৎসর। যারা উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ করে' আসবে তারা ১৪ + বৎসর বয়সে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হবে।

২। উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ে প্রথমত উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রদের বেছে নেওয়া হবে। যারা নির্বাচিত হ'ল না তাদের সাধারণত নিজব্যয়ে পড়বার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

৩। নিম্নস্তর থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্তত একপঞ্চমাংশের উচ্চবিদ্যালয়ে স্থান পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। উপযুক্ত ছাত্রনির্বাচন বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং যারা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে বুদ্ধির বিকাশ দেখাবে তাদের বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণিতে ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হবে।

৫। সুষ্ঠু সাধারণ শিক্ষার সংগে যাতে কর্মনিয়োগের উপযোগিতা সাধিত হয় এইজন্য জ্ঞানিক ও শৈল্পিক দুই প্রকারের উচ্চবিদ্যালয় থাকবে। মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞানসমন্বিত পৃথক শাখা থাকবে।

৬। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্য সাধিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়প্রবেশ বা পরীক্ষাপাশের উদ্দেশ্য যাতে প্রাধান্য না পায় তার চেষ্টা করা হবে।

৭। যাতে কোনো উপযুক্ত ধীসম্পন্ন দরিদ্র ছাত্র শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয় সেজন্য প্রতেক স্তরে যথেষ্ট পরিমাণ অবৈতনিক পড়ানো, বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা থাকবে।

৮। উপযুক্ত শিক্ষকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারি, বেসরকারি সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভায় সুপারিশ অনুযায়ী বেতন দিতে হবে।

৯। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'লে তার বাৎসরিক ব্যয় পঞ্চাশ কোটি টাকা হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দুই শাখার মধ্যে "একাডেমিক হাইস্কুলে" বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞানবিষয়ের এবং "টেকনিক্যাল হাইস্কুলে" ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হবে। মধ্য বা উচ্চবুনিয়াদি স্তরের শিক্ষা বিশেষিত হবেনা এবং উচ্চস্তরে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে "মানবিক" বিষয়সমূহের শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। মধ্যস্তরের শেষ পর্যন্ত শাখা থেকে শাখান্তরে যাবার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। যেসব অঞ্চলে একটির বেশি উচ্চবিদ্যালয় থাকবেনা সেখানে এক বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা হবে, গ্রামাঞ্চলে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা এবং ইংরেজি বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে মাতৃভাষা, হিন্দী বা আধুনিক ভারতীয় অন্য একটি ভাষা, ইংরেজি, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, চারুকলা, সংগীত, শরীরচর্চা প্রভৃতি দুই প্রকারের স্কুলের মধ্যে সমান থাকবে। তাছাড়া জ্ঞানিক বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহের ওপর জোর দেওয়া হবে। টেক্‌নিক্যাল স্কুলে কাঠ বা ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যান্ত্রিক অংকন প্রভৃতি শিল্পবিষয়, খাতালেখা, রেখাক্ষরমালা, টাইপিং, অংক, বাণিজ্য ইত্যাদি বাণিজ্যিক বিষয়, গ্রামাঞ্চলের জন্য কৃষি এবং মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈকল্পিক ব্যবস্থা থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার আলোচনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে :—

১। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন সাধিত হয় না, কারণ,—সেগুলি সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ নয়, দেশের কাজের প্রয়োজনানুসারে কর্মিসৃষ্টির প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে নেই এবং পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত ঝোঁকের দরুণ পুঁথিগত শিক্ষার প্রাধান্য এবং পরীক্ষায় অসাফল্যের অনুপাত অত্যন্ত বেশি।

২। এই শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রবেশনিয়ম এমন করতে হবে যাতে কেবল উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতে পারে! উচ্চবিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রস্তাবিত সংস্কার সাধিত হ'লে এইরূপ নির্বাচনের সুবিধা হবে। দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রদের যথেষ্ট অর্থসাহায্য করা হবে। এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের একতৃতীয়াংশ ছাত্রের জন্য খরপোষের (maintenance) ব্যবস্থা চাই। আনুপাতিকভাবে প্রত্যেক পনেরোজন উচ্চবিদ্যালয়ী শিক্ষাসমাপ্তের মধ্যে একজনের কলেজে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়।

৩। বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট মানের জ্ঞান উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বারা দেওয়া হবে এবং ইন্টারমিডিয়েটের একটি বছর উচ্চবিদ্যালয়ের ও অপর বৎসর কলেজের অংগীভূত হবে।

৪। তিন বৎসরের পাঠের কমে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেওয়া উচিত নয়।

৫। ব্যক্তিগত অধ্যাপনাপ্রণালির বিস্তারদ্বারা ও অন্যান্যভাবে অধ্যাপক ও ছাত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে হবে।

৬। স্নাতকোত্তর শিক্ষার স্তরে, বিশেষত জ্ঞানিক ও কার্যিক গবেষণার ক্ষেত্রে সু-উচ্চ মান প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৭। উপযুক্ত ব্যক্তিদের অধ্যাপনকার্যে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য অধ্যাপকদের কর্মনিয়োগের অবস্থারও বেতনের মানের উন্নয়ন করতে হবে।

৮। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর্থিক সহায়তার বণ্টনের জন্য অর্থমঞ্জুরি সমিতি (Universities Grants Commission) স্থাপিত হবে।

৯। জাতীয় প্রয়োজনের জন্য যথেষ্টসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ব্যবস্থা অন্তত দ্বিগুণিত করতে হবে।

শিল্প, বাণিজ্য ও কলাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করে' বলা হয়েছে যে উড-এবট-কমিটির প্রস্তাবসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধপরবর্তী ভারতের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের বর্ধিত প্রয়োজনসাধনের জন্য কারিক শিক্ষায় নিপুণ ছাত্রদের সর্বস্তরের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর নিম্নলিখিত প্রকারের চারটি স্তরের নির্দেশ করা হয়েছে :—

১। প্রধান অধিকর্তা ও গবেষকের পদের উপযোগী ধীসম্পন্ন ছাত্রদের সর্বোচ্চস্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে। এরা সাধারণ শৈল্পিক বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোনো উচ্চ শিল্পশিক্ষালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভ করবে। এরজন্য অত্যন্ত সাবধানে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বেছে নেওয়া হবে।

২। ফোরম্যান, চার্জহ্যাণ্ড প্রভৃতি নিম্নতর অধিকারিপদের উপযোগী শিক্ষাদান শৈল্পিক উচ্চবিদ্যালয়ের কাজ হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমাপ্তির পর কর্মে নিযুক্ত হবার আগে বা পরে এদের বিশেষ ডিপ্লোমা নিতে হবে।

৩। শৈল্পিক উচ্চবিদ্যালয় বা উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পরবর্তী শিল্প-বিদ্যালয়ের পাশকরা ছাত্রেরা নিপুণ শিল্পকর্মীর পদের উপযোগী বলে গণ্য হবে।

৪। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্রেরা অর্ধনিপুণ কর্মীর কাজ করবে।

শ্রমিকরা যাতে নিজেদের বিদ্যাবত্তা ও নৈপুণ্যের বৃদ্ধি করে' কর্মক্ষেত্রের স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নীত হ'তে পারে তারজন্য শিল্পশিক্ষাক্ষেত্রে অবসরকালীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার সংগে বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থার যোগ থাকবে।

সমুদয় শিল্পশিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে আটকোটি টাকা লাগবে এবং পরিচালনের ব্যয় হবে বৎসরে দশকোটি টাকা।

বয়স্কশিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অংগরূপে বর্ণনা করে' বলা

হয়েছে যে ভারতের মতো নিরক্ষরপ্রধান দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপকারিতা সত্ত্বেও এর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

বয়স্কশিক্ষার কোনো শ্রেণিতে পঁচিশের বেশি ছাত্র থাকবেনা এবং গ্রামোফোন রেডিও, নাচ, গান, বাজনা, ছবি, চার্ট, ম্যাজিকলণ্ঠন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি দৃশ্যশ্রাব্য উপকরণের ব্যবহারে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে। শিক্ষার অপচয় ও নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করার জন্য বহুপুস্তকসম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহ স্থাপিত হবে।

সাক্ষরতাসাধন বয়স্কশিক্ষার উপায় হ'লেও তার পূর্ণ উদ্দেশ্য নয় বলে' নিরক্ষরতার নিরাকরণের সংগে সংগে বয়স্কদের সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত করে' তুলতে হবে এবং সাক্ষরতার অনুপাতবৃদ্ধির অনুপাতে তার ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

দেশব্যাপী বিরাট শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের প্রস্তুতির কথা আলোচিত হয়েছে। প্রাক্ বুনিয়াদি ও নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রতি তিরিশজন, উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রতি কুড়িজন ছাত্রের জন্যে একেক জন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয় বলে' শিক্ষকসংখ্যার বহুলবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ ও শিক্ষণব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষণব্যবস্থা অশিক্ষিত শিক্ষকদের শিক্ষণ বা অপচয়নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে' জাতীয় ব্যবস্থার শিক্ষকের চাহিদা মেটাবার জন্য নূতন ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণশিক্ষাবিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার নিম্নতর স্তরের জন্য কুড়িলক্ষ স্নাতকনিম্ন ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য একলক্ষ আশীহাজার স্নাতকস্তরের শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকশিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। স্নাতকদের জন্য একবৎসরের ও তন্নিম্ন শিক্ষা-প্রাপ্তদের জন্য দুই বৎসরের শিক্ষণশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকদের বেতন ও প্রতিষ্ঠার উন্নতি করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিকস্তরের শেষের দিকে সমস্ত ছাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে যাদের শিক্ষকতার উপযোগী বলে' মনে হবে তাদের নিম্নতর শ্রেণিতে পড়াবার সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষিকার প্রয়োজন বেশি বলে' বালিকা বিদ্যালয়েই এই কাজে বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শিল্পবাণিজ্যশিক্ষকদের জগৎ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার শেষ দিকে এইভাবে নির্বাচিত করে' নিয়ে তাদের নিজ নিজ বিষয়শিক্ষার সংগে শিক্ষণশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকশিক্ষণব্যবস্থা প্রধানত কার্যকরভাবে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত হবে।

ট্রেনিং কলেজে পড়ানোর জন্য বেতন নেওয়া হবে না এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করা হবে।

পুনঃশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে' সর্বস্তরের, বিশেষ করে' গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের গবেষণা ও বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাবস্থায় শিক্ষণশিক্ষার জন্য বৎসরে মোটামুটি সাড়ে চার কোটির বেশি (৪,৫৬,৯৯,৯৫০) টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষণব্যবস্থার জন্য একটি কমিটির স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে' নিম্নলিখিত চারটি স্তরের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে :—

১। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়ে—ছয় বৎসর বয়সে।
২। নিম্নবুনিয়াদি স্তরের শেষে —এগারো " " ।
৩। উচ্চ " " " —চৌদ্দ " " ।
৪। " বিদ্যালয়ী " " —সতেরো " " ।

এই চারটি পরীক্ষার ডাক্তারি রিপোর্ট ছাত্রদের স্থায়ী "কার্ডের" অংগীভূত হয়ে তাদের সংগে স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবে। তাছাড়া শিক্ষকরা বৎসরে দু'বার করে উচ্চতা ও ওজন মাপবেন এবং অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলে ডাক্তারের সামনে স্থাপিত করবেন।

স্বাস্থ্যপরীক্ষাগুলি বিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব অভিভাবকদের সামনে, বিশেষ শিক্ষালব্ধ পাশকরা ডাক্তারের দ্বারা করানো হবে। পরীক্ষার ফল ডাক্তার প্রধান শিক্ষকের সংগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

সামান্য দোষগুলি যাতে বিদ্যালয়ের মধ্যেই নিরাকৃত হ'তে পারে তার জন্য রোগনিবারণ ও চিকিৎসার বিশেষ সরকারি "ক্লিনিক থাকা চাই। তাছাড়া, অপুষ্টির প্রতিবিধানের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ছাত্রদের ডাক্তারি, টিফিন ও পরে বর্ণিত বিশেষ প্রকারের বিদ্যালয়ের ব্যয় পৃথক হিসেবে না দেখিয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের ব্যয়ের শতকরা দশটাকা অনুপাতে সেই সেই স্তরের হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরিচালন ও নির্দেশের অভাবে কর্মনিয়োগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেইজন্য শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে "ব্যুরোর" স্বষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। যে যে স্তরে যে যে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হবে এই ব্যুরো সেই সেই সময়ে তাদের কর্মে নিযুক্ত হ তে সাহায্য করবে। বড় বড় স্কুলকলেজে "কেরিয়রমাষ্টার" থাকবেন এবং তাঁরা ব্যুরোগুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবেন।

দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার স্বযোগ যারা নিতে পারে না সেইসব বিকলাংগ বা দুর্বলধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এদেশে এই ব্যবস্থা এতদিন কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সামান্যভাবে করা হয়েছে কিন্তু স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আবশ্যক।

বিভিন্নপ্রকারের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যের উল্লেখ হয়েছে, যথা—অন্ধ, বধির, মূকবধির বা অন্যান্য প্রকারের গভীর বিকলতা, তোৎলামি ইত্যাদি দোষ এবং বিভিন্ন স্তরের মানসিক দৌর্বল্য।

সামান্য বিকলতাসম্পন্ন ছেলেদের স্বাভাবিক ছেলেদের থেকে পৃথক না করা বাঞ্ছনীয় বলে' বলা হয়েছে যে তাদের দুর্বলতা অল্প তারা সাধারণ ছেলেপিলেদের সংগে পড়বে আর দুর্বলতার আধিক্যে প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে।

অন্ধ ও মূকবধির ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

দুর্বলতাসম্পন্ন ছেলেপিলেদের যতদূত সম্ভব অর্থকরী শিক্ষা দিয়ে কর্মে নিয়োগের সহায়তা করতে হবে এবং শিক্ষাসমাপ্তির পরও তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মংগল ব্যবস্থা থাকবে।

দুর্বলতাসম্পন্ন ছেলেপিলেদের সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এদের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যয় যে সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যেই শতকরা দশটাকা অনুসারে ধরে' নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

অবসরবিনোদন ও সামাজিক কার্যকলাপকে শিক্ষার আবশ্যিক অংগরূপে ধরা হয়েছে কেননা শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জন নয়—সামাজিক অভ্যাসও।

শুধু স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রী নয়, ১৪ থেকে ২০ বৎসর বয়স্ক সমস্ত তরুণ-তরুণীদের জন্য এই ব্যবস্থার প্রস্তাব করে সর্বভারতীয় যুব-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার

কথা বলা হয়েছে। এই যুব-আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থান নেবে না সেগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলবে।

যুব-আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য দেশের তরুণতরুণীদের বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে। সেনাদলের কর্মাবসিত অফিসারদেরও কিয়দংশে এই কাজে নেওয়া যেতে পারে।

বয়স্কদের জন্যও অবসরকালীন আনন্দ ও সমাজসেবার কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

সমগ্র ব্যবস্থাটির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ দেওয়া হয়েছে :—

১। শৈশবাবস্থা থেকে এগারোবারো বৎসর বয়স পর্যন্ত বাগান করা, পল্লী-নৃত্য, "সুইডিশ-ড্রিল", অভিনয়, "ক্লাব", "ব্লু-বার্ড", ঘরের ও মাঠের খেলাধুলা (games and sports) ক্রীড়াকুশলতা (athlectics), বেড়ানো, নানাপ্রকার সখের কাজ (hobbies) ইত্যাদি।

২। বারো বৎসরের ওপরে সমাজগঠনমূলক কাজ, বিতর্ক সভা, দলবদ্ধ খেলা, আন্তঃবিদ্যালয়ী প্রতিযোগিতা, গ্রামাঞ্চলের যুবকদের "কৃষিসভা" প্রভৃতি।

এই সমস্তের আনুমানিক ব্যয় আট কোটি টাকা বলে' ধরা হয়েছে।

প্রশাসন বিষয়ে আলোচনার নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ করা হয়েছে :—

১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবস্থাপিত হবে এবং অন্যান্য স্তরের শিক্ষা প্রাদেশিক শাসনের বিষয়ীভূত থাকবে।

২। সর্বভারতীয় স্তরের শিক্ষাব্যাপারের অনুষ্ঠানের আর্থিক সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চলে (Zones) ভাগ করা হবে।

৩। জাতীয় শিক্ষাব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

৪। প্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থাপননীতির নির্ধারণের ভার প্রদেশের ওপর ন্যস্ত থাকলেও পূর্বাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে যে-সব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি ভালভাবে কাজ করছে সেইসব অঞ্চল ভিন্ন শিক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপর না দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। শিক্ষার আগ্রহ আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্কুলপরিচালনসভা, স্কুল-বোর্ড, জিলাশিক্ষাকমিটি প্রভৃতি তদুপরি প্রাদেশিক শিক্ষোপদেষ্টৃসভা স্থাপিত হবে।

৬। কেন্দ্রে শক্তিশালী শিক্ষাবিভাগের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষোপদেষ্টৃসভার দায়িত্ব ও এলাকার বিস্তার করতে হবে।

৭। সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষাকর্মচারী নিয়োগের এবং কেন্দ্র ও প্রদেশ এবং প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষার উর্ধতন কর্মচারিবিনিময়ের ব্যবস্থা হবে।

৮। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শিল্পশিক্ষা ভিন্ন সমুদয় শিক্ষাবিষয়ের তত্ত্বাবধান করবেন।

৯। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের ব্যয়ের পাঁচটাকা অনুপাতে ব্যবস্থাপনের ব্যয় হবে।

উপসংহারে সমগ্র পরিকল্পনার আর্থিক হিসেব করে' দেখানো হয়েছে, কিন্তু হিসেবটি যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যা ও দামের অনুসারে করা হয়েছে বলে' প্রয়োগকালে ব্যয় অনেক বেশি হবার কথা।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা পেলে তার সামুদয়িক বার্ষিক ব্যয় তিনশো তের কোটি ষাট লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে' দেখানো হয়েছে। তারমধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা পাওয়া যাবে আর সরকারি ভাণ্ডার থেকে দুশো-সাতাত্তর কোটি টাকা দিতে হবে। তৎকালে ভারতের শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় ত্রিশ কোটি টাকা ছিল,—তারমধ্যে সরকার সাড়ে সতেরো কোটি টাকা দিতেন। এই টাকার পরিকল্পনার মধ্যে না ধরে বাড়তি খরচের জন্যে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

স্কুলবাড়ী ও জমির প্রারম্ভিক ব্যয় ঋণের দ্বারা নির্বাহিত হবার আশায় কেবল সুদ আর আনুসংগিক ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে।

শিক্ষাপরিকল্পনা পূর্ণ করার কাল চল্লিশ বছরের মতো দীর্ঘ করার কারণ যে অর্থনৈতিক নয়, কার্মিক, সামাজিক ও মানবীয় সে কথা বলে প্রথম পাঁচ বছরকে পরিকল্পনারচনার ও প্রচারের কালরূপে ধরা হয়েছে। বাকি পঁয়ত্রিশ বছর সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভক্ত হবে। প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে ব্যয় ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা হবে। তৎকালীন ব্যয়ের ওপর পঞ্চমবর্ষে দশকোটি, দশমবর্ষে চব্বিশকোটি, পঞ্চদশবর্ষে সাঁইত্রিশকোটি এইভাবে বাড়াতে বাড়াতে চত্বারিংশৎবর্ষ থেকে তিনশো তেরো কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ভাগ করে' নেবেন।

সার্জেন্টপরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিকল্পনা বলে' অভিহিত করা যায়। এদেশে শিক্ষার প্রথম সার্বিক পরিকল্পনা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালের শেষ প্রান্তে রচিত

ওই পত্রকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দলিল বলা যায় এবং সেই আমলের শিক্ষাব্যবস্থা ওই পত্র ঘিরেই রচিত হয়েছিল। পত্রটিকে কেউ কেউ ভারতীয় শিক্ষার "ম্যাগ্‌নাকার্টা" বলে' অভিহিত করলেও তার বহু দোষত্রুটির কথা তার প্রস্তাবগুলির প্রবর্তনের পর থেকে অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে নানা প্রস্তাবে ও রিপোর্টে সংকারের প্রস্তাব থাকলেও মূল কাঠামটি একইভাবে চলে' এসেছিল।

বস্তুত আদৌ দোষপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সংস্কারমাত্রের দ্বারা সম্ভবপর ছিলনা এবং জাতীয় চেতনার উর্ধতনের সংগে সংগে দেশে আমূল পরিবর্তনের দাবী দেখা দেয়। সার্জেন্ট রিপোর্ট বৃটিশ শাসনের অবদান হ'লেও তাতে পুরাতনের অস্বীকৃতি ও নূতনের স্বীকৃতির সাহসিকতা দেখা যায়।

এরমধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী সবাইকে সর্বস্তরে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি অনুসৃত হয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের পড়া নয়, দ্বিপ্রাহরিক আহার, বই, বৃত্তি, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থাদ্বারা যতদূর সম্ভব সাম্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষাকে জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তারিত করে' স্বাস্থ্য, চরিত্র, সমাজসেবা, আমোদপ্রমোদ সবকিছুকেই তার অন্তর্গত করা হয়েছে।

পুস্তকসর্বস্ব একমুখী শিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে। শিক্ষার ধারক ও বাহক শিক্ষকসমাজের প্রাধান্য আর অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

তথাপি সার্জ্জেন্ট পরিকল্পনার বিরোধী সমালোচনা যে হয়নি তা নয়। দেশ-নেতৃগণ চল্লিশবৎসরব্যাপী পরিকল্পনার বিরোধিতা করে' বলেছিলেন যে পোনেরো বৎসরে তার সম্পূর্ণতা পাওয়া উচিত ছিল। বলেছিলেন যে শিক্ষকশিক্ষণের জন্য এত ব্যস্ততার প্রথম থেকেই প্রয়োজন নেই এবং সোজা পথে শিক্ষক না পাওয়া গেলে সামরিক রীতির বাধ্যতাদ্বারা শিক্ষকসংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু ওই সমালোচনা যে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিলনা তা তাঁরাই শাসনক্ষেত্র উপস্থিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের অধীনে শিক্ষাবিস্তার দ্রুততর হয়নি।

সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রধান দোষ তার আর্থিক ও সাংখ্যিক হিসেবের অবাস্তবতা। যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে রচিত হিসেবে বর্তমানকালে অচল।

আদর্শের দিক দিয়ে সার্জেন্ট রিপোর্টের এই দুর্বলতা ছিল যে তাতে

ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোনো দেশের শিক্ষার তুলনামূলক বা আদর্শগত বিচার করা হয়নি।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে সার্জেণ্ট রিপোর্টে একটি খসড়ামাত্র দেওয়া হয়েছে, এটি পূর্ণপরিকল্পনা নয় এবং পরবর্তী সময়ে সেইভাবেই তার ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ওই মূল খসড়ার অদল বদল করে' পূর্ণতর জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয় এবং দ্বিশাখ শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষার আদর্শ প্রবর্তিত হয়।

১৯৩৭-৪৭

পরিণতি

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সংগে শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরাট আলোড়ন আসে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রিগণ যেসব অসুবিধা ভোগ করছিলেন তার অধিকাংশেরই নিরসন হয় এবং অর্থনৈতিক সংকটেরও কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। আশা হয় যে নূতন জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ভাবের সঞ্চার করতে পারবেন।

কিন্তু যে আশার সঞ্চারে এই যুগের আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাস সেই পথ নিলনা। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশে নূতন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনের মাত্র দুই বছর পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হ'ল। যুদ্ধসম্বন্ধীয় মতভেদের কারণে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমুদয় কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও "তিরানব্বই ধারার" প্রবর্তন হ'ল। একদিকে "ভারত-ছাড়" আন্দোলন ও অন্যদিকে যুদ্ধের আত্যন্তিক সংকটের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের প্রশ্নসমূহ সাধারণভাবে সরকারের কাছে অবহেলিত রয়ে গেল। তারপর আবার ১৯৪৬ থেকে আরম্ভ করে' স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসশাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এই সময়ের ইতিহাসকে তিন অংশে ভাগ করা যায়,—প্রথমে, ১৯৩৭-৩৮ ছিল লাটসাহেব ও মন্ত্রিগণের মধ্যে শক্তিদ্বন্দ্বের কাল, মধ্যে, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ ও "ভারত-ছাড়" আন্দোলনজনিত বিপর্যয়ের কাল এবং শেষে, ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দ, বৃটিশের অপসরণে জন্য প্রস্তুতির কাল।

এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি অশান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্র সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের "মণ্ট-ফোর্ড" সংস্কারে যেমন রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ছিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনেও তেমনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই অংশ ছিল। শিক্ষাসংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল :—

১। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল ও তজ্জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

২। দেশরক্ষার্থে নিয়োজিত দলসমূহের শিক্ষা।

৩। বেনারসের হিন্দু ও আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহের সংরক্ষণব্যবস্থা।

৫। নৃতত্ত্ববিভাগ ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ।

৬। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের শিক্ষা।

৭। প্রাচীন নথিপত্র (archives)।

৮। অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও শ্রেণিসমূহের ছাত্রদের দেশে ও বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তিদান, বিদেশে ভারতীয় ছাত্রমংগল।

৯। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যদান।

১০। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বৈদেশিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, উনেস্কো-সম্পর্কিত কাজ।

১১। বৃত্তিশিক্ষা।

১২। বেতারবিভাগ।

এগুলি ভিন্ন শিক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনের বিষয়ীভূত ছিল, কেবল এংলোইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার আর্থিক স্বার্থ আংশিকভাবে সংরক্ষিত ছিল।

মহাযুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের সংগে এক হয়ে গেছিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার সুপারিশে আবার তা পৃথক বিভাগের প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহেরুর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনে শিক্ষার কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানও ভারতীয়গণের হাতে আসে। এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের দ্বারা নিম্নলিখিত আনুসংগিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়ঃ

১। কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভা।

২। শিক্ষার কেন্দ্রীয় কর্মাধিকরণ (Central Secretariat):—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রিত্বের প্রতিষ্ঠায় এর পদোন্নতি হয়। এর চারটি শাখা, যথা,—প্রশাসন ও বহিঃসম্পর্ক, গঠন, বৃত্তি (professional) ও শিল্প (technical) সম্বন্ধীয়।

৩। কেন্দ্রীয় শিক্ষার ব্যুরো:—একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনস্থাপিত হয়। শিক্ষাতত্ত্ব ও তথ্যের সংগ্রহ এবং প্রচার এর প্রধান কাজ।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থমঞ্জুরি কমিশন (Grants Commission) কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার সুপারিশে এই কমিটি প্রথমে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত এই কমিটি প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সাহায্যের বণ্টনব্যাপারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী অন্যান্য ব্যাপারেও একে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রসার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধীন ছাত্রের সংখ্যা ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের ১,২৬,২২৮ (অবিভক্ত ভারতের) থেকে বেড়ে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ২,৪১,৭৯৪ এ (বিভক্ত ভারতে) দাঁড়ায়। এই সময়ে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞানের কলেজ ছিল ৪১০টি এবং তাতে ১,৫৮,১০০ জন পড়তো। রাজনৈতিক আন্দোলনজনিত চেতনার বিস্তার ও যুদ্ধজনিত কর্মক্ষেত্রসমূহে চাহিদার সৃষ্টি ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল এবং এই কারণেই এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানের নূতন নুতন শাখা পাঠ্য-বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল এবং নূতন নূতন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

এই বিস্তার দেখে অনেকে বলে' থাকেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ-শিক্ষার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতের মতো বিরাট দেশের উচ্চশিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজনের হিসেবে উচ্চশিক্ষার এই বিস্তারকে কমই বলা যায়। বস্তুত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার বিস্তার যদিবা প্রয়োজনের কাছাকাছি এসে থাকতে পারে, শিক্ষার নিম্নতর ধাপগুলি তার অনেক দূরে রয়ে গেছে বলে উচ্চ ও নিম্নশিক্ষার আনুপাতিক প্রভেদ বিসদৃশ লাগে।

শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ী স্তরেরও প্রধান দোষ হ'ল অপচয়। একদিকে বেছে বেছে ছাত্র ভর্তি করার সুব্যবস্থা না থাকাতে অনুপযুক্ত ছাত্রের ভিড় হয়েছে আর অন্যদিকে অর্থাভাবে বহু সুযোগ্য ছাত্র উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় বৈচিত্র্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হলেও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-বিজ্ঞানক্ষেত্রের অনুপাতে অতিরিক্ত অধিকসংখ্যক ছাত্র প্রবেশ করছে।

এই সময়ের মধ্যে ত্রিবাংকুর, উৎকল, সাগর সিন্ধু, আসাম আর রাজপুতনা এই কয়টি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

ত্রিবাংকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হ'লেও এর কাজ আরম্ভ হ'তে হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হয়েছিল। কেরলীয় শিক্ষা-

সংস্কৃতির চর্চা ছাড়াও যন্ত্রশিল্প, বৃত্তি ও ফলিতবিজ্ঞানের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে' পৃথক উড়িষ্যা প্রদেশ স্থাপিত হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, প্রাদেশিক উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনসাধনের জন্য, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমে সংশ্লেষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে এর শিক্ষাদানের বিভাগও খোলা হয়।

মধ্যপ্রদেশের হিন্দীভাষী অঞ্চলের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডাঃ হরিসিং গৌরের কুড়িলক্ষ টাকা দান এর ভিত্তিতে ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে রাজপুতনার, গৌহাটিতে আসামের এবং করাচীতে সিন্ধুপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দুই লক্ষের ওপর ছাত্র ছিল। তার মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে নিরানব্বই হাজার, ডিগ্রি ক্লাসে বিরাশি হাজার বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে আটাশ হাজার (অধিকাংশই আইন ও ডাক্তারি), স্নাতকোত্তর শ্রেণিসমূহে ৭৬০০ এবং গবেষণাক্ষেত্রে ৫৪০ জন নিযুক্ত ছিল। এরমধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৬,০০০।

এর আগে থেকেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি-ভি রমণ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক উচ্চকোটির গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ; বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য "ডাক্তার" উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষার পড়ার মধ্যেও গবেষণার স্থান দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষাবিজ্ঞানের এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ও গবেষণার জন্য এই বিষয়ের স্বীকৃতি এবং এলাহাবাদ ও পাটনায় মনোবিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র আর দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষণশিক্ষামন্দিরের প্রতিষ্ঠা এই সময়ে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের অবিভক্ত ভারতে যেখানে ১৩,০৫৬টি বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের বিভক্ত ভারতে ১১৩৯৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বেড়েছিল। অপরপক্ষে ভারতবিভাগ সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধিই হয়েছিল, যথা, ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে

অবিভক্ত ভারতের ২২,৮৭,৪৭২ ছাত্রের জায়গায় ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৬,৫৬,৭৭৩ জন ছাত্র ছিল। এই প্রসার প্রচুর হ'লেও আগের যুগগুলির তুলনায় কিছু কম, আবার উচ্চশিক্ষার অনুপাতেও কম, কেননা, এই সময়ে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে এই শৈথিল্যের একটি কারণ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতির অভাব। তারপর দারিদ্র্য ও যুদ্ধজনিত সংকটের জন্যও শিক্ষার হার কিছু কমেছিল।

এর পূর্বযুগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলাদেশে, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দেখা যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বাংলার সরকারী প্রস্তাবের উল্লেখ পূর্বপরিচ্ছেদে করা হয়েছে। ওই প্রস্তাবানুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয় সেটি নূতন ভারতসম্বিধানে গঠিত আইনসভায় স্থাপিত হয়, কিন্তু আইনসভার ভেতর ও বাইরের তীব্র বিরোধিতার ফলে প্রত্যাহৃত হয়ে সংশোধিতভাবে আবার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তারপর যুদ্ধজনিত প্রাশাসনিক ওলটপালটের জন্য ওই বিল চাপা পড়ে যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের স্থাপন ওই বিলের প্রদর্শিত উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সাধু হ'লেও নূতন বোর্ডের অধীনে হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে' দেওয়ার চেষ্টা থাকাতে জনসাধারণের প্রগতিশীল সমস্ত অংশের তীব্র আপত্তি দেখা যায়।

এই সময় শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্ন আবার প্রাধান্য লাভ করে এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই মাতৃভাষা মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়।

প্রধানত যুদ্ধজনিত চাহিদার ফলে এই সময়ে মাধ্যমিক স্তরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষাব্যবস্থা কিছু প্রসার লাভ করে।

শিক্ষণশিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ২১১০ শিক্ষক ও ১৩০৭ শিক্ষিকা শিক্ষালাভ করছিল।

স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রবেশিকাপরীক্ষার বিকল্পব্যবস্থার সাফল্যের অভাব এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান দোষ ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও এই স্তরের শিক্ষার মান নিচু করছিল। শিক্ষণশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়নি এবং শিক্ষকের বেতনের অল্পতা ও সম্মানের অভাবের কারণে দেশের শ্রেষ্ঠ মণীষা এদিকে যায়নি এবং নিযুক্ত শিক্ষকগণ অর্থাভাবের তাড়নায় বিভিন্ন বাইরের কাজে লিপ্ত হয়ে নিজ ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষাও দিতে পারছিলেন না। শিক্ষকসমাজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ও নৈতিক অবনতি দেখা দেয়।

রাজনৈতিক অশান্তি, বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা শিক্ষকগণের অযোগ্যতা প্রভৃতির প্রভাবে ছাত্রসমাজের শৃংখলা ও সংযমের মানও অত্যন্ত নিচু হয়ে পড়ে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ্যের প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল, কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে, আর্থিক ও অন্যান্য ভিত্তি দৃঢ় না করেই বহু "প্রাইভেট" বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার মান নিচু হয়ে যায়। প্রসার বনাম সংস্কারের দ্বন্দ্ব পুরাতন হ'লেও এসময়ের নিম্নমানতার প্রতিকার অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

নূতন নূতন শিক্ষাদর্শের বিবর্তন এ সময়ের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি লক্ষণ। বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ক্ষীণ সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান নীতিরূপে গৃহীত হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৩৬-৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার হ্রাস ও প্রয়াসের শৈথিল্য দেখা যায়। যুদ্ধজনিত অর্থসংকট ও হার্টগ রিপোর্টের অনুসারী প্রসার বিরোধী সংস্কারনীতিকে এর কারণ বলে উল্লেখ করা হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা যে চিন্তা করেননি তা নয়। প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতার বয়স ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ খুব কমই অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বৃটিশ-ভারতে মাত্র ৩২৯৭ গ্রাম্য ও ১৯৪ নাগরিক অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ভিন্ন কোথাও এই ব্যবস্থা হয়নি। অপরপক্ষে শিক্ষাকর অনেক স্থানেই নেওয়া হচ্ছিল। বালাদেশে শিক্ষাকর আয়করের অনুপাতে টাকায় পাঁচ পয়সা হিসেবে নির্ধারিত হয়। প্রাদেশিক সরকার বছরে ২৩·৫ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বিভক্ত ভারতে ১,৩৪,৮৬৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১,০৫,২৫,৯৪৩ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাভিত্তি প্রসারের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছিল এবং একদিকে আবশ্যিকতা আর অন্যদিকে বয়স্কশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করা যাচ্ছিল। সাক্ষরতার হার কিছু বেড়েছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থমারিতে সাক্ষরতার হার ছিল ৭·৩% আর ১৯৪১এ ১২·৩%। পূর্ব পূর্ব যুগ থেকে এই দশ বৎসরের বৃদ্ধি কিছু বেশি হ'লেও একে সন্তোষজনক কিছুতেই বলা যায় না। দেশের সব জায়গায় সমানভাবে সাক্ষরতা বাড়েনি;

ত্রিবাংকুর-কোচিন, বরোদা প্রভৃতি জায়গায় সর্বাপেক্ষা বেশি এবং গোয়ালিয়র, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদে সর্বাপেক্ষা কম ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক বেতনের হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল বোম্বাইয়ে (৩৩৲) আর সবচেয়ে কম ছিল বাংলাদেশে (৮৲)।

বুনিয়াদি শিক্ষা

মহাত্মা গান্ধির অনুপ্রেরিত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তরের স্থচনা করে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হয়। ওই পদ্ধতির আদর্শ ও পরিকল্পনাবিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসকর্তৃক স্বীকৃত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে এর প্রস্তাবগুলি কাশ্মীরের ও ভারতের কয়েকটি কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের শিক্ষানীতিরূপে গৃহীত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদি শিক্ষার শিক্ষকশিক্ষণের জন্য ওয়ার্ধায় বিদ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমশ মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং কাশ্মীরে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হয়। বুনিয়াদি শিক্ষার বোর্ড স্থাপিত ও "স্পেশ্যাল অফিসর" নিযুক্ত হয়; ট্রেনিং স্কুল খোলা হয় এবং নূতন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করার নীতি গৃহীত হয়। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও মস্থলিপটমের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা এই নীতি স্বীকার করে। পুনার তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ আর আহ্‌মেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ বুনিয়াদি শিক্ষাবিষয়ে বোম্বাই সরকারের সহযোগিতা করে। মধ্যপ্রদেশে শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত রবিশংকর শুকলার নেতৃত্বে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বিদ্যা-মন্দির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভারতের চারিদিকে শিক্ষাসংস্কারের ঢেউ এসে পড়ে বিভিন্ন কমিটির স্থাপন ও পূর্ব পূর্ব কমিটির আংশিক রূপান্তর ঘটে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান রিপোর্টগুলির আলোচনা পূর্ব পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকশিক্ষণকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং নর্মাল স্কুলগুলিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনাও স্থগিত থাকে। তখন হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ নিজেদের কার্যকলাপ সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। উড়িষ্যার সরকার "বেসিক এডুকেশন

বোর্ড'টি ভেঙে দেন, কিন্তু "উৎকল মৌলিক শিক্ষাপরিষদ" নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদ্বারা বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচারিত হ'তে থাকে। বুনিয়াদি শিক্ষার স্পেশাল অফিসর ও কয়েকজন শিক্ষক সরকারি পদ ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৪২ এর বিক্ষোভে শিক্ষার গঠনমূলক কাজ অনেকাংশে ব্যাহত হ'লেও বিহার ও কাশ্মীরের সরকারি শিক্ষাবিভাগ বুনিয়াদি শিক্ষা বন্ধ করেননি এবং পূর্বোক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের কাজ করে' চলেছিল।

তারপর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধায় আবার জাতীয় শিক্ষাসম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তার পরিকল্পনা পূর্বপরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

বৃত্তি ও ব্যবসায়শিক্ষা

১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে তেরোটি ল-কলেজে ৫৩৩২ ছাত্রছাত্রী পড়ছিল; পশু ও মানুষের চিকিৎসাশিক্ষার তেইশটি সাধারণ ও তিনটি মেয়েদের কলেজে ৬৭৪২ ছাত্র ও ১৬১৪ ছাত্রী পড়ছিল; পঁচিশটি মেডিকেল স্কুলে ৪০১০ ছেলে ও ৩৮৫ মেয়ে পড়ছিল।

এই সময়ে পশ্চিমবংগে পশু ও মানুষের চিকিৎসাশিক্ষার চারটি কলেজে ১৭৫১ পুরুষ ও পঁচাশিজন মেয়ে এবং ছয়টি মেডিকেল স্কুলে ১৯০৭ জন ছাত্র ও আটাশিজন ছাত্রী ছিল। দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কম ছিল এবং বিশেষ করে' গ্রাম্য অঞ্চলে চিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর ছিল। অপরপক্ষে উচ্চতর শিক্ষাবিষক গবেষণা এবং আয়ুর্বেদিক ও য়ুনানি চিকিৎসার কিছু উন্নতি হয়েছিল।

তখন ভারতে চৌদ্দটি কমার্স কলেজে ৭৭৮৩ এবং ২৯৬টি কমার্স স্কুলে ১৪, ৭৮৪ জন ছাত্র ছিল। তারমধ্যে পশ্চিমবংগে সাতটি কলেজ ও আটটি স্কুলে যথাক্রমে ৩৭৮৭ ও ৬৭৫ জন ছাত্র ছিল।

১৪টি 'কলা' (art) বিদ্যালয়ে ১৬৯৮ জন ছাত্র ছিল, তারমধ্যে পশ্চিমবংগের তিনটিতে ৩৯৭ জন পড়তো।

১১টি নূতন কৃষিবিদ্যালয়ের স্থাপনে এই যুগে কৃষিশিক্ষার কিছু উন্নতি হয়, এগুলির মধ্যে বাংলাদেশে একটিও স্থাপিত হয়নি। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের ছয়টি কৃষিপ্রতিষ্ঠানের ১০০৮ জন ছাত্রের স্থানে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সতেরোটি কৃষিবিদ্যালয় ১৫৫১ জন ছাত্রকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কৃষিশিক্ষা দিচ্ছিল।

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে আটটি ইঙ্গিনিয়ারিং কলেজ ছিল। তারমধ্যে লাহোর ও করাচির কলেজদুটি পাকিস্তানে চলে যায়। তৎসত্ত্বেও ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা সতেরো ও ছাত্রের সংখ্যা ২৫০০এ দাঁড়ায়।

যন্ত্রশিল্পের শিক্ষাবিষয়ে উড-এবট-কমিটির রিপোর্টের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর যুদ্ধের চাহিদায় যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং এ-সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। বস্তুত ১৯৩৭-৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেশের শিল্পশিক্ষা যে-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এর আগে আর কখনও সেরকম হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভার পরামর্শে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে যন্ত্রশিল্পশিক্ষার একটি সর্ব-ভারতীয় সমিতি (All India Council for Technical Education) স্থাপিত হয়। এই সমিতির অধীনে বিভিন্ন শিল্পের শিক্ষাবিষয়ক ছয়টি শাখা তত্ত্বৎ বিষয়ে উচ্চকোটি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছে এবং তার সুপারিশে সরকার কর্তৃক চোদ্দটি সর্বভারতীয় শিল্পশিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে উচ্চতর শিল্পশিক্ষাবিষয়ে একটি "কমিটি" বসে এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে :—

১। যুদ্ধপরবর্তী শিল্পশিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে অন্তত একটি করে' উচ্চতর শিক্ষায়তন স্থাপন করতে হবে।

২। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষায়তনটি কলিকাতায় স্থাপিত হবে।

৩। সংগে সংগে বোম্বাইয়ের কাছে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হবে।

৪। বিশেষভাবে "হাইড্রলিক্স" (hydraulics) ইঞ্জিনিয়ারিং শেখাবার জন্য উত্তরের কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে।

এই অনুসারে পশ্চিমবংগের হিজলিতে ও বোম্বাই শহরের কাছে একটি করে' প্রতিষ্ঠানস্থাপনের প্রস্তাব সরকারি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভুত করা হয়।

১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৪৯০টি যন্ত্রশিল্প ও স্থাপত্যশিক্ষালয়ে ২৭,৯৪০ জন ছাত্র আর বাংলাদেশে আটাশিটি শিক্ষালয় ৪৮১৯ ছাত্র ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা

এই সময়ে ভারতে মেয়েদের জন্য ১৭,৪৮৫টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ৩২,৯৪,২৪৮ জন ছাত্রী ছিল।

মুসলমানদের শিক্ষা

মুসলমানদের ভারতের এক অনগ্রসরশীল, সংখ্যালঘু অংশরূপে গ্রহণ করে' এ-যুগের আগে থেকেই তাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছিল। এই যুগের মধ্যে "অল ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কমিটি" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয় এবং সেই সমিতি মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সমর্থন করে' বুনিয়াদি শিক্ষা মুসলমানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার বিরোরিতা করে। তা'ছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় (denominational) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, উর্দু-ভাষামাধ্যম বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, স্ত্রীপুরুষের পৃথক শিক্ষা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের স্থানসংরক্ষণ ও মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম আনুপাতিক হার নির্ধারণ প্রভৃতির দাবী এই সমিতি করে। এর রিপোর্টে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার পক্ষে বলা হয়।

হরিজনদের শিক্ষা

এই আন্দোলন অস্পৃশ্যতানিবারণের আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে হরিজনদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও বিদ্যালয়ের স্থাপন এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে তাদের জন্য স্থানসংরক্ষণ ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক প্রদেশেই আইনদ্বারা এদের তপশীলভুক্ত করে নেওয়া হয়।

বয়স্কদের শিক্ষা

বয়স্কশিক্ষার কাজও দেশে কংগ্রেসমন্ত্রিত্বের সূত্রপাতের পর থেকেই সংগঠিত-ভাবে আরম্ভ করা হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টৃসভাকর্তৃক বয়স্কশিক্ষার একটি কমিটি স্থাপিত হয়, বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ তার সভাপতি ছিলেন। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের বয়স্কশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে স্বল্পশিক্ষিতের লেখাপড়ার অভ্যাস বজায় রেখে নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করা ও তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা কিন্তু ভারতের মতো নিরক্ষরতাপূর্ণ

দেশে ওপরের উদ্দেশ্য বর্তমান থাক্‌লেও সাক্ষরতাসাধনই প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া কর্মজীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষাদানে সুনাগরিকের স্থষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও এই আন্দোলনেয় উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও কতকগুলি দেশীয় রাজ্যও এই পরিকল্পনা উৎসাহের সংগে গ্রহণ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগে কয়েক বছর এই কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার গৃহীত হয়। যুদ্ধকালের মধ্যেও বয়স্কশিক্ষা ও বয়স্কদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞানের প্রচারের কাজ সরকারি "জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্টের" দ্বারা কিছু কিছু করা হয়েছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ স্বেচ্ছাভিত্তিতে, বেসরকারিভাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, সংগৃহীত দানের দ্বারা এর ভাণ্ডার গঠিত হয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রীষ্মাবকাশে এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করা হয়। প্রাথমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে কলেজে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সমাজসেবার অংগস্বরূপ বয়স্কশিক্ষার কাজ গৃহীত হয়। সরকারি জেলে কয়েদিদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদার, মিলমালিক প্রভৃতিরা প্রজা ও শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিহারের সরকারি তহবিল থেকে এই কাজের জন্য আশিহাজার টাকা দেওয়া হয় এবং সরকারকর্তৃক প্রাদেশিক জনশিক্ষাকমিটি গঠিত হয়। কোন কোন গ্রামে সাক্ষরতাদিবস পরিপালিত হয়।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য বদ্রীনাথ বর্মা বৎসরে দুই লক্ষ বয়স্ককে সাক্ষর করার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার স্থাপনের পরই, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, বয়স্কশিক্ষার প্রাদেশিক "বোর্ড" স্থাপিত করে' কাজ আরম্ভ হয়। বোর্ডের ও বোম্বাইয়ের সমাজসেবাসমিতির (Social Service League) তৎপরতায় বোম্বাই শহরে বেশ ভালো কাজ হয়েছিল। এই কাজের সম্পর্কে গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে একমাসের জন্য স্কুলকলেজের ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষকরূপে নিয়োজিত করা কর এবং এর সুফল দেখে সরকারকর্তৃক এই প্রচেষ্টা স্থায়িভাবে গৃহীত হয়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বয়স্কশিক্ষার কাজ ততটা অগ্রসর হয়নি।

করদরাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরে বয়স্কশিক্ষার কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে হয়েছিল।

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতালাভের সংগে এই বইয়ের বর্ণনীয় বিষয় শেষ হবার কথা, কিন্তু নবজাগরণের যে প্রভাতকাকলি বৃটিশযুগের শেষাংশে শোনা গেছিল স্বাধীনতা-সূর্যোদয়ে সে সংগীত কি রূপ নিল তার আভাসমাত্র না দিয়ে পাঠকবর্গের কাছে বিদায় নেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে গৃহীত যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায় তৎকালীন জাতীয় শিক্ষাদর্শ যে বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। তার সুপারিশে প্রথম পাঁচ বৎসর পরিকল্পনার ও তার পরে পূনর্গঠনের কাল নির্দেশ করা হয়েছে। স্বাধীনভারতের দুই পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যেও প্রথম পঞ্চবর্ষকে মূলত পরিকল্পনার ও দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষকে কর্মসূচনার কাল বলে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ওই প্রথম পঞ্চবর্ষ স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল নিদারুণ ক্ষতের মধ্য দিয়ে যার পূর্ণ নিরাময় আজ পর্যন্ত হয়নি, তাছাড়া রাষ্ট্রের নূতন সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। সেই বর্ষ থেকেই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী বিবর্তনের পঞ্চবর্ষ গণনা করা হয়। পরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবর্ষে শিক্ষার জন্য ১৬৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়, তার ৪৪ কোটি টাকা কেন্দ্র এবং ১২৫ কোটি টাকা রাজ্যগুলির প্রদত্ত।

শ্রীরাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে রচিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবাবলীর ওপর স্বাধীনভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ওই কমিশন নিযুক্ত হয় ও তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে। অগ্রগামী জাতীর চিন্তাধারার শীর্ষে স্থাপিত স্বক্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ এতে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। একদিকে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বৃত্তি ও শিল্পকে উচ্চ মর্যাদায় স্থাপিত করে' অন্যদিকে গ্রামপ্রাণ দেশকে প্রবুদ্ধ করার জন্য গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষে ১৫ কোটি ও দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষে ৫৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ী স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৫,৯৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। এই কয় বৎসরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১ থেকে ৩৩ শে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে শান্তিনিকেতন,

যাদবপুর, কল্যাণী, ও বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং বাণীপুরের জনতাকলেজ তার নিজের স্নাতকপত্র বিতরণ করে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন নিযুক্ত করা হয়। সভাপতি শ্রীরামস্বামী মুদালিয়রের নামে এর রিপোর্ট "মুদালিয়র রিপোর্ট" বলে' পরিচিত। সার্জেণ্ট রিপোর্টের দ্বিশাখের পরিবর্তে বহুশাখ মাধ্যমিক শিক্ষা, তথ্যশিক্ষা ভিন্ন জ্ঞান আহরণের ক্ষমতার্জন, চরিত্রগঠন, মনুষ্য ও নাগরিকতার বিকাশ প্রভৃতি গুণের জন্য বিশেষ বিষয় ও পদ্ধতির সমাবেশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হ'ল এর প্রস্তাবাবলির মূল কথা। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনসম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান এই রিপোর্টের প্রস্তাবানুযায়ী করা হচ্ছে।

তারপর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পুনর্গঠনব্যাপারে কেন্দ্রীভূত উপদেশনের জন্য নিখিলভারত মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান মুদালিয়র রিপোর্টের প্রস্তাবানুযায়ী নূতন পাঠ্যক্রমের সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার আদর্শের আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষে ২২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষের জন্য ৫১ কোটি টাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ যুগে স্বাধীনভারতের বর্ধমান শিল্পের কর্মী জোগাবার চাহিদায় যন্ত্র ও শিল্পশিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

যাদবপুরের শিল্পশিক্ষায়তনের উন্নয়ন আর খড়গপুরের ভারতীয় যন্ত্রশিক্ষালয়ের স্থাপন হ'ল এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষে ২৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল আর দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষে ৪৮ কোটি টাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ আগেই গৃহীত হয়েছিল, বর্তমানের আদর্শ হ'ল ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৬ থেকে ১৪ বৎসরের সমস্ত বালক বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা। প্রথম পঞ্চবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৯৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে এই স্তরের ২৭৪,০৩৮ প্রতিষ্ঠানে ২৪৮,১২,০০০টি ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করছিল।

স্বাধীনভারতের বয়স্কশিক্ষার নূতন রূপ সমাজশিক্ষা,—কেবল নিরক্ষরতা-দূরীকরণ নয়। সরকারি সমাজশিক্ষা বিভাগগুলি চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি নানা উপকরণের মাধ্যমে সচেতন নাগরিকসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছে।

এইভাবে স্বাধীনভারতের শিক্ষার প্রসার আংশিক হিসেবে প্রচুর ঘটলেও যথেষ্ট হয়নি বলে' অনেকের মনে অসন্তোষ আছে, কিন্তু বিখণ্ডিত দেশের নানা দলাদলি ও বিপত্তির মধ্যে এর চেয়ে বেশি হওয়া কঠিন ছিল। অপরপক্ষে এক্ষেত্রে গৃহীত গণতান্ত্রিক পন্থা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। জাতীয় ঐক্যের খাতিরে প্রথমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হ'লেও রাজ্যে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিভিন্ন শিক্ষাপর্ষতের এবং শিক্ষাবিদদের উপদেশ ও সহায়তায় সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গতি ধীর হয়। শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা জানেন যে মানবিক বিবর্তনের কাজ কোনদিন দ্রুত করা যায় না এবং স্বয়ংসিদ্ধান্তও সিদ্ধির পথ ছাড়া তার অন্য কোনো বাস্তবিক উপায়ও নেই। এ-ক্ষেত্রে ভুল যে হচ্ছে না তাও নয়, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানরূপে শিক্ষার পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র জনসাধারণের কলরোলে, গবেষণাগারের নিস্তব্ধতায় নয়—এখানে নির্বীজীকৃত নির্ভুলতার স্থান নেই, আছে স্বেদস্পৃষ্ট পৌনঃপৌনিক প্রয়াস।

জিজ্ঞাসা

॥ ৫.৩০ নঃ পঃ ॥